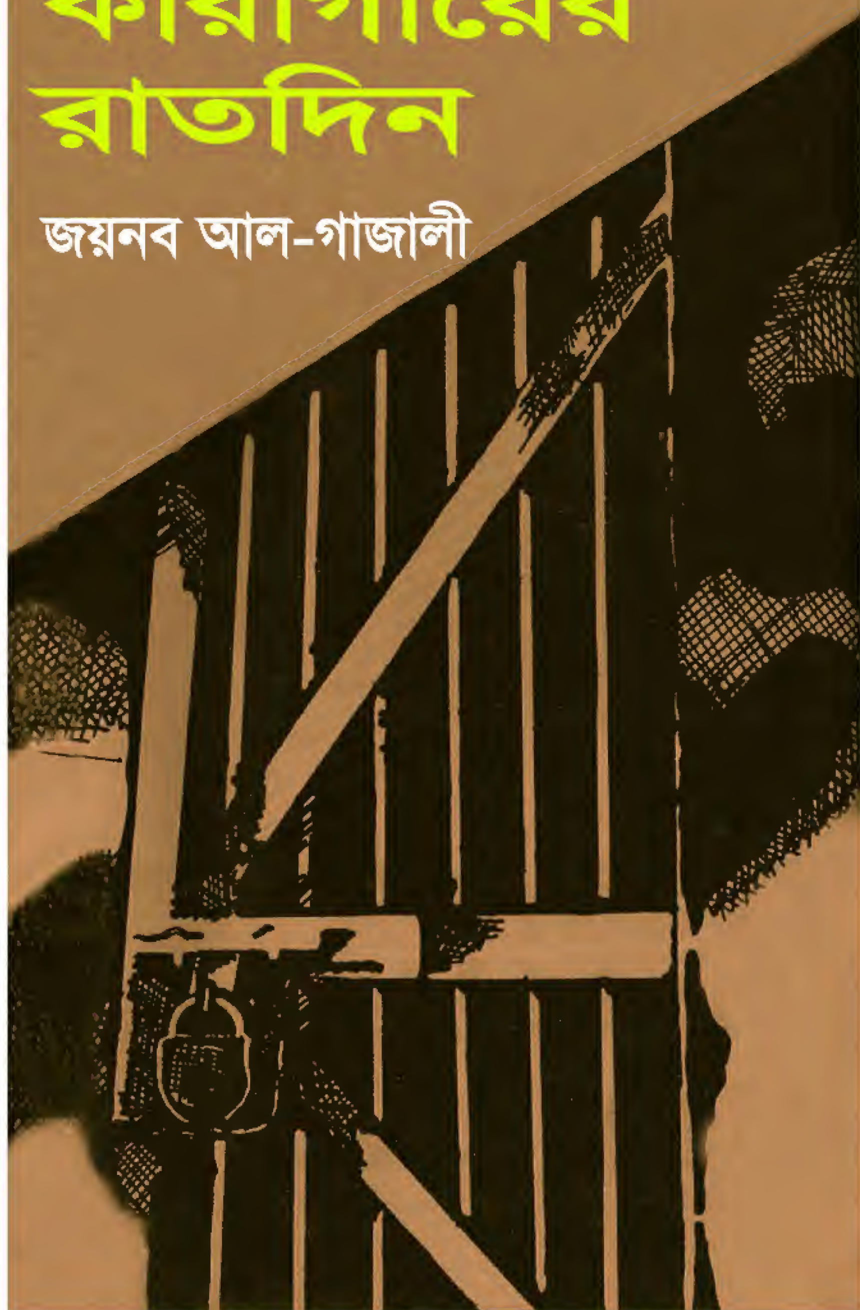
কারাগারের রাতদিন

জয়নব আল-গাজালী



কারাগারে রাতদিন

জয়নব আল-গাজালী

প্রকাশনায়
এ এম আমিনুল ইসলাম
আল-ফালাহ্ পাবলিকেশন্স
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৮৩৫৮৭৩৪, মোবাইল ০১৭১১২৮৫৮৬

প্রকাশকাল
১ম প্রকাশ : মে, ১৯৮৬
৭ম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৪
৮ম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৬

পরিবেশনায় : প্রফেসর'স বুক কর্ণার

মগবাজার : ১৯১, ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন : ৯৩৪১৯১৫, ০১৭৬-৬৭৭৭৫৪	**বাংলা বাজার :** ৩৮/৩, বুক্স এন্ড কমপিউটার কমপ্লেক্স দোকান নং- ১১৭, (নীচতলা) বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭৮-৭৩৮৮৫৮

প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণ : ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস, মগবাজার, ঢাকা।

মূল্য : একশত দশ টাকা মাত্র

Karagharer Ratdin Written by Joynob Al-Gazali Published by Al-Falah Publications, 432 Al Falah Building, Wireless Railgate, Moghbazar, Dhaka-1217. Price Taka : 110 Taka only.

-ঃ উৎসর্গ ঃ-

সে সব নিবেদিত পবিত্রাত্মাদের প্রতি–যাঁরা স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের পথে তাদের পবিত্রতম দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন।

তাঁদের পবিত্র রক্তের প্রতি– যা প্রবাহিত হয়েছে-ইতিহাসের পাতায় বিক্ষুদ্ধ উর্মিমালা হয়ে– ভবিষ্যৎ বংশধরদের তাদের পরম কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে। সেই সব বীর শহীদানের প্রতি- যাঁরা মহান স্রষ্টার নির্দেশে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের সংগ্রামে নিজেদের প্রিয়তম জীবন বিসর্জন দিতেও ইতস্তত করেননি, নিঃসন্দেহে তাঁরা প্রভুর যথার্থ আজ্ঞাবহ ছিলেন ও পরকালেও তাঁরা সাফল্যমন্ডিত হবেন। ওসব লোকদের প্রতি–যাঁরা তাঁদের সাথীদের বলেছেন– তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও,

আল্লাহকে ভয় কর্ ঈমানকে মজবুত কর এবং তাঁরই দলভুক্ত থেকো। সেইসব বীর তরুণদের প্রতি–সত্যের পথে চলতে গিয়ে শত সংকট সমস্যাতেও সন্ত্রস্ত হয়নি। কোন প্রতিকূল ঝড়-তুফান তাদের দূর্বার গতিকে শ্লথ করতে পারেনি। নিজের স্বামীর প্রতি-যিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিলেন। জীবনের সবচেয়ে কঠিন সন্ধিক্ষণেও তিনি আমার পার্শ্বত্যাগ করেননি, এমনকি এক্ই উদ্দেশ্য অর্জনের সহযাত্রায় তিনি নিজের জীবনকে স্রষ্টার কাছে সমর্পন করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সে সব মুসলিম ভাইবোনদের প্রতি– যাঁরা আমার আত্মকথা পড়ছেন। দোয়া করি আল্লাহ্ আমার প্রয়াসকে সার্থক করুন এবং সকলের জন্যে উপকারী ও লাভজনক করুন।

(আমীন)

প্রকাশকের কথা

আমি যখন সপ্তম শ্রেনীর ছাত্র তখন "কারাগারের রাতদিন" বইটি পড়ার সুযোগ পাই। পড়তে বসে বইটি একটানা পড়ে শেষ করি। আজো আমার মানসপটে বইটির কাহিনী নাড়া দেয়। আমার বার বার মনে পড়ে কি করে, কিসের মোহে একজন মহিলা জীবনের শেষ নিঃশ্বাষটি বের হয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে অবস্থায়ও শত অত্যাচারের মোকাবেলায় অটল-অবিচল থাকতে পারে! এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমিও মাঝে মাঝে হারিয়ে যেতাম চিন্তার গভীরে। ইসলামী আন্দোলনকে বুঝতে গিয়ে যখন কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য পড়ি তখন এ প্রশ্নের সমাধান পাই।

যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের ধারক বাহক নবী-রাসূলগণ (সাঃ) থেকে শুরু করে তাঁদের উত্তরসূরীরা বাতিলের মোকাবেলায় জান-মালের কোরবানীর যে নজরানা পেশ করেছেন, তারই দৃষ্টান্ত জয়নাব আল-গাজালী।

বইটির রচয়িতা জয়নব আল-গাজালী মিশর ইসলামী মহিলা সংস্থার সভানেত্রী ছিলেন। তৎকালীন মিশরের সরকার প্রধান সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী, অত্যাচারী শাসক জামাল আব্দুন নাসের ও তার সহযোগিরা লেখিকাকে কারাগারে যে অত্যাচার ও নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়েছেন, তারই বিভৎস চিত্র অঙ্কিত হয়েছে বইটিতে।

মিশরের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব বিশেষ করে শহীদ হাসান আল-বান্না, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, মুহাম্মদ কুতুব, আব্দুল ফাত্তাহ্ ইসমাইল, আব্দুল করিম আহ্দাহ-র মতো ব্যক্তিরাও শিকার হন এই নির্মম অত্যাচারের। তাঁরাও বাতিলের মোকাবেলায় নিজেদের জান-মালের কোরবানী পেশ করেছেন। আল্লাহ্ তাঁদের কোরবানীকে কবুল করুন।

বইটি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের যোগ্যতা অর্জনের সামান্যতম ভূমিকা রাখলেও আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে ইসলামী আন্দোলনের পথে কবুল। আমীন॥

প্রকাশক

অনুবাদকের কথা

পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী শ্বেত সাম্রাজ্যবাদী চক্র এবং সাম্রাজ্যবাদী লাল সামাজ্যবাদী গোষ্ঠীর নির্মম নির্যাতন, শোষণ এবং ষড়যন্ত্র থেকে কোটি কোটি বঞ্চিত নিপীড়িত আদম সন্তানকে মুক্তি-শান্তি ও সমৃদ্ধির সোনালী মঞ্জিলে পৌঁছিয়ে দেয়ার বলিষ্ঠ শপথ নিয়ে আজ বিশ্বের দিকে দিকে ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মী বাহিনী আপোষহীন সংগ্রামে তৎপর। মুসলিম বিশ্বে তো বটেই, এমন কি শ্বেত ও লাল সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় দূর্গের ভিত্‌ও আজ এসব বিপ্লব প্রাণ যুবকদের বজ্রনির্ঘোষে কম্পমান। আল্লাহর দুনিয়াতে আল্লাহর দ্বীন কায়েম ক'রে সর্বমানবতার মৌলিক অধিকার এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞায় তারা বদ্ধ পরিকর।

ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী কাফেলায় একদিকে যেমন সচেতন সংগ্রামী যুবকরা জেহাদী গান গেয়ে এগিয়ে চলেছে, তেমনি পাশাপাশি তাওহীদি সূরের জাগরনী ঝংকার তুলে এগিয়ে আসছে সত্যের দ্যুতি অগ্নি দুলালী বোনেরাও। এমনই এক বিপ্লবী বোন হচ্ছেন-মিশরের প্রখ্যাত মহিলা ইসলামী আন্দোলনের সভানেত্রী মুহতারেমা জয়নব আল-গাজালী।

আরব বিশ্বের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর শিখন্ডি এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্রের ক্রীড়নক হিসাবে প্রেসিডেন্ট নাসের যখন মিশরের মুক্তিকামী জনগণের উপর অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালিয়ে সন্ত্রাস ও বর্বরতার জঘন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিল। তখন যে সব মর্দে-মুমিন ন্যায় ও সত্যের পক্ষে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে আওয়াজ বুলন্দ করেন, জয়নব গাজালী তাঁদের অন্যতম। জয়নব গাজালীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রচন্ড গণ-আন্দোলনের সম্মুখে প্রেসিডেন্ট নাসের বেসামাল হয়ে পড়েন। ওদিকে সোভিয়েত সরকার মিশরের এই অভূতপূর্ব আন্দোলনকে অবিলম্বে নস্যাৎ করার জন্য প্রেসিডেন্ট নাসেরের উপর চাপ প্রয়োগ করেন। কিন্তু নাসের মিশরীয় জনগণের দূমায়ীত আক্রোশ এবং আন্দোলনের মূল শক্তি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাই প্রথমে তিনি ষড়যন্ত্রের ফাঁদ; পাতেন। তিনি জয়নব গাজালীকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীপদ ও ক্ষমতার অংশ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু জয়নব আল-গাজালী এসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জনগণের দাবী মোতাবেক দেশে অবিলম্বে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবী জানান।

নাসের যখন কোন ক্রমেই ইসলামী বিপ্লবের এই মহান নেত্রীকে ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আনতে ব্যর্থ হন তখন তাঁকে হত্যার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য সড়ক দুর্ঘটনায় নাকটীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকেও রক্ষা পান। অবশেষে উপান্তর না দেখে প্রেসিডেন্ট নাসের সভানেত্রী জয়নব গাজালীকে লৌহকারার অন্তরালে নিক্ষেপ করে স্বস্তির নিশ্বাস নেন। সেই কারা জীবনের বিভিন্ন লোমহর্ষক ঘটনার ইতিবৃত্তই হচ্ছে তাঁর এই আত্মকথা মূলক রচনা। বইটি সারা দুনিয়াতে যে অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এর বাংলা অনুবাদ বাংলাভাষী ভাই-বোনদের হাতে তুলে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। বাংলা ভাষী ভাই-বোনদের মনে জয়নব গাজালীর আপোষহীন বিপ্লবী চরিত্রের প্রভাব পড়লেই আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।

ভূমিকা

বিশ্ব-মানবতার মুক্তিদূত প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি অশেষ দরুদ ও সালাম নিবেদন করে ভূমিকা আকারে দুটি কথা আরজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

নিজের জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী লিপিবন্ধ করার কথা ভেবেছি অনেকবার, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এসবের তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না বলে–সেসব ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারিনি। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত আমার ভাই-বোন এবং ছেলে-মেয়েরা যখন বার বার অন্যতম দ্বীনি দায়িত্ব হিসেবে এসব ঘটনাবলী লিপিবন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে- তখন ওদের সাথে এ ব্যাপারে একমত না হয়ে পারিনি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের খোদাদ্রোহী বাতিল শক্তিবর্গ ইসলামী আন্দোলনকেই নয়, বরং সত্যের পতাকাবাহী নেতৃবৃন্দ এবং ইসলামের বিপ্লবী মুজাহিদদের সমূলে উৎখাত করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল, কারণ, ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রামী কর্মীরা আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সুন্নাহকে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। তারা বলেছিল- আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাহ মুলতবী হয়ে থাকার জন্যে আসেনি, অক্ষরে অক্ষরে প্রতিষ্ঠার জন্যেই এসেছে। বস্তুতঃ তাওহীদী আদর্শ শিক্ষা-দীক্ষা এবং আল্লাহর সাথে যথার্থ সম্পর্ক কায়েমের মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতকে তার পূর্ণ যোগ্যতার সাথে সৃষ্টিকারী সব রকমের মুর্খতাপূর্ণ কুসংস্কার এবং রীতিনীতিকে উচ্ছেদ করতে হবে। এভাবেই দুনিয়ার বুক থেকে খোদাদ্রোহী এবং অত্যাচারী লোকদের প্রভূত্ব মূলোৎপাটিত হবে। মানুষের উপর মানুষের গোলামী অবসান ঘটবে। কেবল তখনই সোনালী যুগের সাহাবাদের সমাজের মতো জীবনের প্রকৃত রূপ তার বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের এই পৃথিবী এবং এতে বসবাসকারী কোটি কোটি মানুষের সত্যিকার সাফল্য ও স্বার্থকতা ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের উপরই নির্ভরশীল।

কারাগারের তমসাচ্ছন্ন কাল কুঠরীতে পৈশাচিক ও অমানবিক নির্যাতন; নিষ্ঠুরপ্রাণ জল্লাদ এবং চাবুক বাজদের নৃসংশতা; ইসলামী আন্দোলনের দুঃসাহসী ও একনিষ্ঠ কর্মীদের ধৈর্য্য, সাহস ও শক্তিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমাদের আগেও যাঁরা যুগে যুগে সত্যের পথ ও পক্ষ অবলম্বন করেছেন তাঁদেরকেও এসব মুসিবত এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তাঁদের যুগের

নমরুদ ফেরাউনের মতো পরাক্রমশালী শক্তিবর্গও তাঁদেরকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। সেই তুলনায় বর্তমান যুগের শাস্তি বা কারা-নির্যাতনের গুরুত্ব নেহায়েত তুচ্ছ বৈ-কি!

যুক্তিকে যুক্তি দিয়ে, মতামতকে মতামত দিয়ে, আলোচনাকে আলোচনার মাধ্যমে মোকাবেলা করা সম্ভব। কিন্তু ক্ষমতান্ধ বাতিল শক্তিবর্গ এসব ইতিবাচক ব্যবস্থার চেয়ে পাগলের হাতে চাবুক দিয়ে হকপন্থীদের উপর লেলিয়ে দেয়াকেই বাহাদুরী মনে করে। এসব বাতিল পন্থী জালিম অত্যাচারী এবং স্ব-ঘোষিত প্রভূদেরকে বিভ্রান্তি ও মূর্খতার জঞ্জাল থেকে হেদায়াতের পথে টেনে আনা সত্যিই মুশকিল।

সত্যের পথ কেবল একটিই এবং তা হচ্ছে আল্লাহ্, তাঁর নবী-রাসূল এবং তাঁদের অনুসারীদের পথ। এর বিপরীত পথই হচ্ছে মিথ্যা-বাতিলের পথ। এর পদে পদে ওঁৎ পেতে বসে আছে সত্যের শত্রু-শয়তান। শয়তান অত্যন্ত সন্তর্পণে মানুষকে ধ্বংস ও ভ্রান্তির পথে টেনে নিয়ে যায়।

"এবং এই হচ্ছে আমার সহজ-সরল পথ। তোমরা এরই অনুসরণ করো; আর এমন সব বিভিন্ন পথ অবলম্বন করোনা যাতে তোমরা সরল-সহজ পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে।" (আল-কুরআন) ইসলামের আদর্শ অবলম্বন অর্থাৎ আল্লাহর পথে চলা এবং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল আজকের বিশ্ব-মানবতাকে বিভ্রান্তির অক্টোপাস থেকে মুক্তি দেয়া সম্ভব।

বর্তমান যুগে মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে খোদাদ্রোহী শক্তির মোকাবেলা করে সাফল্য অর্জনের ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি। বাতিল মতবাদের পিরামিডের উপর সত্যের বিজয়-পতাকা উড়ানোর দৃশ্যও অবিলম্বে প্রত্যক্ষ করবো বলে আমি আশাবাদী। জাতি, তার আদর্শগত দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করবে বলেও আমার স্থির বিশ্বাস। কারণ তাওহীদ ও রিসালাতের ঝান্ডাকে বুলন্দ রাখার জন্যেই মুসলিম জাতির অভ্যূদয় হয়েছিল।

অবশ্য ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের জন্যে সময় বা বছরের সীমানা নির্ধারণের তাড়াহুড়া আছে বলে আমি মনে করিনা। একটি আদর্শবাদী জাতির জীবনে এর তেমন কোন গুরুত্বও নেই। তবে, আসল কথা হচ্ছে, ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থেকে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে অব্যাহত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি কিনা এটাই খেয়াল রাখতে হবে।

আমাদের বিশ্বাস, আমরা সত্যের পথে রয়েছি এবং যাঁরা আমাদের কাফেলায় শামিল হবেন-তাঁরা প্রত্যেকেই ইসলামী ইমারতের জন্যে এক একটি ইটের পরিবর্দ্ধন করবেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, আন্দোলনের কাজে কোনক্রমেই শিথিলতা

আসতে দেয়া যাবেনা, কোন অর্থেই গতি মন্থর হবে না এবং পিছু হটা চলবে না। আমরা মনে করি আমাদের কারা নির্যাতন ভোগ একটি ঐতিহাসিক সত্য, বাতিলের বিরুদ্ধে যারা আপোষহীন সংগ্রামী, এটাই তাদের প্রাপ্যই বটে!

বলাবাহুল্য, এসব গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই আমি আমার ভাই-বোনদের অনুরোধের মর্যাদা রাখতে গিয়ে আত্মকথা লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পাই, একাজে আমি আল্লাহ্ পাকের সাহায্য প্রার্থনা করি।

আত্মকথা লিখতে গিয়ে এমন সব ঘটনাবলীর বারবার উল্লেখ করতে হয়েছে– যার কল্পনাতেও আত্মায় কাঁপন ধরে। বস্তুতঃ শাস্তির জঘন্যতা, নির্মমতা এবং জল্লাদ ও শাস্তি বিশেষজ্ঞদের অনুশীলন ক্ষেত্রের নামই হচ্ছে জাহান্নাম। এই জাহান্নামের অগ্নিকুন্ড থেকে যাঁরা বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা উদাত্ত কণ্ঠে আবার ঘোষণা করেছেন– হে দুনিয়ার মানুষ! ইসলাম কোন বংশ বা সম্পর্কের নাম নয়, বরং তা হচ্ছে ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের শাশ্বত জীবনাদর্শ।

কারাজীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার কাজে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন এবং তা মুমিনদের জন্যে আলোকবর্তিকা স্বরূপ হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের পথের নাম সিরাতুল মোস্তাকীম এবং একথা বারবার উল্লেখনীয় যে, যুগে যুগে নবী-রাসূলরা যে সত্যের পয়গাম এনেছেন– সেসব পয়গামের চূড়ান্ত পূর্ণতার নামই হচ্ছে শরীয়াতে মোহাম্মদী (সাঃ)

"যাদের ইচ্ছে, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যাদের ইচ্ছে অস্বীকার করুক।" যারা আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে বিপদ-মুশিবত সহ্য করার জন্যে প্রস্তুত তারা আল্লাহর ইচ্ছায় কুরআন ও সুন্নাহর ঝান্ডাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়।

এই উপলব্ধি নিয়েই আমরা ইসলামী আন্দোলনের সামিল হয়েছি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হই না কেন হাসিমুখেই তার মোকাবেলা করবো। কেননা আমরা জানি, আল্লাহ মোমেনদের কাছ থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জানমাল কিনে নিয়েছেন। তা এজন্যেই যে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, এমনকি তারা এ পথে শহীদ হয়ে যাবে। 'তওরাত' 'ইঞ্জিল' এবং কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ভালবাসা ও ভক্তিপূর্ণ সালাম সেসব শহীদানের প্রতি যাঁরা আমাদের আগে জান্নাতবাসী হয়েছেন। নিঃসন্দেহে আমরা সত্যপথের অভিযাত্রী। তাদের প্রতিও সালাম, যাদের মনে অনুবরাবর হলেও ঈমানের আলো প্রদীপ্ত রয়েছে। হতে পারে, আল্লাহপাক তাদেরকেও হেদায়াতের সৌভাগ্যে ভূষিত করবেন।

জয়নব আল–গাজালী

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
আমার প্রতি জামাল নাসেরের ব্যক্তিগত আক্রোশ	১৩
আমি এবং সামাজতন্ত্রী ইউনিয়ন	১৭
খোদাদ্রোহীদের জন্য নয়	২০
আমরা কি করবো?	২২
টালবাহানা ও প্রতারণা	২৩
রাতের উল্লুক	২৪
সবাই আহামদ রাসেখ	২৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	
আনুগত্যের শপথ	৩১
মুখোশ উন্মোচিত	৩৬
দায়িত্ব পালনের ডাক	৩৭
আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইলের সাথে হজ্জের পথে	৪০
কাজের অনুমতি	৪৩
স্বামীর সাথে স্পষ্ট কথাবার্তা	৪৫
সাইয়েদ কুতুবের সাথে সাক্ষাৎ	৪৯
তৃতীয় অধ্যায়	
ষড়যন্ত্র	৫২
এবার আমার পালা	৫৫
চব্বিশ নম্বর কক্ষের পথে	৫৯
চব্বিশ নম্বর কক্ষে	৬১
তিন নম্বর কক্ষে	৬৩
স্বপ্ন	৬৫
আল্লাহ্ তাদের সহায়	৭২
জুলুম নির্যাতনের স্টীমরোলার	৭৩
প্রেসিডেন্ট নাসেরের প্রতিনিধি	৭৮
আমার সেলে অনেক চেহারা	৮১
রাফাত মোস্তাফা নুহাসের ইন্তেকাল	৮৩
খাদ্য গ্রহণ ইবাদত তুল্য	৮৭
দুর্যোগের রাত	৮৮
এবার হামজার পালা	৯৪

বিবরণ	পৃষ্ঠা
সেলে প্রত্যাবর্তন	৯৬
দ্বিতীয় রজনী	৯৬
সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম	১০০
জুলুমের রাত	১০১
স্যুটকেস এবং প্রেসিডেন্ট নাসেরের চিঠি	১০৫
চতুর্থ অধ্যায়	
শামস্ বাদরানের অত্যাচার	১১০
পানির সেলে	১১৬
অপরাধ	১২২
আবার পানির সেলে	১২৫
আমার সেলে পশুত্বের লাশ	১২৭
ইঁদুরের পাশ থেকে পানির দিকে	১২৯
পানি থেকে এটর্নির দিকে	১৩৪
খাদ্য এবং চাবুক	১৩৮
হাসপাতালে	১৩৯
আবার শামসের কবলে	১৩৯
অত্যাচারের নাটকীয় দৃশ্য	১৪৪
বত্রিশ নম্বর সেলে	১৪৬
ঈমানের মান ও মিথ্যের অপমান	১৪৭
আমার ফাঁসির হুকুম	১৫২
পাশার দফতরে	১৫৪
সংশয়ের আবর্তে	১৫৬
শামস্ তার বিভ্রান্তির অটল	১৬১
প্রবৃত্তির শাসন ও নীচ লোকদের প্রভুত্ব	১৬৮
হাসাপাতালেও জোর জুলুম	১৭২
পঞ্চম অধ্যায়	
নাসেরের উপস্থিতিতে নির্যাতন	১৭৮
আসল চক্রান্তঃ গুজব	১৮০
মোহাম্মদ কুতুব	১৮৭
তদন্ত	১৯৩
আবার আদালত	১৯৮
আবার সেই অত্যাচার	১৯১

বিবরণ	পৃষ্ঠা
শাস্তি	২০০
অর্থ	২০১
গোশতের কীমার প্যাকেট	২০৭
হাসাপাতালে অভুক্ত	২০৮
অত্যাচারীর অনুতাপ ও সত্যপথে প্রত্যাবর্তন	২০৯
ফয়সালা নিকটবর্তী	২১১
সু-খবর	২১৪
প্রতিশ্রুত দিবস	২১৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	
আদালত	২২০
চরম বর্বরতা	২২৩
মামলার রায় ঘোষণা	২২৩
সাইয়েদের সাথে কয়েক মুহূর্ত	২২৫
ফাঁসির আগের পায়তারা	২২৬
ফয়সালা কার্যকরী	২২৮
শেষ কয়দিন	২৩০
আমার স্বামীর ইন্তেকাল	২৩১
নয়া প্রতিবেশী	২৩৪
নাসেরের বিচার চাই	২৩৪
সপ্তম অধ্যায়	
কানাতীর জেলে স্থানান্তর	২৩৭
মানসিক পীড়ার রাত	২৩৯
নতুন পর্যায়ের সংঘাত	২৪১
শত্রু হলেও মানুষ বটে	২৪৬
মৃত্যু এবং বিদ্রোহী	২৪৭
বুদ্‌বুদ উড়ে যায়	২৫১
নতুন পরীক্ষা	২৫২
শেষ পায়তারা	২৫৪

প্রথম অধ্যায়

আমার প্রতি জামাল নাসেরের ব্যক্তিগত আক্রোশ

উনিশ-শো চৌষট্টি সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এক মনোরম বিকেলে নিজের গাড়ীতে করে বাড়ী ফিরছিলাম। হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে অন্য একটি গাড়ী এসে প্রচন্ড বেগে আমার গাড়ীটিকে ধাক্কা মারে এবং সাথে সাথেই আমার গাড়ীটি উল্টে পড়ে যায়। এই অভাবিত-পূর্ব দুর্ঘটনায় আমি গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়ি এবং যন্ত্রণার তীব্রতায় প্রায় সম্বিৎ হারিয়ে ফেলি। তখন ঘটনাস্থল এবং তার আশেপাশে কারা কোন তৎপরতায় লিপ্ত ছিল, সে সম্পর্কে কিছু অনুমান করার মতো অবস্থাও আমার ছিল না। অবশ্য মনে হচ্ছিল, কে যেন বার বার আমাকে ডাকছে।

সম্বিৎ ফিরে দেখতে পাই, আমি পুলিশ হাসপাতালের শয্যায় শায়িত। আমার এক পাশে প্রিয়তম স্বামী ও ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজন এবং অন্যপাশে ইসলামী আন্দোলনের কয়েকজন প্রভাবশালী কর্মী দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের প্রত্যেকের চেহারায় ছিল ভয় ও উৎকন্ঠার ছাপ স্পষ্ট। আমি বেঁচে গেছি বলে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করি এবং দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে জানার জন্যে ওদের কিছু জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে আবার সম্বিৎ হারিয়ে ফেলি।

পুনরায় জ্ঞান ফিরে এলে দেখি, একজন মহিলা ডাক্তার তার সহযোগীদের নিয়ে আমাকে এক্সরে ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসছেন। তখন একে একে পূর্বাপর সব ঘটনা আমার মনে পড়ছিল। আমি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছি বলে আমার স্বামী তখনো ভক্তিতে গদগদ কণ্ঠে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানাচ্ছিলেন। আমি আমার গাড়ীর ড্রাইবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান-"ড্রাইভার সুস্থই আছে। সামান্য আঘাত পেয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।"

পরে জেনেছি যে, ওর মাথা এবং মস্তিষ্কে চোট লেগেছে। এদিকে এক্সরে রিপোর্ট মোতাবেক আমার উরুর হাড় ভেঙ্গে গেছে। সুতরাং অস্ত্রোপচারের জন্য "আমাকে মায়হার আগুর" হাসপাতালে পাঠানো হয়। এখানে প্রখ্যাত সার্জন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আমার অজ্ঞান অবস্থায় সাড়ে তিন ঘন্টা স্থায়ী অপারেশন কার্য চালিয়ে আমাকে বিপদমুক্ত করেন।

বিপদসংকুল কয়েকটি দিন কেটে যাওয়ার পর আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারি যে, প্রেসিডেন্ট জামাল নাসেরের গোয়েন্দা বাহিনীই আমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরের ঘটনাবলী দ্বারা এর সত্যতা আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। সরকারী সন্ত্রাসের সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোতেও ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মীরা আমার অবস্থা জানার জন্য নিয়মিত হাসপাতালে আসতো। হাসপাতালের বাইরে সরকারী গুপ্তচর বাহিনীর লোক মোতায়েন ছিল। দেশের প্রতিকূল পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির পর জনগণ এবং আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে আমি কর্মীদের তাদের প্রিয় নেতা ভাই আব্দুল ফাত্তাহ্ আবদুহ্ ইসমাইল শহীদের মাধ্যমে আমাকে দেখার জন্য হাসপাতালে আসতে বারণ করি। কিন্তু দেখে বিস্মিত হয়েছি যে, কর্মীরা কোন প্রতিকূল অবস্থার চাপ মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। কয়েকদিন পর সরকারী প্রশাসনের সেক্রেটারী আমার অনুমোদনে এর স্বাক্ষর লাভের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল নিয়ে হাসপাতালে উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য, আমি সংস্থার সভানেত্রী বলে আমার কাছে তার আসা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আমার স্বামী সেক্রেটারীকে দেখা মাত্রই উঠে তার হাত থেকে ফাইল কেড়ে নিয়ে ওকে নিয়ে কক্ষের বাইরে চলে যান। তাদের কথাবার্তায় প্রকাশ পেলো যে, এর আগেও একবার সেক্রেটারীকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয়নি। ব্যাপারটা আমার কাছে ভাল লাগেনি। আমি আমার স্বামীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি সংক্ষেপে কেবল এতটুকুই বলেন-"আমি ডাক্তারের হুকুম পালন করছি মাত্র।"

পরে ডাক্তার এসে আমার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করেন এবং আমাকে সব রকমের কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরো জানান যে, ফাইলে বিভিন্ন কাগজপত্র এবং তথ্যাদি ছিল। কিন্তু ওসব আপনার কাছে পৌঁছানো নিষেধ আছে। আমি সাথে সাথেই তাঁর একথার প্রতিবাদ করে বলি যে, এসব কাগজপত্র এমন কোন ভয়ঙ্কর কিছুতো নয় যে, তা আমার কাছে পৌঁছাতে দেয়া হচ্ছে না। বস্তুতঃ ওসব দলিলপত্র স্বাক্ষরের

জন্য আমার কাছে পৌঁছানোই উচিৎ। কিন্তু তিনি আমাকে ফাইল দিতে অস্বীকার করেন। এর কয়েকদিন পর আমি শয্যায় বসে সংস্থার কিছু কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করি। কিন্তু তাও প্রত্যাখ্যান করা হয়। এসব দেখে-শুনে আমার সন্দেহ বিশ্বাসে রূপান্তরিত হলো যে, নিশ্চয়ই এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটেছে, যা এঁরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই আমার কাছ থেকে লুকোবার চেষ্টা করছেন। আমার স্বামী, প্রাইভেট সেক্রেটারী, এমনকি সংসদের কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকার কোন কোন আলোচনা থেকেও এটা বোঝা যাচ্ছিল যে, এরা সবাই আমার কাছে ঘটনা বিশেষ গোপন রাখার চেষ্টা করছেন।

যা আশংকা করছিলাম, শেষ পর্যন্ত তাই হলো। পরদিন বিকালে সরকারী সচিবালয়ের মহিলা সেক্রেটারী আমার স্বামীর উপস্থিতিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করেই আমার কাছে এগিয়ে এলেন। প্রকৃত ঘটনা খুলে বলার আগে তিনি আমাকে ধৈর্য্য ও সাহসিকতার সাথে যেকোন কথা শুনার জন্য মানসিক প্রস্তুতি অর্জনের পরামর্শ দেন। এরপর বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে আমার সামনে ফাইল খুলে ধরেন। দেখি যে, ফাইলের সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি, যা আমার কাছ থেকে লুকালো চেষ্টা চলছিল তা আর কিছু নয়, –আমাদের মহিলা সংস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণার সরকারী ফরমান মাত্র।

সরকারের মহিলা সেক্রেটারী আমাকে সাময়িক সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলছিলেন– স্বভাবতই, এতে আপনার ভীষণ দুঃখ পাওয়ার কথা। "আল্লাহ্‌কে অশেষ ধন্যবাদ, কিন্তু মহিলা সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কোন অধিকারই সরকারের নেই। একটি ইসলামী সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কোন যুক্তি বা সাংবিধানিক ক্ষমতা সরকার কোথায় পেলো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সরকারের সামনে এ প্রশ্ন তুলে ধরার মতো কোন একজন লোকও এখন মুক্ত নয়। আমরা আমাদের পর্যায়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু জামাল নাসের ইসলামী মহিলা সংস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে দৃঢ়সংকল্প। সে ব্যক্তিগত ভাবে আপনার উপর দারুন নাখোশ; এমন কি, কারো মুখে আপনার নাম পর্যন্ত তার অসহ্য। কেউ অজ্ঞাতে আপনার নাম উচ্চারণ করলে তিনি এমনই বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেন, যা বলার মতো নয়। আপনার ব্যক্তিত্ব এবং আন্দোলন তার স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে যেন।' সরকারী সেক্রেটারীর কথা শুনে আমি বললাম– "আল্লাহ্‌র শোকর যে, নাসের শুধু এই জন্যেই আমাকে এবং দলকে ভয় করে যে, আমরা মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্যে ইসলামী সমাজ কায়েমের আন্দোলন

চালাচ্ছি। আর নাসেরের প্রতি আমার অসন্তুষ্টির মূল কারণ হচ্ছে, সে জনগণের ইসলামী দাবী উপেক্ষা করে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী চক্রের পদলেহন করছে। যাই হোক, সে অনতিবিলম্বেই টের পাবে যে, সরকারী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আমাদেরকে হত্যা করে বা জেলে পুরে রেখে ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করা সম্ভব নয়। ইসলামী আন্দোলন তার স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যাবেই। দুনিয়ার কোন শক্তিই এই আন্দোলনের সামনে বেশী দিন টিকে থাকতে পারবে না। আল্লাহ্‌র দ্বীনের মুজাহিদদের দূর্বার অভিযানের সামনে এসব তথাকথিত শক্তি খড়কুটোর মতো উড়ে যেতে বাধ্য। আল্লাহ্ আমাদেরকে গঠনমূলক এবং সৃজনশীল কাজ করতে বলেছেন এবং ধ্বংস ও বিকৃতির কাজে রুখে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন।"

আমার কথা শুনে সচিবালয়ের সেক্রেটারী অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন– "সম্মানিত সভানেত্রী! আমি যথার্থভাবেই আশা করি যে, আপনার দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হবে।" এরপর এদিক ওদিক দেখে ঈষৎ চাপা স্বরে বললেন "এখানে কোন গোপন মাইক্রোপন লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা, ভয় হচ্ছে। জানেন তো, দেয়ালেরও কান আছে।" এবার সরকারী সচিবালয়ের সেক্রেটারী তার গুপ্ত পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আশেপাশে দৃষ্টি রেখে বললেনঃ "মহামান্য সভানেত্রী। আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, অনুগ্রহ করে এই কাগজটিতে স্বাক্ষর করুন। এতে স্বাক্ষর করার সাথে সাথেই আপনার দলের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নাকচ হয়ে যাবে।"

পড়ার জন্যে কাগজখানা হাতে নিয়ে আমার ক্ষোভ আর বিস্ময়ের সীমা রলোনা যে, এটি হচ্ছে ক্ষমতাশীন সরকারী সমাজতান্ত্রিক দলে যোগদানের আবেদন পত্র।

আমি কয়েক মুহূর্ত যেন পাথর হয়ে রইলাম। এরপর সব তিক্ততা হজম করে জামাল নাসেরের সেক্রেটারীকে বললাম–

সেক্রেটারী, কোন সৎকাজ পেলে গিয়ে করোগে। মনে রেখো এবং নাসের কে জানিয়ে দিও, তার মতো অত্যাচারী শাসকের পক্ষ সমর্থনে স্বাক্ষর করার আগে আমার হাত যদি জ্বলে পুড়ে গলে যায়, তাও ভালো। জামাল নাসের আল্লাহ্ এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যায় তৎপরতায় লিপ্ত। সে জনগণের দুশমন; জননেতা আব্দুল কাদের আওদাহ্ এবং অসংখ্য বিপ্লবী মুসলমানের না হোক রক্তে রঞ্জিত তার কলঙ্কিত হাত। তার মতো নিষ্ঠুর জালিমের পক্ষ অবলম্বনের চেয়ে আমার দলের অবলুপ্তি মেনে নেয়াই আমার কাছে অগ্রগণ্য।

এরপর সরকারী সচিবালয়ের সেক্রেটারী আমার হস্ত চুম্বন করে বললো-

ঃ মা, আপনি কি আমাকে মেয়ে বলে মেনে নিতে পারেন?

ঃ কেন নয়? আমি বললাম।

ঃ তাহলে, ও প্রসংগ ছাড়ুন, তার চেয়ে.....

ঃ না, কোন বৃহত্তর কোরবানীর বিনিময়েও জামাল নাসেরের অত্যাচারী শাসনের সমর্থনে স্বাক্ষর করা সম্ভব নয়। মিথ্যের সাথে সত্যের মিত্রতা অচিন্তনীয়। তুমি আসতে পার, সেক্রেটারী!

ক্রমশঃ সুস্থ হওয়ার পর হাসপাতালের দিনগুলো ফুরিয়ে আসে। আমি গৃহে ফিরে যাই।

আমি এবং সমাজতন্ত্রী ইউনিয়ন

এরপর বলতে গেলে প্রায় রোজই সচিবালয়ে সেই মহিলা সেক্রেটারী আমার কাছে আসতে থাকেন। একদিন এসে তিনি বললেন-

ঃ সুসংবাদ মাদাম! আপনার সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছে।

শুনে বিস্মিত হলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম-

ঃ তা কেন?

ঃ আমি সঠিক কিছু জানিনে। তবে মনে হচ্ছে, এরকম হতে পারে যে আপনার সাথে সরকারীভাবে যোগাযোগ এবং আলোচনার জন্যে পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে। এভাবে সরকারী প্রশাসনের সেক্রেটারী আমার কাছে বিভিন্ন তথ্যাদি নিয়ে আসতে থাকেন এবং আমিও নিজ বাসস্থান থেকে দলীয় কাজকর্ম এবং তৎপরতা পরিচালনা করতে থাকি। কিছুদিন পর প্লাস্টার খোলার জন্যে হাসপাতালে গিয়ে জননেতা জনাব সাইয়েদ কুতুবের মুক্তির সংবাদ পাই। তিনি কারাগারে থেকেই আমার সড়ক দুর্ঘটনার খবর পান এবং মুক্তিলাভের পরপরই আমাকে দেখার জন্যে হাসপাতালে ছুটে আসেন।

এর কয়েকদির পর সকালের ডাকে একখানা রেজিস্ট্রী কার্ড পাই। কার্ডের বিবরণ ছিল ঠিক এরকম-

আরব সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন-

স্বাধীনতা-সমাজতন্ত্র-সংহতি-

নাম-জীনত আল-গাজালী আল-জুবাইলী।

ওরফে-জীনত আল গাজালী।

পদ/পেশা-ইসলামী মহিলা সংস্থার সভানেত্রী।

ইউনিট-আলবাসায়ীন-আলমাজা।

বিভাগ-নয়া মিশর।

জিলা-কায়রো।

এই কার্ডের সাথে একই ডাকে আরো একটি বিস্তারিত দস্তাবেজ আসে। এই দস্তাবেজ হচ্ছে ১৯৬৪ সালের মিশর-সোভিয়েত সম্পর্কের একটি প্রমাণপত্র।

এরপর ধারাবাহিকভাবে সরকারী দলের পক্ষ থেকে চিঠি এবং আমন্ত্রণ পত্রাদি আসতে থাকে। তাদের বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্যেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম, এ ধরনের কোন চিঠি-পত্রের জবাবই দেবোনা। ইতিমধ্যে পরিপূর্ণভাবে আরোগ্য লাভের পরিপ্রেক্ষিতে ডাক্তার আমাকে দলীয় কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করার অনুমতি দেন।

একদিন ইসলামী মহিলা সংস্থার সদর দপ্তরে আমার ব্যক্তিগত সেক্রেটারী জানায় যে, সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমি রিসিভার তুলে 'আস্সালামু আলাইকুম' বললাম। অপর প্রান্ত থেকে জবাব এলোঃ

ঃ ওয়া আলাইকুমুস সালাম।

ঃ আপনি কে বলছেন? কাকে চাই এবং কেন? একই সাথে তিন তিনটি প্রশ্ন করে জবাব তলব করলাম আমি।

আপনি যদি মুহতারেমা জীনত গাজালী হয়ে থাকেন তাহলে সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আপনাকে অনুরোধ করার প্রয়োজন মনে করছি যে, মেহেরবানী করে প্রেসিডেন্ট জামাল নাসেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে আপনার নেতৃত্বে ইসলামী মহিলা সংস্থার বোনেরা বিমান বন্দরে এলে আমরা খুব খুশী হব।

আমাকে চুপ থাকতে দেখে ও প্রান্ত থেকে আবার বললো-

ঃ আপনার আদেশ পেলে মোটর গাড়ী পাঠিয়ে দেবো এবং তা সব সময় আপনার ব্যবহারের জন্যই থাকবে।

ঃ না, ধন্যবাদ বলে আমি রিসিভার রেখে দেই। দু'তিন দিন পর সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আবার টেলিফোন আসে। এবার এক ভদ্রমহিলা জানতে চাইলেন–

আপনারা প্রেসিডেন্টকে স্বাগতম জানাবার জন্যে বিমানবন্দরে উপস্থিত হননি কেন?

আমি বললাম– "আমাদের সংস্থার কর্মীরা কোথাও যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাছাড়া আমরা ইসলামী শিক্ষার অনুসারী। এমন কোথাও যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, যেখানে মান-সম্ভ্রম এবং শালীনতার প্রশ্ন জড়িত……

মনে হচ্ছে আপনারা আমাদের সমর্থন করতে প্রস্তুত নন। তা আপনি না হয় আসেননি, কিন্তু অন্যান্য মহিলাদের কি বিমান বন্দরে পৌছানোর আদেশ দেননি?

ঃ না, যে ব্যাপারকে আমি নিজের জন্যে অনুচিত মনে করি, সে ব্যাপারে অন্য কাউকে আদেশ দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা।

ঃ এর অর্থ হচ্ছে আপনারা কোনক্রমেই আমাদের সাথে সহযোগীতা করবেন না।

ঃ হ্যাঁ করবো, কেবল ইসলামের পথে। আপনারা যদি আল্লাহ্র নির্দেশিত পথের অনুসরণ করেন তাহলে প্রতি কদমে আমাদের সহযোগিতা পাবেন, অন্যথায় সত্য-মিথ্যার সংঘাত অব্যাহত থাকবে।

ঃ আপনি কি আলোচনার জন্যে আমাদের দফতর পর্যন্ত আসতে পারেন?

ঃ না, আমি এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ নই। তবে আপনার পক্ষে সম্ভব হলে আমার গরীবালয়ে আসতে পারেন–এই বলে রিসিভার রেখে দিই। এই টেলিফোন আলোচনার সপ্তাহ খানেক পর ১৫/৯/১৯৬৪ তারিখের একটি রেজিষ্ট্রী চিঠি আমার নামে পাঠানো হয়। এতে ৬/২/১৯৬৪ তারিখের একটি মন্ত্রীপর্যায়ের সিদ্ধান্ত ছিল। এর নম্বর ছিল ১৩২। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইসলামী মহিলা সংস্থাকে দ্বিতীয় বারের মতো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় আর সে সংবাদই পাঠানো হয়েছে রেজিষ্ট্রী ডাকে।

খোদাদ্রোহীদের জন্য নয়

উনিশশো চৌষট্টির পনেরই সেপ্টেম্বর, সরকারের পক্ষ থেকে ইসলামী মহিলা সংস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় সংস্থার এক জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সরকারী সিদ্ধান্ত মেনে নিতে এবং দলীয় তহবীল সরকার বা কোন দল বিশেষকে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বৈঠকে পরবর্তী বিশেষ জরুরী বৈঠক ২৪ ঘন্টার মধ্যেই অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং বৈঠকে সরকারের সিদ্ধান্ত অমান্য করার এবং সরকারের সেই অবৈধ সিদ্ধান্তকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার ফয়সালা গ্রহণ করা হয়।

আমরা সংস্থার পক্ষে মামলায় প্রতিনিধিত্ব করার উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত আইনজীবি জবাব আব্দুল্লাহ, রিশওয়ানকে কৌশলী নিযুক্ত করি এবং সাথে সাথেই এ ব্যাপার বিস্তারিত বিবরণাদি প্রেসিডেন্ট, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পত্র-পত্রিকায় পাঠাই। আমরা এসব পত্রে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেই যে, ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী মহিলা সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রসার এবং দেশ ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে মুসলিম মহিলাদের ইসলামী পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করা। সরকার বা স্বরাষ্ট দফতর আমাদের সংস্থার পৃষ্ঠপোষক নয় যে, তাদের অবৈধ কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে সংস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে। আমরা সরকারের এহেন যে কোন সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা মেনে নিতে বাধ্য নই বরং সরকারের প্রতি আমাদের আহবান পুণরাবৃত্তি করছি যে, আল্লাহ্‌র দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন-বিধান বাস্তবায়নের মহান লক্ষ্যে সরকার আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। এক্ষেত্রে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

কিন্তু জামাল নাসেরের ক্ষমতার নেশা এবং ইসলাম বিরোধীতায় এমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে, সে কোন ন্যায় বা সত্যকে বিবেচনাযোগ্য মনে করতেই রাজী ছিলনা। আমার প্রতি তার শত্রুতাপূর্ণ মনোভাবের কারণেই সে তড়িঘড়ি যেমন ইসলামী সংস্থাকে অবৈধ ঘোষণা করে তেমনি আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকাটিকেও অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ করে দেয়। এসব অবৈধ কর্মে সে সামরিক শক্তির সাহায্য নিতেও ইতস্ততঃ করেনি। তারা হঠাৎ সংস্থার সদর দফতরে অনাধিকার প্রবেশ করে দফতর এবং তার সব আসবাব-পত্রের উপর জবর দখল কায়েম করে। এমনকি, সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সংলগ্ন এতিমখানার মাসুম গরীব

শিশুদের ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। জবর দখলের জন্য তারা এমন সময় বেছে নেয়, যখন সদর দফতরে আমাদের কোন কর্মকর্ত্রীই উপস্থিত ছিলেন না। কেবল সহকারী দফতর সম্পাদিকা তখন কাজ করছিলেন। সরকারী জবরদখলকারীরা তাঁর কাছ থেকেই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কেড়ে নেয় বলে দাবী করে। পরদিন আমি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেই।

"১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী মহিলা সংস্থা একটি নিয়মতান্ত্রিক ইসলামী সংগঠন। মানুষের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে আল্লাহ্র দেয়া জীবন ব্যবস্থা আল-ইসলামকে পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্, এবং আল্লাহ্ই আমাদের প্রভু এবং জনসাধারণের উপর ব্যক্তি শাসন প্রতিষ্ঠার প্রবণতাকে নিন্দনীয় মনে করি।

আমরা, ইসলামী মহিলা সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সরকারী ফয়সলা দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা করি এবং তা মেনে নিতে অস্বীকার করছি। আমরা এও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই যে, উড়ে এসে জুড়ে বসা জামাল নাসেরের মুসলিম জনগণের উপর শাসন চালানোর কোন নৈতিক অধিকার নেই। তার পদ এবং মন্ত্রী পরিষদ উভয়ই অবৈধ।

আমরা আরও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, জোর-জুলুম চালিয়ে এবং অত্যাচার ও চক্রান্তের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করা যাবে না। কোন রকমের দফতর, তহবিল বা আসবাবপত্র ছাড়াও ইসলামী আন্দোলন অব্যাহত থাকবেই। দুনিয়ার কোন শক্তি আমাদের বিশ্বাস, বলিষ্ঠ প্রেরণার উৎস কেড়ে নিতে পারবে না। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর অবিচল আস্থা এবং বিশ্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্ব আমাদের অগ্রগতিকে অপ্রতিরোধ্য রাখবে। সত্যের পথে অবিরাম জিহাদই হচ্ছে আমাদের কর্মপন্থা। ইসলামী বিপ্লবের মহান লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলতে থাকবে।"

আমরা কি করবো?

ইসলামী মহিলা সংস্থার সদর দফতরে সরকারী জবরদখল কায়েমের পর বিভিন্ন মহিলা প্রতিনিধিদল আমার কাছে এসে পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে পরামর্শ করে এবং পথনির্দেশ চায়।

উনিশশো চৌষট্রি সালকে এক হিসেবে নাসের শাহীর উত্থানের চরম বছর বলা যেতে পারে। এ সময় এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, তার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে টু-শব্দ করাকে দস্তুর মতো দুঃসাহস মনে করা হতো। ইতিমধ্যে প্রখ্যাত ইসলামী আন্দোলন Muslim Brotherhood বা ইখওয়ানুল মুসলিমুনের ছোট-বড় প্রায় সব নেতাকেই বিভিন্ন মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। ফলে সরকারের গণবিরোধী কার্যকলাপের সমালোচনা করার মতো কেউ অবশিষ্ট ছিল না। অন্যদিকে সুবিধাবাদী এবং স্বার্থসন্ধানী রাজনীতিকরা নাসেরের পদলেহন করে স্বার্থসিদ্ধির মোক্ষম সুযোগের সদ্ব্যবহার করছিল। এমনকি কোন কোন ধর্মীয় নেতা এবং কতিপয় ধর্মীয় পত্রিকাও তখন নাসের শাহীর স্তুতিকেই অপেক্ষাকৃত মঙ্গলজনক মনে করছিলেন। বিখ্যাত আরবী পত্রিকা আল-আজহারে-ও এমন সব প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ পাচ্ছিল, যা অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠীর ন্যাক্কারজনক ভূমিকা যুক্তিভিত্তিক মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস বলেই গণ্য হওয়ার যোগ্য। আর যারা ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ, মুখোসধারী পত্র-পত্রিকা তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বান ছুঁড়তে ব্যস্তই ছিল। জুলুম-ত্রাসের এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও ইসলামী আন্দোলনের নির্ভীক মুজাহিদরা সত্যের পতাকা বুলন্দ রাখেন। শত নির্যাতন-নিষ্পেষণ সত্ত্বেও তাদের মনোবল টুটে যায়নি; তাদের তৎপরতায় আসেনি এতটুকু শৈথিল্য, ম্লান হয়নি তাদের মুখের মিষ্টি হাসি।

মুসলিম মহিলারাও এক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা পার্থিব স্বার্থ অর্জনের চেয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের পথে দুঃখ কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন। ভয়-ভীতি এবং বাধাবিপত্তির বিন্ধাচল অতিক্রম করে তারা নিয়মিত আমার কাছে আসতেন নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে। এমন দুর্দিনেও তারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় ঘরোয়া বৈঠক এবং সাধারণ সমাবেশের আয়োজন করেন। এ সময় আমরা মহিলা বক্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কার্যক্রম হাতে নেই। এভাবে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত বক্তিদেরকে

আন্দোলনের প্রচার কার্য চালানো এবং মহিলাদের সংঘবদ্ধ করার জন্যে দেশের সর্বত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অনতিবিলম্বেই সরকারের কঠোর দমন নীতির ফলে আমাদের এই পরিকল্পনা তখনকার মতো স্থগিত রাখতে হয়। এরপর আন্দোলন ব্যক্তিগত পর্যায়ের তৎপরতা পর্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে।

টালবাহানা ও প্রতারণা

এর কিছুদিন পরে জামাল নাসেরের গুপ্তচর বাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তা আমার সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলামী মহিলা সংস্থাকে পুনর্জীবিত করার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রস্তাব ও শর্ত আরোপ করে। তারা আমাকে আমার পত্রিকাও ফিরিয়ে দেয়ার শর্ত সাপেক্ষ প্রস্তাব করে। এছাড়া আমাকে মাসিক তিনশো মিশরীয় পাউন্ড ভাতা দেয়ারও প্রস্তাব করে। কিন্তু এসব কিছুর বিনিময়ে তারা চায় আমি যেন ইসলামী আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখি।

আমি তাদেরকে বললাম–

ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের বিনিময়ে দুনিয়ার সব সম্পদ এবং সব শক্তিকেও আমি অতি তুচ্ছ মনে করি। আমি আপনাদের এসব প্রলোভন এবং শর্ত সাপেক্ষ প্রস্তাবাবলী প্রত্যাখ্যান করছি।

আমার স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও গুপ্তচর বাহিনীর কর্মকর্তারা পুণরায় আমাকে বলে–

"দেখুন, আপনার সংস্থা যদি সরকারী দলের সহায়ক দল হিসেবে ময়দানে আসতে চায় তাহলে অতি শিগ্‌গীরই তা পূনর্জীবিত করা হবে এবং বার্ষিক কুড়ি হাজার পাউন্ডের বিশেষ ভাতাসহ আপনাকে আপনার সদর দফতরও ফিরিয়ে দেয়া হবে।"

এর জবাবে আমি তাদের বললাম–

"আপনারা বারবার একটি ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন। আপনাদের জানা উচিৎ যে, ইসলামের পথ থেকে কোন লোভ বা ভয়ভীতি আমাদের বিচ্যুত করতে পারেনা। ধর্ম নিয়ে যারা ব্যবসা করে আমরা তাদের অন্তর্ভূক্ত নই। আমরা নিজেরা যেমন বিভ্রান্ত নই, তেমনি অন্য কাউকেও বিভ্রান্ত করার কথা চিন্তা করতে পারিনা। কোন রকমের গোঁজামিল বা অস্পষ্টতায় আমরা বিশ্বাস রাখিনা। আপনারা আসতে পারেন।"

এরপরও তারা বিভিন্ন উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাবাবলী পেশ করতে থাকে এবং কোন না কোনভাবে আমাকে আপোষে আনার চেষ্টা চালায়। তাদের এই হাস্যকর প্রয়াসে আমি বিস্মিত হই এবং এটাকে কোন নতুন সরকারী নাটকের অনুশীলন বলেই অনুমান করি। বস্তুত আমার সেই অনুমান যে সত্য ছিল, শীঘ্রই তা প্রমাণিত হয়। তাদের সব প্রয়াসই ছিল পরবর্তী ষড়যন্ত্রের পটভূমি মাত্র।

রাতের উল্লুক

একদিন বিকেলে তিন ব্যক্তি আমার বাড়ী পৌঁছে আমার সাথে সাক্ষাতের আবেদন জানায়। আমি অতিথিদের সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে গিয়ে দেখি, তিনজনই আরবী পোষাক পরিহিত। সালাম বিনিময়ের পর আমি তাদের এখানে আমার কাছে আসার উদ্দেশ্য জানতে চাইলে তাদের একজন বললো–

"আমরা সিরীয় নাগরিক। বর্তমানে সৌদী আরব থেকে সংক্ষিপ্ত ছুটি কাটানোর জন্যে কায়রো এসেছি। আমরা সউদী আরবে ইখওয়ান নেতা সাঈদ রমজান, শেখ মোস্তফা আলম, কামেল শরীফ, মুহাম্মদ উসমাভী এবং ফত্হী খোলির সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছি। (উল্লেখযোগ্য যে এসব নেতা, জামাল নাসেরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সউদী আরবে নির্বাসন নিতে বাধ্য হয়।) তাঁরা মিশরীয় জনগণের কাছে সালাম ও শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন এবং আন্দোলনের প্রতি জনসাধারণের অবিচল আস্থা কামনা করেন।"

এরপর তিন ভদ্রলোক ইখওয়ান এবং জামাল নাসের সম্পর্কে নিজেরাই আলোচনা করতে থাকে। নাসের ইখওয়ানের উপর যেসব জুলুম নির্যাতন চালিয়েছে, ১৯৫৪ সালে ঘটনাবলী এবং আবদুল কাদের আওদাহ ও তাঁর সহকর্মীদের শাহাদাতের ব্যাপার নিয়ে অনেক আলোচনার পর আমাকে বলে যে, দেশে বিদ্রোহ সৃষ্টি এবং নাসেরকে হত্যার জন্য তারা প্রস্তুত আছে এবং নির্বাসিত ইখওয়ান নেতৃবর্গ এ ব্যাপারে তাদের সাথে একমত। এরপর তারা জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে তাকায়। আমি এতক্ষণ চুপচাপ-কেবল তাদের কথা শুনছিলাম। এবার আমি বললাম–"আপনারা যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন, তা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন বিষয় এবং পরিভাষা বলে মনে হচ্ছে। আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানিনে এবং জানতেও চাইনে।"

আমার কথা শুনে তারা বললো– "তাহলে আমরা মুর্শিদে আম এবং দলের মতামত জানার জন্যে পরে আবার আপনার কাছে আসবো।"

আমি বললাম– "আমি ইখওয়ানের কোন গুপ্ত দল সম্পর্কে কিছুই জানিনে। তাছাড়া রাজনৈতিক দল হিসেবে সরকার ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমি এ ব্যাপারে মুর্শিদে আমের সাথে কোন রকমের আলাপ-আলোচনা করতে অক্ষম। কারণ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও পারিবারিক মিত্রতার উপরও আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত। আমার মতে জামাল নাসেরকে হত্যা করার মতো কোন কথা কোন মুসলমানই চিন্তা করছে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের নিজ দেশে ফিরে গিয়ে আত্মশুদ্ধি অর্জনের পরামর্শ দেয়া ছাড়া আর কোন সেবা করতে সক্ষম নই।"

আমার কথা শেষ হবার পর ওদের একজন বললো–

"আপনি সম্ভবতঃ আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট। কিন্তু বলুনতো, নাসের কি দেশকে ধ্বংস করে ছাড়েনি?"

"কিন্তু নাসেরকে হত্যা করা ইখওয়ানের উদ্দেশ্য নয়।"

আমি এই বলে তাদের নাম জানতে চাইলাম। নাম বলতে গিয়ে তারা তিন জনেই থতমত খেলো যেন। কিছুটা ইতস্ততঃ করে একজন বললো তার নাম আবদুশশাফী আবদুল হক, অপরজনের নাম আবদুল জলীল ইষা এবং তৃতীয় জনের নাম আবদুর রহমান খলিল। তাদের নাম বলার ঢং এবং প্রত্যেকের নামের আগের আবদু শুনে আমি আর হাসি লুকাতে পারলাম না, যা বোঝার দরকার তা বুঝে আমি তাদেরকে বললাম–

"ভায়েরা আমার, নাসেরের গুপ্তচর বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে হেস্তনেস্ত হবার আগে শিগগীর স্বদেশে ফিরে যাওয়াই আপনাদের জন্যে উত্তম।"

এর জবাবে একজন বললো– "আপা জীনত! আমাদের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করার অধিকার আপনার অবশ্যই রয়েছে। তবে, এটা আপনি শিগগীরই জানতে পারবেন যে, আমরা কারা!" এরপর তারা চলে যায়।

পরে আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইল আমার কাছে সাক্ষাতের জন্যে এলে আমি তাঁকে এসব কৃত্রিম নিরীহ নাগরিকদের কাহিনী বর্ণনা করি।

সবাই আহমদ রাসেখ

এরপর দু'সপ্তাহও কাটেনি, একদিন আহমদ রাসেখ নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ভদ্রলোক তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে জানান যে, তিনি গোয়েন্দা বাহিনীর লোক। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকার পর, সপ্তাহ

দু'য়েক আগে সেই তিন জন সিরীয় নাগরিকের সাথে আমার কি আলোচনা হয়েছিল তা জানতে চাইলেন।

আমি নির্লিপ্ত ভাবে বললাম–

"আমার যতটুকু বিশ্বাস, সেই তিন ভদ্রলোক মোটেই সিরীয় নাগরিক নন। আসলে ওরা আমাকে বোকা মনে করেই এসেছিলেন' আরো বোকা বানানোর উদ্দেশ্যে। আমার পত্রিকা এবং সদর দফতর ছিনিয়ে নেয়ার পরও প্রশাসন এসব নাটকীয় পাঁয়তারা খেলছেন কেন তা বুঝতে সত্যিই অক্ষম আমি। আসলে সরকারের উদ্দেশ্য কি?" এরপর গোয়েন্দা বাহিনীর ভদ্রলোক প্রসংগ পাল্টিয়ে প্রশ্ন করেন–

ঃ জামালূফ এবং জামালূফা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

ঃ এরা সবাই বিভ্রান্ত নাস্তিক। অন্যায় ও অবৈধ তৎপরতায় এরা সিদ্ধহস্ত। ভদ্রলোক আমার কথায় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বললেন–

ঃ দেখুন আপা, আমরাও তো মুসলমান।

ঃ শুধু নাম মুসলমানের মতো হলেই কেউ মুসলমান হয়না, বরং মুসলমান কি অমুসলমান, তা প্রমাণিত হয় কাজের মাধ্যমে– আমি বললাম।

"আপনারা ইসলামের দিকে যে আহবান জানাচ্ছেন, তাতে সাড়া দিতে আমাদের মন প্রস্তুত নয়। আর আপনাদের আহবান বিবেচনা করতেও আমরা অক্ষম। তা' আপনারা আপনাদের কাজ করুন এবং আমাদেরকে আমাদের কাজে মগ্ন থাকতে দিন।" বলতে বলতে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান। আমি তাঁকে বললাম–

ঃ "আল্লাহ্ সবাইকে হেদায়াত করুন এবং আমাদের সবাইকে ন্যায় ও সত্য পথে পরিচালিত করুন।"

এই সাক্ষাতের দু'দিন পরে একটি সরকারী মোটর গাড়ী আমার বাড়ীর আঙ্গিনায় এসে দাঁড়ায়। ছাই রং-এর স্যুট পরিহিত এক যুবক গাড়ী থেকে নেমে এসে আমাকে সালাম জানিয়ে বলে–

"আমি আহমদ রাসেখ, গোয়েন্দা বাহিনীর অফিসার।" আমি যুবককে আগাগোড়া নিরীক্ষণ করে স্বরাষ্ট দফতরের সেই আহমদ রাসেখের সাথে মিল খুঁজছিলাম, যে আমাকে এর আগে স্বরাষ্ট দপ্তরে ডেকে পাঠিয়েছিল। ওর অফিসের বাইরের নেমপ্লেটেও একই নাম 'আহমদ রাসেখ' লেখা ছিল। আমাকে মৌন থাকতে দেখে যুবক অফিসার বললো–

"দু'দিন আগেও জনৈক আহমদ রাসেখ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে গেছেন। আর এখন আমি তৃতীয় আহমদ রাসেখ আপনার সামনে উপস্থিত।"

ওর কথা শুনে আমি আরো গভীর দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করতে চাইলাম। একই বিভাগে একই নামের তিনজন পদস্থ অফিসার কেমন যেন হে'য়ালীর মতো মনে হচ্ছিল আমার কাছে। আমাকে চুপচাপ নিরীক্ষণ করতে দেখে যুবক অফিসার জড়সড় হয়ে বললো–

ঃ একান্ত বিস্ময়ের সাথে আপনি চুপচাপ আমাকে কি দেখছেন? অসময়ে এসেছি বলে বিরক্ত হয়েছেন বুঝি?

আমি স্মিত হেসে তার কথা এড়িয়ে গিয়ে বললাম-

ঃ মেহমানদের স্বাগত জানাবার জন্যে তো এ ঘরের দ্বার সব সময়ই উন্মুক্ত রয়েছে। যাই হোক, তোমাকে একটি মজার ঘটনা শোনাবার প্রয়োজন মনে করছি, শোন। ঘটনাটি সম্ভবতঃ আল-আহ্‌রাম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঘটনাটি ছিল এরকম– "কয়েক বছর আগের কথা। হল্যান্ডের রাণী এবং তাঁর স্বামী ইংল্যান্ডের রাজার আমন্ত্রণে লন্ডনে বেড়াতে গেছেন। একদিন আলোচনাকালে হঠাৎ দেখা গেল, হল্যান্ডের রাণী চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে রিসেপশনের কক্ষে মোতায়েন বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি কুকুরের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ গভীরভাবে কুকুরটিকে দেখলেন। তারপর পাগলপ্রায় হয়ে কুকুরটিকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেতে লাগলেন। এরপর কুকুরটিকে তাঁর স্বামীর কাছে হস্তান্তর করে কানে কানে কি যেন বললেন। তারপর দেখা গেল তাঁর স্বামীও পাগলপ্রায় হয়ে কুকুরটিকে চুমু খেতে লাগলেন। ইংল্যান্ডের রাজা ও রাণী বড্ড অবাক হয়ে এসব কান্ড দেখতে থাকেন। তাঁদের বিস্ময়ের আর সীমা রলো না, যখন দেখলেন যে, স্বামীর কাছ থেকে কুকুরটিকে ফিরিয়ে নিতে গিয়ে হল্যান্ডের রাণীর চোখে অশ্রু টলমল করছিল। কুকুরটিকে তিনি ঠিক আপন সন্তানের মতো বুকে চেপে ধরেছিলেন। এর কিছুক্ষণ পরে, রাজকীয় ভোজের সময়ও দেখা গেল, তিনি কুকুরটিকে বরাবর কোলে চেপে রেখেছেন।"

এবার ইংল্যান্ডের রাণী সম্মানীতা অতিথিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন–

"যে কুকুরটিকে আপনি এতো আদর করছেন, তার মালিক হচ্ছে রাজকুমারী; সেও কুকুরটিকে খুব ভালোবাসে। নয়তো কুকুরটি আপনাকে উপহার দিতে পারলে আমরা বেশ আনন্দিত হতাম।"

হল্যান্ডের রাণী, আত্মার ভিন্ন অস্তিত্ব রূপধারণের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বললেন–

"কয়েকবছর আগে আমার একমাত্র পুত্র সন্তানের বিয়োগ ঘটে। আমার বিশ্বাস, আমার ছেলের আত্মা এই কুকুরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। দেখুন না, কুকুরের চোখ দুটি হুবহু আমার ছেলের চোখের মতো।"

একথা শুনে ইংল্যান্ডের রাণী কুকুরটিকে হল্যান্ডের রাজদম্পতিকে উপহার হিসেবে প্রদান করতে সম্মত করান রাজকুমারীকে। বলাবাহুল্য, রাজকুমারী কুকুরটি হল্যান্ডের রাজা ও রাণীকে উপহার দেন। ঘটনাটি বর্ণনা করে আমি যুবককে বললাম–

ঃ তা জনাব রাসেখ সাহেব, যারা আত্মার রূপান্তরে বিশ্বাস করে, তারা কোন না কোন পশুর মধ্যে তাদের মৃত আপন জনের ছাপ দেখতে পায় কিন্তু আমি ভেবে বিস্মিত হচ্ছি যে, মিশরীয় গোয়েন্দা বাহিনীর যে তিন ব্যক্তির সাথে আমার দেখা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের নাম আহমদ রাসেখই বটে! কিন্তু তাদের শরীর, চেহারা এবং বর্ণে বিন্দুমাত্র মিলও নেই, এমনকি ভাব-ভঙ্গিতেও কোন সামঞ্জস্য নেই। তা তোমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব কি আত্মার রূপান্তর সম্পর্কিত কোন নতুন মতবাদ আবিষ্কার করেছেন? সম্ভবতঃ তোমাদের সেই নতুন মতবাদের অনুসরণ করতেই বলা হচ্ছে; কি বল, ব্যাপারটি কি সে রকম কিছু? আমার কথা শুনে ওর চেহারার রং বদলাচ্ছিল যেন, সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার চেষ্টা করে বললো–

ঃ দেখুন মাদাম! আমরা কোন আজে বাজে লোক নই। আমরাও সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। আপনাকে ব্যথিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরাতো কেবল আপনার সাথে একটা সমঝোতায় আসার চেষ্টা করছি। আসলে প্রকৃত আহমদ রাসেখ আমিই।

ঃ কিন্তু তুমিই আসল, অন্যরা নকল-তা বিশ্বাস করবো কোন যুক্তিতে! তাছাড়া ওসবে আমার দরকারই বা কি। তোমরা আমার কাছে কি চাও, তা কি স্পষ্ট করে বলতে পারবে?

ঃ ব্যাপার হচ্ছে, সরকার আপনার সাথে সমঝোতা করতে আগ্রহী। আমরা মনে করি, ইখওয়ানুল মুসলেমুন আপনাকে বিভ্রান্ত করছে। ওরা অরাজকতায় বিশ্বাসী লোক। এজন্যে আমরা আপনাকে যে কষ্টটুকু দিতে চাই, তা হচ্ছে– আপনি শুধু ইখওয়ানের কাছে সক্রিয় লোকদের নাম জানিয়ে

দিন। এর বিনিময়ে খোদ প্রেসিডেন্ট আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবেন এবং আপনার সব প্রয়োজন মেটানো হবে। আমরা আশা করবো, আপনি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ইখওয়ানী সন্ত্রাসবাদীদের নামের তালিকা আমাদেরকে দেবেন। আমরা ভেবে অবাক হয়েছি যে, আপনার মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয়া এবং বুদ্ধিমতী নেত্রী কিভাবে ইখওয়ানিদের চক্রান্তের শিকার হলেন!

সে আরো বলে চললো–

"ইমাম হুজায়বী এবং সাইয়েদ কুতুবের মতো বড়বড় ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ এখন প্রেসিডেন্টের সাথে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট তাঁদের উপর সন্তুষ্ট নন বলে তাঁদের আগ্রহে সাড়া দিচ্ছেন না। বস্তুতঃ ইখওয়ানুল মুসলেমুন আপনার সম্পর্কে যেসব প্রচারণা চালাচ্ছে, আপনি যদি সে সম্পর্কে অবহিত হতেন তাহলে এক্ষুণি আমাদের সাথে সমঝোতায় আসতেন এবং এক্ষুণি ইখওয়ানের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতেন।"

এতক্ষণ পর্যন্ত এই যুবক গোয়েন্দা কর্মকর্তার মিথ্যে বচন এবং অমূলক কথাবার্তা শুনে বিরক্তি প্রকাশের পরিবর্তে আমি হেসেই দিলাম এবং বললাম–

ঃ বৎস, তুমি গোয়েন্দা বিভাগের কে বা কি, এবং তোমার কথাবার্তা, নাম বা চেহারা, বর্ণ যাচাই করার কোন প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করছিনা। আমার এতটুকু বক্তব্যেই আশা করি তোমার জন্য যথেষ্ট। তবে, ছেলে মনে করে আরো একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। তা হচ্ছে, ইসলামী আদর্শকে যথার্থভাবে জেনে বুঝে তার অনুসরণের চেষ্টা কর। পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যের ধার করা কোন ইজম বা মতবাদের পেছনে অন্ধের মতো ছুটে যেওনা। কেন, সত্য ও মিথ্যের প্রভেদ বোঝা কি তোমার পক্ষে অসম্ভব? কেন, তবে তোমরা মুসলমান হয়ে সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিচ্ছ। আর কেনইবা বিদেশী শক্তির ইঙ্গিতে নাচতে গিয়ে নিজের জীবনকে বরবাদ করে দিচ্ছ। সংশয়-সংকটের আবর্ত থেকে মুক্তি পেয়ে তোমাদের মতো যুবকরা যে কবে ইসলামী পতাকার ছায়াতলে একতাবদ্ধ হবে আমি সেদিনেরই অপেক্ষা করছি।"

সে যে একজন ভাল মুসলমান, তা প্রমাণ করার জন্যে আমাকে বললো–

ঃ মাদাম, আল্লাহ্র শপথ, আমি নিয়মিত জুময়ার নামাজ আদায় করি। এছাড়া অন্যান্য নামাজ এবং ফরজ ওয়াজেব ইত্যাদি.....আমার আব্বু আমাকে ছোটবেলা থেকেই জুময়ার নামাজ পড়তে নিয়ে যেতেন বলে আমি তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

ঃ তুমি কি তোমার আব্বুকে কখনো জিজ্ঞেস করেছ যে, তিনি কেবল জুময়ার নামাজই আদায় করেন কেন?

ঃ দেখুন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ বলাটি কি মুসলমান হবার জন্যে যথেষ্ট নয়?

ঃ কিন্তু এই কালেমার ঘোষণা মোতাবেক যদি জীবন যাপন না কর তাহলে যে হিতে বিপরীত হবে। কলেমা পড়ার পরে তোমার ইসলামী দায়িত্ব কি আরো বেড়ে যায় না?

ঃ শাসকদের অনুসরণ ও আনুগত্য করা উচিৎ।

ঃ ঠিক আছে তাহলে, রোজ কেয়ামতের দিন সেসব-বেচারা শাসকদের সাথেই সারিবদ্ধহবার জন্যে তৈরী থেকো।

ঃ দেখুন, আমি সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম।

ঃ তবে জেনে রেখো যে, নবী-রাসূলদের সত্য শিক্ষার সাথে শয়তানী মিথ্যার সমঝোতা কোনদিন হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবেনা। আমরা ইসলামের পথে অবিচল থাকতে সংকল্পবদ্ধ বাতিলের সাথে আপোষের কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনা। যতক্ষণ না তোমরা এবং তোমাদের সরকার সত্যদ্বীনের অনুসারী হবে, ততক্ষন আমাদের ও তোমাদের মধ্যেকার বিরোধ অব্যাহত থাকবে।

একথা শুনে যুবক গোয়েন্দা অফিসার খুব রাগান্বিত হয়ে বললো–

ঃ আমি, আর কোনদিন আপনার কাছে আসবোনা। যদি যোগাযোগ করতে চান তাহলে এই রলো আমার টেলিফোন নাম্বার.....। আমি হেসে বললাম–

ঃ ধন্যবাদ, এর দরকার আমার কোনদিনই হবে না।

১৯৬৫ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে ব্যাপক হারে ইখওয়ান নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারীর খবর আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। কেননা, ইখওয়ানের মহান আন্দোলনের সাথে আমার অত্যন্ত গভীর এবং পুরনো সম্পর্ক রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আনুগত্যের শপথ

যেমন আগে বলেছি, ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সাথে আমার সম্পর্ক যেমনি গভীর তেমনি পুরনো। অথচ সরকারী কর্মকর্তারা ভেবেছিল, ইখওয়ানের সাথে আমার সম্পর্ক হতে যাচ্ছে সবেমাত্র। বস্তুতঃ ১৯৩৭ থেকেই আমি ইখওয়ানের সাথে সম্পৃক্ত। ইসলামী মহিলা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তেরশো আটান্ন হিজরীতে। এর মাস ছয়েক পরে একদিন ইমাম হাসানুল বান্নার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইখওয়ানের সদর দফতরে মহিলাদের জন্যে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তৃতা দানের পরপরই ইমাম বান্না আমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দেন। তিনি তখন ইখওয়ানের মহিলা বিভাগ কায়েম করতে চাচ্ছিলেন। আলোচনাকালে তিনি সার্বিক পর্যায়ে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরপর প্রায় প্রতিটি প্রস্তাব এবং মতামতের সাথে আমি একমত পোষণ করি। অবশেষে তিনি আমাকে ইখওয়ানের মহিলা বিভাগের সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। বস্তুতঃ এই মহিলা দল ছিল ইখওয়ানেরই একটি শাখা। আমি ইমাম বান্নার প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্যে আমার দলীয় নেত্রীদের সাথে আলোচনা করি। তারা প্রত্যেকেই বৃহত্তর পর্যায়ে উভয় দলের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা এবং সর্বক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রস্তাব মেনে নেন; কিন্তু ইখওয়ানের একটি অংগ শাখার সভানেত্রী হিসেবে আমার ইখওয়ানে অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব নাকচ করে দেন। অবশ্য, এরপরেও নিয়মিত আমাদের দেখা সাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। আমাদের প্রত্যেকেই ইমাম হাসানুল বান্নার মতাতমতকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতো এবং ইমামকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করতো-ভালোবাসতো।

শেষ পর্যন্ত আমরা পৃথক দল হিসেবেই থেকে গেলাম। কিন্তু আমাদের সম্পর্ক দিন দিন মজবুততর হতে থাকলো। আমি সংস্থার কেন্দ্রীয় দফতরে আয়োজিত শেষ বৈঠকে ইমাম বান্নার কাছে এই শপথ

করি যে, আমার দল আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখা সত্ত্বেও ইখওয়ানের প্রতিটি ডাকে সাড়া দেবে এবং একই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাবে।

কিন্তু এতে ইমাম বান্না পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন, আমি যেন ইখওয়ানের মহিলা শাখার নেতৃত্বের জন্যে আত্মনিয়োগ করি।

যাই হোক, এর পরবর্তী অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৯৪৮ সালে দুর্ঘটনার পর হঠাৎ ইখওয়ানুল মুসলিমুনকে নিষিদ্ধ করা হয় এবং ইখওয়ানের সব তহবিল বাজেয়াপ্ত করা হয়। ইখওয়ানের সব দফতর তালাবদ্ধ করা হয় এবং বেপরোয়াভাবে ইখওয়ান নেতা ও কর্মীদের গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করা হয়। এই অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক সংকটের সময় ইসলামী অন্দোলনের মহিলা কর্মীরা অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ এবং নির্ভীক ভূমিকা পালন করে। আমি আমার ভাবী এবং চাচাতো বোন তাহিয়া জুবিলির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করি এবং শিগগিরই অনুভব করি যে, আমাকে ইমাম বান্নার প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে মেনে নেয়াই উচিৎ ছিল। ইমামের প্রস্তাব মেনে নেইনি বলে আমি অনুতাপবোধ করলাম।

ইখওয়ানকে নিষিদ্ধ ঘোষণার পরবর্তী দিনই আমি দলের কেন্দ্রীয় দফতরে আমার নির্দিষ্ট কক্ষে উপস্থিত হই। এই সেই কক্ষ, যেখানে ইমাম বান্নার সাথে আমার আলাপ হয়েছিল। আমি তখনো কক্ষে শ্রদ্ধেয় বান্নার মহান অস্তিত্ব অনুভব করছি যেন! দুঃখে অনুশোচনায় আমার অন্তর জ্বলছিল তখন। দু'চোখ বেয়ে দরদর করে গড়িয়ে পড়ছিল তপ্ত অশ্রুধারা। আমি স্বগতোক্তি করে বলে যাচ্ছিলাম–

"ইমাম বান্না যথার্থই সত্যনির্ভর ছিলেন। ইমামের অনুসরণ করে সত্যের পথে জিহাদী ঝান্ডা উড়িয়ে এগিয়ে চলা প্রতিটি মুসলমানদের কর্তব্য। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ইমাম যে পথে ডাক দিয়েছেন, তাছাড়া মুক্তি ও শান্তির বিকল্প কোন পথ নেই। হাসানুল বান্নার মতো বিজ্ঞ, দুরদর্শী এবং নির্ভীক নেতৃত্বই মুসলিম মিল্লাতকে তার মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছাতে সক্ষম।"

পরমুহূর্তেই আমি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে পাঠাই ভাই আবুদল হাফিজ আস্‌সাইফিকে ডেকে আনতে। এর মাধ্যমেই আমি ইমাম বান্নার

সাথে অলিখিত তথ্যাদি আদান-প্রদান করতাম। আমি তাঁর মাধ্যমে ইমামকে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী মোতাবেক আলোচনায় মিলিত হবার কথা স্মরণ করিয়ে দেই। ভাই আব্দুল হাফিজ যখন ইমামকে সংবাদ পাঠিয়ে তাঁর সম্মতি নিয়ে ফিরে এলো, তখন আমি আমার ভাই মুহাম্মদ আল গাজ্জালী এবং তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে ইমাম বান্নার কাছে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত চিঠি পাঠাইঃ

"মুহতারাম ইমাম হাসানুল বান্না!

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন এবং ইসলামের খেদমতের জন্যে আমি জীবনের অন্যান্য সব তৎপরতা বর্জন করে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হবার জন্যে উদগ্রীব। আপনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব, যার পথ-নির্দেশ এবং পৃষ্ঠপোষকতা আমার একান্ত কাম্য। আল্লাহ্‌র দ্বীনের সেবার জন্যে আপনি আমাকে যে নির্দেশ দেবেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই হবে আমার জীবনের মহত্তম ব্রত। মুহতারাম ইমাম! আপনার নির্দেশের অধীর অপেক্ষায় –আল্লাহর দাসী।"

–জয়নব আল-গাজ্জালী।

এরপর ইমাম বান্নার সাথে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করার জন্যে উপযুক্ত স্থান হিসেবে মুসলিম যুব সংস্থার কেন্দ্রীয় দফতর নির্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্যে কোন সময় বা তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি। সুযোগ মত আকস্মিক সাক্ষাতেরই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

একদিন আমি মুসলিম যুব সংস্থার কেন্দ্রীয় দফতরে আয়োজিত সম্মেলনে বক্তৃতা করার জন্যে যাচ্ছি, হঠাৎ সিঁড়ির গোড়াতেই মহামান্য ইমামকে আমি দেখতে পাই। তার এই সাধারণ ও অনাড়ম্বর উপস্থিতিতে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হই এবং ভাবাবেগ ও আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়ি। আমি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসার আগেই সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতেই মুহতারাম ইমাম বান্নার সাথে আলাপ শুরু করি।

সর্বপ্রথম আমি তাঁকে বললামঃ

"শ্রদ্ধেয় ইমাম! আমার মুর্শেদ। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা এবং ইসলামী সরকার কায়েমের উদ্দেশ্যে আপনি যে মহতী প্রয়াস চালাচ্ছেন, আমি তার সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত এবং এ পথে যে কোন ত্যাগ-তিতিক্ষা এমনকি প্রাণ দিতেও দ্বিধা করবো না। আমি সর্বান্তঃকরণে আপনার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার প্রতিজ্ঞা করছি।"

ইমাম আমার কথায় এবং প্রতিজ্ঞায় অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন "ইসলামী মহিলা সংস্থা আপাততঃ যেভাবে কাজ করছে, সেভাবেই করতে থাকুক।"

আমার এবং ইমাম বান্নার সাথে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয় আমার ভাইকে। ইমাম বান্না মুহাস এবং ইখওয়ানের মধ্যে মধ্যস্থতা রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন আমার ওপর। তখন রাফয়াত, মুস্তফা পাশা আন-নুহাস দেশের বাইরে ছিলেন। এঁরা মরহুম আমীন খলিলীকে বিভ্রান্তি দূরীকরণ অভিযানের দায়িত্ব অর্পন করেন। এ ব্যাপারে ইমাম বান্নাও একমত ছিলেন। আমাকেও যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়।

১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এক রাতে জনাব আমীন খলিলী আমার কাছে আসেন। তাঁর চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ ছিল স্পষ্ট। তিনি বললেন- কর্তৃপক্ষ ইমাম বান্নাকে হত্যার পরিকল্পনা নিচ্ছে। তাঁকে শিগগিরই কায়রো থেকে বের করার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু আমার ভাইকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ইমামের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম কেউ ছিল না। ফলে আমি নিজেই ইমামের সাথে দেখা করার জন্যে রওয়ানা হই। কিন্তু দূর্ভাগ্য। আমার, আমার জাতির এবং গোটা বিশ্বমানবতার দূর্ভাগ্য যে, আমি অর্ধপথেই মুহতারাম ইমামের মর্মান্তিক শাহাদাতের সংবাদ পাই। শতাব্দির মহান বিপ্লবী নায়ককে মানবতার শত্রুরা নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই নিষ্ঠুরতম হত্যাকান্ডে গোটা জাতি ক্ষোভে-দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। হন্তাদের প্রতি সর্বত্র তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করা হয়। আমি প্রকাশ্যভাবে সরকারের এই বর্বর-তম হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা ও আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ করি। এরপর দেশে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় এবং নতুন সরকার অবিলম্বে ইসলামী মহিলা সংস্থাকে বেআইনী ঘোষণা করে।

আমি সরকারের ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা দায়ের করি। ১৯৫০ সালে জনাব হুসাইন সিররী পাশার আমলে আদালত আমাদের পক্ষে রায় দেন এবং ইসলামী মহিলা সংস্থার তৎপরতা আবার পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। এই ঐতিহাসিক মামলায় আমাদের পক্ষের কৌশুলী ছিলেন প্রখ্যাত আইনবিদ জনাব আব্দুল ফাত্তাহ হাসান পাশা।

এরপর ওয়াফদ পার্টির সরকার গঠিত হয় এবং জনাব ইমাম হাসান হুজায়বীর নেতৃত্বে ইখওয়ানুল মুসলিমুন আবার কর্মতৎপরতা শুরু করে। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কেন্দ্রীয় দফতর উদ্বোধনের প্রথম দিনেই আমি প্রকাশ্যভাবে ইখওয়ানের সাথে আমার সার্বিক সম্পর্কের কথা ঘোষণা করি, এবং মুর্শিদে 'আম' জনাব হুজায়বীর ব্যক্তিগত দফতর হিসেবে ব্যবহারের জন্যে আমার বাড়ীর সবচেয়ে বড় এবং সুসজ্জিত হল ঘরটি উৎসর্গ করি।

ইখওয়ানের ভাই আব্দুল কাদের আওদাহ্ এ জন্যে ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করে আমাকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন–

"ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সাথে সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আপনার প্রকাশ্য ঘোষণা সত্যিই প্রশংসনীয় এবং আমাদের জন্যে অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। বস্তুতঃ এটাকে আমাদের বড় সৌভাগ্যই বলতে হবে।"

আমি বিনয়ের সাথে বললাম– যা হয়েছে তার জন্যে আল্লাহ্কে অশেষ শুকরিয়া। বলা বাহুল্য, ইখওয়ানের সাথে অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এর মধ্যেই জেনারেল নজীবের নেতৃত্বে সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। বিপ্লবের কয়েকদিন আগে আমীর আব্দুল্লাহ্ ফয়সলসহ জেনারেল নজীব আমার সাথে দেখা করেন। এই বিপ্লবের প্রতি ইখওয়ান এবং মহিলা সংস্থার কিছুটা সহানুভূতি ছিল।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বিপ্লবী সরকারের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা এবং কাজকর্মের মধ্যে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে ইখওয়ান নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় আমি আমার মতামত প্রকাশ করি। পরে যখন নজীব সরকার ইখওয়ানের কয়েকজন সদস্যকে মন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় অংশগ্রহণের প্রস্তাব করেন, তখন আমি আমার পত্রিকার মাধ্যমে এই বলে প্রস্তাবের বিরোধীতা করি– "যেহেতু বিপ্লবী সরকার আন্তরিকতার সাথে ইসলামী জীবনাদর্শে অনুসারী নন বলে প্রকাশ পাচ্ছে– সুতরাং ইখওয়ানের কোন ব্যক্তিই এ ধরনের সরকারের সাথে মৈত্রী স্থাপন বা তার অধীনে দায়িত্ব পালনের কথা ভাবতেও পারে না। যদি কোন ব্যক্তি তা করে তাহলে তাকে ইখওয়ান থেকে বহিষ্কার করা উচিৎ। বস্তুতঃ বিপ্লবী সরকারের আসল উদ্দেশ্য স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ইখওয়ানকে তার ভূমিকা ও নীতির উপর অটল থাকতে হবে।"

পত্রিকায় আমার বক্তব্য প্রকাশের পর জনাব আব্দুল কাদের আওদাহ্ আমার সাথে সাক্ষাৎ করে আপাততঃ এ ধরনের বক্তব্য প্রকাশ মূলতবী রাখার অনুরোধ করেন। এর পরবর্তী দু'সংখ্যায় আমি এ ব্যাপারে কিছুই লিখিনি। কিন্তু পরে আবার লিখতে শুরু করি। এবার জনাব আব্দুল কাদের আওদাহ্ জনাব হুজায়বীর নির্দেশপত্র নিয়ে আসেন। তাতে তিনি এ ব্যাপারে কিছু লিখতে নিষেধ করেন। বলাবাহুল্য, আমি এই নির্দেশ মেনে নেই। নেতার নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব ছিল না। এ সময় সব ব্যাপারেই আমি ইমাম হুজায়বীর আদেশ নিষেধ-মোতাবেকই কাজ করি। এমনকি তাঁর অনুমতিতেই আমি শান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করি।

মুখোস উম্মোচিত

সময় তার নির্ধারিত গতিতে কালের প্রেক্ষাপট অতিক্রম করছিল। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ভয়াবহ ঘটনাবলী দেশের ভাগ্যাকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করে তোলে। জামাল আব্দুন নাসের তার মুখোস খুলে ফেলে তার আসল পৈশাচিক রূপে ধরা দেয়। সে প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিরোধীতা শুরু করে এবং ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার অঙ্গীকার করে। এক্ষেত্রে বিদেশী শক্তিবর্গ এবং তাদের দেশীয় চরেরা তাকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। নাসের কাল বিলম্ব না করে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়ার জঘন্য হুকুম জারী করে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান বীর জনাব আব্দুল কাদের আওদাহ্ এবং শেখ মোহাম্মদ ফরগালীর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নেতাদের শুধু এই জন্যেই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। কারণ, তারা দেশের সার্বিক উন্নতি এবং জনগণকে মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের দাবী তুলেছিলেন। নাসের ইমাম হুজায়বীর মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ নেতাকেও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়ার হুকুম দেয়। কিন্তু আকস্মিক হৃদরোগ আক্রান্ত হওয়ার কারণে ডাক্তাররা তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলানোর অযোগ্য ঘোষণা করে। তারা এও বলে যে, এই বুড়ো এমনিতেই কয়েক ঘন্টার বেশী বাঁচবেন না। সুতরাং ফাঁসিতে ঝুলানোর দরকার হবে না। একই কথা ভেবে জামাল নাসের জনাব হুজায়বীর ফাঁসির দন্ড মওকুফ করে।

কিন্তু রাখে আল্লাহ্ মারে কে? ইমাম হুজায়বী অচিরেই সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং নাসেরের জুলুম নির্যাতন এবং রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে দ্বিগুণ উৎসাহ-

উদ্দীপনা নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। তাঁর নির্ভীক পদক্ষেপ এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ইসলামী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে সরকার ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে গ্রেফতার করে এবং সামরিক কারাগারে নিক্ষেপ করে। সেখানে তাঁর উপর যে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়, তাতে অতি পাষন্ডের চোখও অশ্রু ছলছল হতে বাধ্য। কিন্তু ইমাম হুজায়বী অতি ধৈর্য ও সহনশীলতা মূর্ত প্রতীক হয়ে সব অত্যাচার সহ্য করেন।

শেষ পর্যন্ত এই বৃদ্ধ নেতার চোখের সামনেই নাসের এবং তার সাংগপাংগদের মৃত্যু ও পতন ঘটে। প্রেসিডেন্ট নাসেরের স্বৈরাচারী আমলে অবর্ণনীয় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেকেই যখন আপাততঃ চুপচাপ নিস্ক্রিয়তা অবলম্বনের অনুমতি চেয়ে ইমাম হুজায়বীর কাছে আসেন, তখন বৃদ্ধ ইমাম হুজায়বী একজন নবীন বিপ্লবীর মত উদ্দীপনা প্রকাশ করে বলেন–

"তোমরা কারা সক্রীয় থাকতে চাও বা কারা নিস্ক্রিয়তা অবলম্বন করতে চাও, তা নিয়ে ভাবার অবকাশ আমার নেই। তবে একটা কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ইতিহাস খুলে দেখ, বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে যারা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বেড়িয়েছে, তারা কোন দিনই ইসলামী আন্দোলনের সেবা করতে পারেনি। ইসলামী আন্দোলনে ভীরু কাপুরুষ এবং সুযোগ সন্ধানীদের কোন স্থান নেই।" এসব কথা বলেছেন, তিনি কারা নির্যাতন ভোগ করার সময়; তখন তাঁর বয়স আশি বছর। কুখ্যাত নাসেরের মৃত্যুর পর তিনি সবার পরে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

দায়িত্ব পালনের ডাক

১৯৫৫ সালে স্বৈরাচারী সরকারের অকথ্য নির্যাতনে এবং নির্বিচার মৃত্যুদন্ডের শিকার হয়ে ইসলামী আন্দোলনের হাজার হাজার কর্মী শাহাদাত বরণ করেন। আমি শাহাদাতপ্রাপ্ত ভাইদের মাসুম সন্তান এবং বিধবাদের করুন অবস্থা দেখে দারুনভাবে বিচলীত হয়ে পড়ি। এসব এতীম ও বিধবাদের বুকফাটা কান্না, অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা এবং রিক্ত অসহায় অবস্থা আমাকে গভীরভাবে দুঃখ ভরাক্রান্ত করে তোলে এদের যথার্থ পুনর্বাসন এবং শহীদদের রক্তে ভেজা পথে দ্বিগুন উৎসাহে এগিয়ে চলার জন্যে আমি নতুন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। আমি সরকারের সাথে সরাসরি সংঘাতে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই।

নতুনভাবে কাজে নেমে দেখি সারাদেশে অভাব অনটন এবং ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ অস্থির। কোন রকমে বেঁচে থাকার জন্যে দু'মুঠো অন্ন এবং লজ্জা ঢাকার মতো এক প্রস্থ কাপড়ের অভাবে লাখ লাখ বনি আদম অবৈধ আয়ের পথে হন্যে হয়ে ঘুরছে। ক্ষুধা মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতাকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ছাত্র অসন্তোষ এবং কল-কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ জ্যামিতিকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সুযোগ বুঝে কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র এবং মালিক ও বণিকরা জনসাধারণকে শোষণ করার নিত্য নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছিল।

এদিকে যারা দীর্ঘদিনের কারাবাস থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে আসে, তারা কারাগার থেকেও বেশী ভয়ংকর এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। রোজগারের কোন একটি পথও তাদের জন্যে খোলা ছিল না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাধারণ লোক তাদের অধিকার নিয়ে আওয়াজ তোলার সাহস করছিল না। এই ভয়ে প্রত্যেকেই সন্ত্রস্ত ছিল যে, টু-শব্দ করা মাত্রই সরকার যেকোন বানোয়াট অভিযোগে মৃত্যুর পরওয়ানা জারি করতে বিলম্ব করবে না। বিশেষ করে ইসলাম এবং মুসলমানিত্ব নিয়ে যারাই কথা বলবে তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি ছিল অবধারিত।

এমন ঘন-ঘোর দুর্দিনে আমাদের সব প্রচেষ্টা অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হচ্ছিল। কি যে করবো, তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। সমস্যার যেন এক অশেষ তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মহাসাগরে আমাদের পথরোধ করে প্রবাহিত হচ্ছিল। মুক্তির কোন পথই যখন দেখা যাচ্ছিল না, তখন পথনির্দেশ পাওয়ার আশায় আল-আহজার বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামান্য অধ্যাপক জনাব শেখ মোহাম্মদ আল উদনের স্মরণাপন্ন হই। তাঁর প্রজ্ঞা চিন্তাধারা এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব আগেই আমাকে প্রভাবান্বিত করে। তিনি ইখওয়ান এবং ইমাম বান্নার সাথে আমার সম্পর্কের ব্যাপারে আন্দোলনের প্রতি তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। ইমাম বান্নার শাহাদাতের আগে এবং পরে প্রায় আমি তার সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে মত বিনিময় করি।

আমি অধ্যাপক আল উদনের সামনে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরি। তিনি ধৈর্য্য সহকারে আমার সব কথা শোনেন এবং নীরবে চোখের পানি ফেলতে থাকেন।

আমি তাঁকে বললাম ঃ

"এসব নিরপরাধ শিশু এবং বিধবাদের একমাত্র অপরাধ এই যে তাদের পিতা এবং স্বামীরা আল্লাহ্‌র দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে।"

আমার কথা শুনে তিনি সশব্দে কেঁদে ওঠেন এবং বাকরুদ্ধ স্বরে আমাকে নির্ভীকভাবে ত্রান তৎপরতা শুরু করতে বলেন। তিনি আরো বলেন–

"তুমি কমপক্ষে শহীদ পরিবারগুলোকে আশু সাহায্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা কর। আল্লাহ্‌ তোমাকে সাহস এবং মদদ যোগাবেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত। মনে রেখো বাতিলের ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে ইসলামী আন্দোলনের কাজে অবিচল থাকাই হচ্ছে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় দাবী। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সরকারী নির্যাতনের শিকারে পরিণত ইখওয়ানেরাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথের যথার্থ মুজাহিদ। এরাই মানুষকে সত্যিকারের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির দোরগোড়ার পৌঁছিয়ে দেবে। তাদের সাফল্য অনিবার্য্য।"

এরপর তিনি আমাকে কতিপয় পরামর্শ দেন। সেসব পরামর্শের আলোকে আমি ত্রান অভিযানের রূপরেখা তৈরী করি। আমি সম্পূর্ণ গোপনীয়তার সাথে শহীদ এবং কারারুদ্ধ মুজাহিদদের পরিবারবর্গকে সাহায্য সামগ্রী পাঠাতে শুরু করি। আমাকে এক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন কয়েকজন বিশ্বস্ত এবং দক্ষ কর্মী। তারা পূর্ণ দায়িত্ব ও যোগ্যতার সাথে ত্রাণ সামগ্রী নির্দ্ধারিত স্থানসমূহে পাঠাতে থাকে।

ত্রাণ তৎপরতায় নেমে আসার আগেই অনেক মহিলা এই মহান কাজে আত্মনিয়োগ করেন; অবশ্য সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করে। এসব মহীয়সী মহিলাদের মধ্যে ইমাম হুজায়বীর পত্নি, মহিলা নেত্রী আমাল উসমাবী, অধ্যাপিকা মনিরুদ্দৌলা, মুহতারেমা আমীনা কুতুব এবং হামীদা কুতুব, ফাতহিয়া বকর, আমীনা জওহারী, আলীয়া এবং তাহিয়া জুবায়লীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাজের মাধ্যমে আমাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি নিজে মুহতারেমা খালেদা হুজায়বী এবং আমীনা ও হামীদা কুতুবের সাথে সাক্ষাৎ করে বাস্তব কর্মপন্থা নির্ধারণ করি।

"আল্লাহ্‌র অশেষ শুকর যে, আমরা আমাদের শহীদ ও মুজাহিদ

ভাইদের পরিবারবর্গকে প্রয়োজনীয় সাহায্য যোগাতে সক্ষম হই। ছোট-ছোট মাসুম এতীম এবং অসহায়া বিধবা বোনদের মুখে হাসির রেখা ফোটাতে আমরা রিজিকদাতা রহমানুর রাহীমের দরবারে সিজদাবনত হই।

আবদুল ফাত্তাহ্ ইসমাইলের সাথে হজ্বের পথে

১৯৫৭ সালে এক সকালে সুয়েজ বন্দরে জনাব ফাত্তাহ্‌র সাথে আমার প্রথম দেখা হয়। আমি মহিলা হজ্ব প্রতিনিধিদের সভানেত্রী হিসাবে ওখানে উপস্থিত ছিলাম। আমাদের বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে লোকদের মধ্যে আমার ভাই মোহাম্মদ আল-গাজালীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি কিছুক্ষনের জন্যে কোথাও গেলেন যেন। ফিরে এলেন, সৌম্যকান্তির এক বৃদ্ধ মুরুব্বীকে সাথে নিয়ে। এলেন সরাসরি আমারই কাছে। বৃদ্ধের দৃষ্টি ছিল মাটির দিকে। চোখে মুখে এক অস্বাভাবিক শান্তদীপ্তি তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্বের আভা বিকিরণ করছিল। আমার ভাই তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন−

"ইনি হচ্ছেন ভাই আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইল। যৌবনকালে নবীন ইখওয়ানদের মধ্যে তিনি ইমাম হাসানুল বান্নার অতিপ্রিয় শিষ্য ছিলেন। ইমাম বান্না তাঁকে যেমন অত্যধিক ভালবাসতেন, তেমনি তাঁর উপর অবিচল আস্থাও পোষণ করতে। আপনি একই জাহাজে হজ্বে যাচ্ছেন শুনে তিনি পরিচয়ের জন্যে এক্ষুনি আপনার সাথে দেখা করতে আসেন।" এরপর জনাব ফাত্তাহ্ সালাম জানিয়ে বলেন−

"ইনশাআল্লাহ জাহাজে আপনার সাথে দেখা করব।" আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই এবং তিনি ফিরে যান। কিছুক্ষন পরেই আমাদের জাহাজ জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। দেখতে না দেখতে উপকূল ত্যাগ করে জাহাজ গভীর সমুদ্রে প্রবেশ করে। আমি মহিলা হজ্ব প্রতিনিধি দলের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর কাজে লেগে যাই। মধ্যাহ্ন ভোজের পর আমি আমার নির্দিষ্ট কক্ষে একটু আরাম করব বলে শুতে যাব এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে আমি উঠে দাঁড়াই এবং অতিথিকে ভিতরে আসার অনুমতি দেই। কিন্তু ভিতরে কেউই এলোনা। অবশ্য কড়া নাড়ার শব্দ হলো আরেকবার। ভাবলাম আমার আওয়াজ হয়তো আগমনকারী শুনতে পাননি। তাই অপেক্ষাকৃত উঁচু শব্দে তাকে ভিতরে আসতে বললাম। এবার নীরবে দরজা খুলে প্রবেশ করলেন সুয়েজ বন্দরে আমার ভাইয়ের মাধ্যমে পরিচয়দানকারী সেই শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ।

তিনি স্বভাবসুলভ ভাবে মেঝের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমাকে সালাম জানিয়ে বললেন–

"আল্লাহ্‌র অশেষ শুকরিয়া। শহীদ ইমামের সাথে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আপনি আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন।" আমি সাথে সাথেই প্রশ্ন করলাম–

"সেকথা অপনি কেমন করে জানলেন?" তিনি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন,

"স্বয়ং ইমামই জানিয়েছেন।"

আমি তাঁর উদ্দেশ্য জানতে চাইলে তিনি বলেন–

"আমরা আল্লাহ্‌র ঘরে আল্লাহ্‌রই সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করব। ইমাম হাসানুল বান্না যেসব ব্যাপার নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে চাচ্ছিলেন ওসব নিয়েই আমি কথা বলব।"

তিনি মক্কা শরীফের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন–

"এ প্রসঙ্গে ইনশাআল্লাহ ওখানেই আলাপ হবে।" তাঁর কথাবার্তা বলার ভঙ্গি ছিল খুবই সাদাসিধে এবং পরিচ্ছন্ন। কিন্তু সততা, দায়িত্বশীলতা ও গাম্ভীর্যের প্রচন্ড শক্তি সক্রীয় ছিল তাঁর স্বাভাবিক শব্দ উচ্চারণে। এতে চিন্তাভাবনার কোন অবকাশ ছিল না।

আমি তাঁকে বললাম–

"আল্লাহ্‌ চাহেতো, মক্কা শরীফ অথবা জিদ্দায় মুসলিম মহিলা কেন্দ্রে আমাদের আলোচনা হবে।" তিনি আমার ঠিকানা জানতে চাইলে আমি তাঁকে জিদ্দায় অবস্থানরত আমার দুটি ভাই শেখ উসমাবী এবং মুস্তফা আলামের ঠিকানা দিয়ে বলি–

"এরা মক্কা শরীফ এবং জিদ্দায় আপনাকে আমার বাসভবন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে।" তিনি বললেন, এ দু'জনকে তিনি খুব ভালভাবেই জানেন। এরপর তিনি সালাম জানিয়ে তখনকার মত বিদায় নেন। জিলহজ্ব মাসের এক রাতে নির্ধারিত প্রোগ্রাম মোতাবেক এশার নামাজের পরে, আমি সউদী আরবের প্রধান মুফতি মরহুম ইমাম মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীমের সাথে সাক্ষাৎ করি।

দেশে মেয়েদের শিক্ষাদানের যথোপযুক্ত ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করে আমি বাদশাহ্‌ সউদের কাছে যে মেমোরেন্ডাম পেশ করি, মরহুম প্রধান

মুফ্তির সাথে সে ব্যাপারে আলোচনা করি। মেমোরেন্ডামে দেশের সুবিধের আলোকে নারী শিক্ষার কার্যক্রম অবিলম্বে বাস্তবায়ন করার দাবী জানানো হয়।

এই মেমোরেন্ডাম প্রধান মুফ্তির বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছিল। এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য প্রধান মুফ্তি আমাকে ডেকে পাঠান। আমি এ ব্যাপারে দু'ঘন্টা পর্যন্ত আলোচনা করি। ওখান থেকে ফেরার পথে পবিত্র কা'বা ঘরে তওয়াফের উদ্দেশ্যে আমি হেরেম শরীফের বাবুস্ সালামের পথ ধরি। এমন সময় পেছন থেকে কেউ আমার নাম ধরে ডাকলে ফিরে দেখি জনাব আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইল। আমার তওয়াফের উদ্দেশ্য জানতে পেরে তিনিও আমার সাথে গিয়ে খোদার ঘর তওয়াফ করেন। তওয়াফের সুন্নাত আদায় করে আমরা মুলতাজিমের দিকে মুখ করে বসলাম এবং জনাব আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইল নির্ধারিত সূচী মোতাবেক আলোচনা শুরু করেন।

প্রথমে তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের উপর সরকারের নিষেধাজ্ঞা আরোপ সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চান। আমি তাকে বললাম–

"শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি ভুল সিদ্ধান্ত।"

তিনি বললেন–

"আসলে এ ব্যাপার নিয়েই আমি আপনার সাথে আলোচনার করতে চাই।"

আমি এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে তাঁকে 'ওফদ ভবনে' মিলিত হতে প্রস্তাব করলে তিনি বলেন–

ঃ ওসব জায়গায় নাসেরের গোয়েন্দা বাহিনীর লোক মোতায়েন থাকা অস্বাভাবিক নয়। ফলে তা আলোচনার জন্যে নিরাপদ জায়গা নয়।

এরপর আমরা হেরেম শরীফের নির্মাণ সংক্রান্ত দফতরে জনাব শেখ সালে কাজ্জাজের কক্ষে বৈঠকে মিলিত হতে একমত হই। কিন্তু ওখানে পৌছে তিনি আমাকে চাপা স্বরে বলেন–

ঃ না এখানেও নয়, তার চেয়ে বরং হেরেম শরীফেই গিয়ে আলোচনা করব।

আমরা মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে বৈঠকের জন্যে সময় নির্ধারণ করি। তওয়াফ এবং সুন্নাতে তওয়াফ আদায় করে আমরা মাকামে ইব্রাহীমের পাশে জমজম কূপের উপর নির্মিত ইমারতের পেছনে বসে ইখওয়ানের উপর

সরকারের নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নাকচ করা এবং ইখওয়ানের সংগঠনকে পুনর্গঠিত করে আবার জোর তৎপরতা শুরু করার বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করি। আলোচনায় আমরা এ ব্যাপারে একমত হই যে, হজ্ব থেকে ফিরে গিয়ে আমরা 'মুর্শেদে 'আম' ইমাম হুজায়বীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছে পুণরায় কাজ শুরু করার অনুমতি চাইব। আমরা যখন হজ্বের পর স্বদেশ রওয়ানা হব তখন তিনি বললেন–

ঃ আমাদের আল্লাহ্র কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া জরুরী যে, আমরা ইখওয়ানের পুনর্গঠন পর্যন্ত আল্লাহ্র পথে জিহাদ করব এবং কোন ক্রমেই চুপচাপ বসে থাকব না। আর যারা এই মহৎ কর্মের বিরোধী, তা শক্তি সামর্থের দিক থেকে তারা যেকোন পদ বা ক্ষমতার অধিকারী হোননা কেন, আমরা তাদেরকে বর্জন করব। আমরা উভয়েই, আল্লাহ্র দরবারে ইসলামের কাজে শাহাদাত এবং অবিরাম জিহাদের শপথ করি। এরপর মিশর প্রত্যাবর্তন করি।

কাজের অনুমতি

১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকে ইসলামী মহিলা সংস্থার সদর দফতর এবং আমার বাস ভবনে জনাব আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইলের সাথে আমার বারবার দেখা সাক্ষাৎ হয়। আমরা মুসলমানদের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করি এবং ইসলামের খেদমতে এমন কর্মপন্থা নির্ণয়ের প্রয়াস পাই, যাতে করে জাতি তার আত্মমর্যাদা এবং জীবনাদর্শ সম্পর্কে পুনরায় সচেতন ও সজাগ হতে পারে। আমরা রাসূলে করীমের জীবন চরিত, সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তীকালের মুসলিম মনিষীদের পন্থা অনুকরণে এমন এক কর্মসূচী ও সংবিধান তৈরী করি, যার ভিত্তি হবে কুরআন-সুন্নাহ।

পরিকল্পনা মোতাবেক ইসলামের স্বার্থে কাজ করতে ইচ্ছুক প্রতিটি লোককে আমাদের সাথে দেখা করার জন্যে একত্রিত করা প্রয়োজন। কিন্তু এ সবকিছু ছিল কাজ শুরু করার আগে পন্থা নিরুপনের জন্যে আলাপ আলোচনা এবং পরামর্শ মাত্র। অবশ্য যখন আমরা কাজ শুরু করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন ইখওয়ানের মুরুব্বী ও মুর্শেদ হিসেবে ইমাম হুজায়বীর মতামত নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করি। কারণ, আমাদের আইন সংক্রান্ত পড়াশুনার পর এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইখওয়ানের উপর

নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত ছিল অবৈধ। কেননা, জামাল নাসেরের পক্ষে মুসলমানদের উপর নেতৃত্ব করার কোন বৈধ অধিকার নেই। যেহেতু সে ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম বিরোধী তাই তার আনুগত্য করতে কোন মুসলমানই বাধ্য নয়। এ ছাড়া সে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কুরআন ও সুন্নাহর বিধির পরওয়া করে না।

আমি আমার এবং জনাব আবুদল ফাত্তাহ ইসমাইলের নামে সাংগঠনিক কাজ শুরু করার অনুমতি লাভের জন্যেই ইমাম হুজায়বীর সাথে সাক্ষাৎ করি। একাধিকবার আলোচনায় মিলিত হবার পর তিনি আমাদের পরিকল্পনা ও কর্মপন্থার রূপরেখা বিস্তারিতভাবে যাচাই করেন এবং আমাদেরকে কাজ শুরু করার অনুমতি দেন।

এরপর আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তথ্যানুসন্ধান, প্রাথমিকভাবে সংগঠনের জন্যে লোক যোগাড়, কারা আমাদের সাথে কাজ করতে প্রস্তুত এবং কাদের দিয়ে কোন কোন কাজ করানো যাবে ইত্যাদি বিস্তারিত অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে জনাব আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইল জেলা-শহর ও গ্রাম ভিত্তিক সমগ্র মিশর সফরে বের হন। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সাবেক কর্মীদের এ উদ্দেশ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়, যাতে করে তারাই আন্দোলনের প্রথম কাতার রচনা করতে পারেন।

জনাব আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইল সদ্য কারামুক্ত ইখওয়ান কর্মীদের কর্মোৎসাহ যাচাই করার উদ্দেশ্যে প্রথমে তাদের সাথেই যোগাযোগ করেন। যারা আগে কারাভোগ করে এসেছেন তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা, সাহস এবং মনোবল অটুট রয়েছে কিনা, তিনি তাও সরেজমীনে পরীক্ষা করেন। দীর্ঘ কারাভোগ, অত্যাচার, উৎপীড়ন এসব কর্মীদের ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়নি তো? তারা কি আল্লাহর দীনের পথে সংগ্রাম করতে গিয়ে এখনো আগের মত কর্মচাঞ্চল্য দেখাতে সক্ষম? এখনো কি তারা যেকোন ত্যাগ তিতিক্ষার জন্য প্রস্তুত? বিপদ-মুসিবত হাসিমুখে মোকাবিলা করার মতো মনোবল তাদের অবশিষ্ট আছে তো? এসব প্রশ্নের জবাব হাসিলের জন্যে অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার কর্মীদের অবস্থা ও মতামত জানা আবশ্যক। এরই আলোকে নতুন পদক্ষেপ নেয়া হবে।

জনাব আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইলের পাঠানো প্রতিটি রিপোর্টের পর্যালোচনা করে আমি মুর্শিদে আমের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং সর্বসম্মত বিষয়াদি ও

সমস্যাবলী সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করি। আমি বিভিন্ন অসুবিধে ও সমস্যা সম্পর্কে সংশয় ও শংকা প্রকাশ করলে তিনি বলেন–

"অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চল। পেছনে ফিরে তাকিও না, কে বা কারা কোন পদাধিকারী বা কোন প্রখ্যাত ব্যক্তি কি বলেছে–সেদিকেও ভ্রুক্ষেপ করোনা। মনে রেখো তোমরা সম্পূর্ণ একটি ইমারাত গড়ে তুলতে যাচ্ছ।"

তিনি কোন কোন ব্যাপারে আমাদের সাথে সম্পূর্ণ একমত প্রকাশ করতেন এবং কোন কোন ব্যাপারে নির্দেশ ও পরামর্শ দিতেন। তাঁর অন্যতম একটা পরামর্শ ছিল, আমরা যেন আলাপ-আলোচনায় ইমাম ইবনে হাজম এর আলমুহাল্লা সামনে রাখি।

১৯৪৯ সালে আত্মশুদ্ধিমূলক কর্মসূচী তৈরীর জন্যে আমাদের গবেষণা কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ্ সাক্ষী, আমাদের কর্মসূচীতে মুসলমানদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়া কিছুই ছিল না। আমাদের কর্ম উদ্দেশ্য ছিল আরব হিসেবে তারা যেন ইসলামী সমাজ কায়েমের উদ্দেশ্যে তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ও সক্রীয় হয়।

১৯৫৪ সালে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার কারণে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কর্মতৎপরতা মুলতবী হয়ে গিয়েছিল; এজন্যে আমাদের নতুন তৎপরতা গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

স্বামীর সাথে স্পষ্ট কথাবার্তা

এসব তৎপরতায় অংশ গ্রহণের সাথে সাথে আমি ইসলামী মহিলা সংস্থার কেন্দ্রে নিয়মিত পয়গাম পাঠানো এবং নিজের পারিবারিক দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছিলাম।

ভাই আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইল এবং অন্যান্য কর্মী ভাইয়েরা আমাদের বাসভবনে বারবার যাতায়াত করছিলেন, তা আমার স্বামী মোহাম্মদ সালেহ্ লক্ষ্য করেন। তাই তিনি একদিন প্রশ্ন করেন–

ঃ ইখওয়ানের লোকদের যাতায়াত, আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি এখানে তাদের তৎপরতারই ইঙ্গিত বহন করে। আসলেই কি ব্যাপারটা তাই?

আমি জবাবে বললাম–

ঃ জী হ্যাঁ।

এরপর তিনি এসব তৎপরতার প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে চাইলে আমি বললাম–

ঃ আমরা ইখওয়ানের পুর্নগঠন করতে চাই।

এ সম্পর্কে তিনি আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে আমি আমাদের বৈবাহিক চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম–

প্রিয়তম, স্মরণ করুন তো, বিয়ের সম্মতি প্রদানের আগে আমি আপনাকে কি বলেছিলাম?

তিনি জবাব দিলেন–

"হ্যাঁ, তুমি কিছু শর্ত রেখেছিলে। কিন্তু আজ আমি ভয় পাচ্ছি যে, পাছে জালিম সরকার তোমাকে গ্রেফতার না করে বসে।" –এই বলে তিনি মাথা নীচু করে চুপ রলেন। আমি পূর্ব স্মৃতিচারণ করে বললাম–

"আমার স্পষ্ট মনে পড়ে আমি আপনাকে বলেছিলাম, আমার জীবনের সাথে সম্পৃক্ত এমন অনেক ব্যস্ততা আছে, যা আপনাকে জানানো দরকার। কারণ, আপনি আমার জীবনসঙ্গী হতে যাচ্ছেন। অতএব, আপনি যদি পুংখানুপুংখরূপে জানার চেষ্টা না করেন তাহলে ওসব ব্যস্ততা সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করতে চাই। এছাড়া আমি কয়েকটি শর্তও আপনার কাছ রাখব।

বস্তুত আমি মুসলিম মহিলা সংস্থার সভানেত্রী। কিন্তু অনেকেরই ধারণা, আমি ওফদ পার্টির রাজনৈতিক নীতিমালায় বিশ্বাসী। তা কিন্তু সত্য নয়। আসলে আমি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নীতিতেই আস্থাবান। মুস্তাফা নুহাসের সাথে আমার যোগাযোগ ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব এবং সমচিন্তার কারণেই হয়েছিল। কিন্তু ইমাম হাসানুল বান্নার কাছে আমি আল্লাহর পথে জিহাদ করব বলে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করি। এর অন্যথায় আমি এমন কোন পদক্ষেপের কথা ভাবতেও পারিনে, যা আমাকে খোদার নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। বরং আমি অব্যাহতভাবে এপথেই এগিয়ে চলব। আমি রাতদিন এই স্বপ্নই দেখি এবং এই আশাই পোষণ করি। কোনদিন যদি অনুভব করি যে, আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আমার ইসলামী কাজের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঠেকেছে এবং যদি উপলব্ধি করি যে, আমাদের দাম্পত্য জীবন ইসলামী আন্দোলনের পথে

বাধার সৃষ্টি করছে, তখন আমরা পৃথক হয়ে যাব।" সেদিন আমার কথার জবাব দিতে গিয়ে আপনার চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে পড়েছিল এবং আপনি বলেছিলেন–

"তুমি তোমার বৈষয়িক প্রয়োজন এবং মোহর নির্ধারণ সম্পর্কে কোন দাবী তুলছনা কেন? আর তোমাকে ইসলামের কাজে বাধা না দেয়ার জন্যে তুমি যে শর্ত আরোপ করছ, তা ইমাম হাসানুল বান্নার সাথে তোমার সম্পর্কের ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনে। যতটুকু জানি, তা হচ্ছে, তুমি ইখওয়ানের মহিলা শাখার দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে মতবিরোধ করছ।"

আমি বললাম–

"কিন্তু আল্লাহর শোকর, ইমাম বান্নার শাহাদাতের আগে ১৯৪৮ সালের দুর্যোগ কালে এ ব্যাপারে আমি তাঁর সাথে ঐক্যমতে পৌঁছাই এবং আমি পুরোপুরিভাবে ইসলামী আন্দোলনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেই। তা আমি আপনার কাছে এই দাবী তো করতে পারিনি যে, আপনিও এই জিহাদে আমার সাথে শামিল হোন; তবে আপনার কাছে এই অনুরোধ করার অধিকার আমার আছে যে, আপনি আমাকে আল্লাহর পথের এই জিহাদে শামিল হতে বাধা দেবেন না। আর যখন আমাকে মুজাহিদদের কাতারে যাবার প্রয়োজন দেখা দেবে, তখন আপনি যেন কোথায় কেন যাচ্ছি তা জিজ্ঞেস না করেন।" পুরুষ এ ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাবান থাকা উচিৎ যে, যার সাথে তার বিয়ে হতে যাচ্ছে, সেই মহিলা তার যৌবনের প্রাথমিক পর্যায়েই নিজেকে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে উৎসর্গ করে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও এই বিয়ে যদি ইসলামী আন্দোলনের পথে বাধা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে এবং আমার অস্তিত্ব কেবল ইসলামী আন্দোলনের জন্যেই অবশিষ্ট থেকে যাবে।"

মুহূর্ত কয়েক চুপ থেকে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম–

ঃ বিয়ের পূর্বেকার এসব কথা আপনার মনে পড়ছে কি?

তিনি বললেন– হ্যাঁ.....

তাঁর জবাব শুনে আমি বললাম–

"তাহলে আপনার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আপনি এটা জিজ্ঞেস করবেন না যে, আমি কার সাথে সাক্ষাৎ করছি বা কোথায় যাচ্ছি। ব্যস, শুধু আল্লাহর

দরবারে দোয়া করুন যে, তিনি যেন আমার জিহাদের প্রতিদানকে আমাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধন করে দেন এবং আমার কাজকে কবুল করেন। আমি এটা ভাল করেই জানি যে, আমার উপর আদেশ-নিষেধ আরোপের পূর্ণ অধিকার আপনার রয়েছে এবং স্ত্রী হিসেবে আপনার হুকুম মানতে আমি বাধ্য। কিন্তু বর্তমানের নাজুক পরিস্থিতিতে ইসলামী আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করা আমাদের পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব পালন থেকে অনেক বেশী জরুরী।" আমার কথা শুনে তিনি বললেন–

"প্রিয়তমা! জিজ্ঞসাবাদের জন্যে আমি তোমার কাছে লজ্জিত। দোয়া করি, এই মহত্তর কাজে অবিচল থাকার জন্যে আল্লাহ্ তোমাকে সৎসাহস এবং উৎসাহ দান করুন। আমার জীবদ্দশাতে যদি আমি ইখওয়ানের সাফল্য দেখে যেতে পারি তাহলে কতই না সুখী হব। খোদা যেন তোমাদের প্রচেষ্টায় ইসলামী সরকার কায়েম করেন। হায়, নবীন হয়ে যদি আমিও তোমাদের সাথে কাঁধে কাধ মিলিয়ে কাজ করতে পারতাম।"

এরপর আমাদের কর্মতৎপরতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। দিন রাত কর্মীদের যাতায়াত এবং গতিবিধিতে আমাদের বাড়ী সরগরম হয়ে থাকে। এমনকি মধ্যরাতেও যদি কেউ এসে দরজায় কড়া নাড়ে তো আমার স্বামী উঠে গিয়ে আগমনকারীদের জন্যে দরজা খুলে দেন, তাদেরকে সাক্ষাৎকারের কক্ষে নিয়ে যান, এরপর পারিচালিকাকে জাগিয়ে চা-নাস্তা তৈরীর আদেশ দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে আমাকে জাগিয়ে বলতেন–

"তোমার ছেলেরা এসেছে। তাদের চোখমুখে শ্রান্তির ইঙ্গিত স্পষ্ট।"

আমি উঠে গিয়ে তাদের স্বাগত জানাই এবং আমার স্বামী ঘুমোতে যাওয়ার আগে বলে যান যে, আপনারা যদি ফজরের নামাজ জামায়াতের সাথে পড়েন, তাহলে দয়া করে আমাকেও জাগিয়ে দেবেন; জামায়াতে শামিল হতে পারি যেন।"

তাঁর আগ্রহ মোতাবেক যথা সময়ে তাঁকে জাগিয়ে দেই। নামাজের পর তিনি অতিথিদের সাথে এমন আদর-যত্ন সহকারে কথা বলেন, যেন এরা তাঁর প্রিয়তম সন্তান। এরপর সালাম-দোয়া করে তিনি তাঁর কক্ষে চলে যান।

সাইয়েদ কুতুবের সাথে সাক্ষাৎ

১৯৬২ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সভাপতি অধ্যাপক হাসান হুজায়বীর অনুমতি এবং ভাই আব্দুল ফাত্তাহ্ ইসমাইলের সম্মিতিতে বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও বিপ্লবী নেতা ইমাম সাইয়েদ কুতুবের সাথে কারাগারে দেখা করার উদ্দেশ্যে প্রথমে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের সাথে স্যাক্ষাৎ করি। বিভিন্ন গবেষণামূলক বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁর মতামত গ্রহণ এবং তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ থেকে উপকৃত হওয়াই ছিল কারাগারে গিয়ে তাঁর সাথে দেখার করার মূল উদ্দেশ্য।

আমি প্রথমে বোন হামীদা কুতুবের কাছে নিজের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ভাই সাইয়েদ কুতুবকে আমার সালাম পৌছাতে বলি এবং বিশেষ করে জানাই যে, ইসলামী পাঠ্যসূচী পর্যালোচনাকারী দল তার মতামত নিতে আগ্রহী।

আমি বোন হামীদা কুতুবকে আমাদের পাঠ্যতালিকা পেশ করি। এতে তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইবনে হাজমের'মুহাল্লা, ইমাম শাফেয়ীর কিতাবুল উম্ম, ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের কিতাবুত তাওহীদ এবং সাইয়েদ কুতুবের ফী জিলালিল কুরআন শামিল ছিল। একটু পরে হামীদা ফিরে এসে আমাকে সূরা আনয়ামের দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠের পরামর্শ দেন। এছাড়া একটি পান্ডুলিপি দেখিয়ে বলেন যে, সাইয়েদ কুতুব কারাগারে বসেই এই গ্রন্থ রচনা করেন এবং এর নাম রাখেন মায়ালিমু ফিত্তারীক-মাইল-ষ্টোন-শিগগীরই এটি প্রকাশিত হবে। তুমি এই কয়পাতা পড়ে নিলে আমি তোমাকে অন্যান্য পরিচ্ছদও এনে দেব।

আমাকে জানানো হয় যে, মুর্শিদে 'আম' এই পান্ডুলিপি পূনর্বিবেচনা করে তা অবিলম্বে ছাপানোর নির্দেশ দেন। পরে এ ব্যাপারে আমি মুর্শিদে 'আম' কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন–

"আল্লাহ্র রহমত বৈকি! এই গ্রন্থ পড়ে সাইয়েদ কুতুবের প্রতি আমার বিরাট আশা দানা বেঁধে উঠেছে, আমি দু-দু'বার গ্রন্থটি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি।"

নিঃসন্দেহে বর্তমানে সাইয়েদ কুতুবই আমাদের আশা-আকাংখার মধ্যমণি। মুর্শিদে 'আম' আমাকে পুরো পান্ডুলিপিই পড়তে দেন। আমি পান্ডুলিপি নিয়ে একটি রুদ্ধদার কক্ষে বসে পড়ি। 'মায়ালিমু ফিত্তারিক' এর পান্ডুলিপিটি পূর্ণাঙ্গ পড়েই আমি কক্ষ থেকে বেরুই। এরপর নবীনদের মধ্যে বিতরণের জন্যে ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে এর এক একটি পরিচ্ছেদ পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশের ব্যাপারে শলা-পরামর্শ করি। আমরা এ ব্যাপারে সর্ব

সম্মতিক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ করি। ইমাম সাইয়েদ কুতুব কারাগার থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর উপর বিভিন্ন পুস্তিকা পাঠাতে থাকেন এবং আমরা তার সামষ্টিক পাঠ এবং ব্যাপকভাবে প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করি।

নবীনরা কুরআনের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে একত্রিত হতে শুরু করে এবং তাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কতো যে সুন্দর এবং পবিত্র অনুভূতির উদ্রেক করতো নবীনদের সেসব সামষ্টিক পাঠচক্রের দৃশ্য, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আমাদের সামষ্টিক পাঠের নিয়ম ছিল এরকম যে, প্রথমে কুরআন শরীফের দশটি আয়াত তেলাওয়াত করা হতো, এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বুঝানো হতো, এর উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হতো, এরপর মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনে এ সবের বাস্তবায়ন কিভাবে সম্ভব, তা নিয়ে বাস্তবভিত্তিক আলোচনা করা হতো।

এভাবে সাহাবাদের নীতির অনুসরণে দশ আয়াত পাঠ করে বুঝে নিয়ে পরবর্তী দশ আয়াত তেলাওয়াত ও তা বুঝার দিকে মনোনিবেশ করা হতো। আমরা এভাবে আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে কুরআন পাঠ ও বুঝার জন্যে সমবেত হয়ে নিজেদের ব্যক্তিত্ব গঠনের কাজে তৎপর থাকি এবং অন্যান্যদের কাছে ইসলামী দাওয়াত পৌছিয়ে তাদেরকে আন্দোলনে জন্যে তৈরী করি। নবীনরা যথার্থ ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিল। ভবিষ্যৎ বংশধররা যাতে করে অকৃত্রিম আন্তরিকতার সাথে ইসলামী আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে, তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যে নবীনরা ইসলামী আন্দোলনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উপর বিশেষ জোর দেয়।

আমরা ইমাম হুজায়বীর অনুমতি এবং ইমাম সাইয়েদ কুতুবের পরামর্শের আলোকে মুসলমানদের তাওহীদী আকীদায় যুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রশিক্ষণ এবং সংগঠিত করার কাজ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেই। আমরা এটা স্পষ্ট করে দেই যে, যতক্ষণ না ইসলামী আইন অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহর আলোকে ফায়সালার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ততক্ষণ কোন ইসলামী সরকার আছে বা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে হবে না। সুন্নাহর আইনকে মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সুতরাং, মক্কায় রাসূলে খোদার তেরো বছরের প্রাথমিক প্রচার কার্যের অনুসরণে আমরাও তেরো বছর মেয়াদী বিশেষ কর্মসূচী হাতে নেই। এ উদ্দেশ্যে প্রথমে ইখওয়ান কর্মীদেরকেই তাদের জীবনে ইসলামের আদর্শকে পুরোপুরি কায়েম করা এবং ইমামের আনুগত্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু ইসলামী

বিধান মোতাবেক হুদুদ বা দন্ডবিধি জারী করা ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত মুলতবী থাকবে। (অবশ্য সম্ভাব্য উপায়ে এর প্রয়োগ এবং প্রতিরক্ষার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।)

আমরা এটাও জানতাম যে, নবী এবং তাঁর সাহাবাদের যুগের মত গুণাবলী সম্পন্ন মুসলমান চরিত্র আজকের পৃথিবীতে বিরল। এ জন্যে যে কোন ইসলামী সংস্থার উপর অবিরাম জিহাদ চালিয়ে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য এবং গোটা মুসলিম মিল্লাত ইসলামী আদর্শের আওতায় না আসা পর্যন্ত এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কেবল শ্লোগানের মাধ্যমেই নয় বরং কার্যকরী ভাবেই এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

অবস্থার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করার পর এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বর্তমান সরকার সম্পূর্ণরূপে অনৈসলামী, যদিও সরকার বেশ কয়েকবার ঘোষণা করেছে যে, তারা আল্লাহর আইন প্রবর্তন করছেন। এই পর্যালোচনার পর যুবক-যুবতী, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের প্রশিক্ষণের ১৩ বছরের নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হবার পর দেশব্যাপী সমীক্ষা চালানো হবে। এরপর যদি শতকরা ৭৫ ভাগ লোককে (যারা এ ব্যাপারে আমাদের সাথে একমত হবে যে, ইসলাম এবং রাজনীতি আলাদা আলাদা বিষয় নয় এবং ইসলামকে বাস্তবায়নের জন্যে রাজনীতি অপরিহার্য) আমাদের সহগামী হিসেবে পাই তাহলে আমরা দেশে সত্যিকারের ইসলামী শাসন কায়েমের দাবী তুলব। কিন্তু প্রথম তেরো বছরেও যদি অধিকাংশ জনসাধারণ ইসলামের আওতা থেকে দূরে সরে থাকে তাহলে পরবর্তী দশকে আমরা জনগণকে ইসলামী শিক্ষার আলোকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যাপারে পুণরায় মনোনিবেশ করব। আমাদের এই কাজ ইসলাম বিরোধীদের সমূলে উৎখাত, ইসলামী আদর্শকে পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করা পর্যন্ত চলতে থাকবে। আমরা ইসলামী আন্দোলনের এই মিশনে আজীবন তৎপর থাকার শপথ নেই। এভাবে যদি আমাদের মৃত্যুর মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে তাহলে আমরা পরবর্তী বংশধরদের হাতে ইসলামের ঝান্ডা তুলে দেব। মুর্শিদে 'আম' ইমাম হুজায়বীর ইচ্ছা মোতাবেক ইমাম সাইয়েদ কুতুবের সাথে আমার যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। তিনিও নয়া মিশরে অবস্থিত আমার বাসভবনে নবীনদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার জবাব ও পরামর্শ দানের জন্যে আসতেন। যুবকরা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেত এবং তিনি ধৈর্য সহকারে এক একটি প্রশ্নের বিস্তারিত এবং সন্তোষজনক জবাব পেশ করতে থাকেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ষড়যন্ত্র

প্রথমেই উল্লেখ করেছি, ইমাম সাইয়েদ কুতুবের কারাগার থেকে মুক্তির কয়েক মাস আগে আমাকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। আমরা বিশ্বস্ত সুত্রে খবর পাই যে, ইমাম সাইয়েদ কুতুবকে সহজতর উপায়ে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই এবার মুক্তি দেয়া হচ্ছে। এই হত্যাকান্ড কার্যকরী করার জন্যে গোয়েন্দা বাহিনী ইতিমধ্যেই তার ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরী করে নিয়েছিল। গোয়েন্দা বাহিনীর হত্যা অভিযান তালিকায় ভাই আব্দুল ফাত্তাহ্ ইসমাইলের নামও অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু এসব খবর শুনেও আমরা একান্ত নির্লিপ্তভাবে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে কাজ করে যাই। আন্দোলনের কাজে এতটুকু শিথিলতাও আসুক, তা আমরা কেউ কামনা করতে পারিনি। অবশ্য জুলুমশাহীর ভেল্কি-ধমকী এবং তাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে আলোচনা পর্যালোচনা অবশ্যই করি। বস্তুতঃ ওরা মনে করেছিল, আমাদের এটা ভাববাদী আন্দোলন। এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন কারারুদ্ধ নেতা জনাব সাইয়েদ কুতুব। আর বাইরে এর বাস্তব অনুশীলন করছেন আব্দুল ফাত্তাহ্ ইসমাইল এবং জয়নব আল গাজালী।

এমন সময় আমরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত সুত্রে এই তথ্য পাই যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুন এবং তার সব তৎপরতাকে অবিলম্বে খতম করার জন্যে মার্কিন ও সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা প্রেসিডেন্ট নাসেরকে একটি রিপোর্ট হস্তান্তর করে। রিপোর্টে তারা শংকা প্রকাশ করে বলে যে, অবিলম্বে যদি ইখওয়ানকে স্তব্ধ করে না দেয়া হয়, তাহলে সামরিক সরকার জনগণকে ইসলামী ধ্যান-ধারণা থেকে দূরে সারিয়ে আনার জন্যে এবং ইসলামের মাধ্যমে সংশোধন ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে জনসাধারনকে নৈরাশ্যজনক অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করেছে– তার সব কিছুই ধুলিস্মাৎ হয়ে যাবে। সুতরাং ইখওয়ান তার চিন্তাধারা এবং আন্দোলনকে সমূলে উৎখাত করার জন্যে সরকারের উচিৎ সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মার্কিন এবং সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে পাওয়া রিপোর্টের আলোকে প্রেসিডেন্ট নাসের

এটা অনুভব করেন যে, ইসলামী আন্দোলনের অস্তিত্ব তার স্বৈরাচারী শাসনের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা।

১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসের গোড়ার দিকে আমি খবর পাই যে, অবিলম্বে যাদের গ্রেফতার করা হবে, তাদের তালিকার চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়ে গেছে। এই তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়টি নাম হচ্ছে– ইমাম সাইয়েদ কুতুব, জয়নব আল গাজালী, আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইল এবং মোহম্মদ ইউসুফ হাওয়াস।

১৫ই আগষ্ট মাসের গোড়ার দিকে আমি খবর পাই। আমি সে সময় কয়েকজন বোনের সাথে আলাপ করছিলাম, এমন সময় টেলিফোন আসে। টেলিফোনে আমাকে জানানো হয় যে, সাইয়েদ কুতুবের খানাতল্লাসী করা হয় এবং তাঁর দেহ তল্লাসীও বাদ পড়েনি। এর কয়েকদিন আগেই তাঁর ভাই মোহাম্মদ কুতুবকেও আটক করা হয়। আমার স্বামী সে সময় রাস আলবীরে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁকে টেলিফোন করে সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে সন্তোষজনক তথ্য পাঠাতে বলি। ঘন্টা খানেক পরে টেলিফোনের মাধ্যমে আগে পাওয়া খবর সত্য বলে জানান। আমি তৎক্ষনাৎ বোনদের বৈঠক স্থগিত করে পরবর্তী পরিস্থিতির দিকে মনোনিবেশ করি। সাইয়েদ কুতুবের গ্রেফতারীর খবর তরুণদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করে। আমাদের কথাতো বলাই বাহুল্য।

ইমাম হুজায়বীতো আন্দোলনের সব দায়িত্ব সাইয়েদ কুতুবের উপরই ন্যাস্ত করে রেখেছিলেন। আমরা জনাব হুজায়বীর নির্দেশ মোতাবেক তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখি। সাইয়েদ কুতুবের গ্রেফতারীর পর পরবর্তী দায়িত্বশীল কে হচ্ছেন, তা জানার জন্যে আমরা মুর্শিদে 'আম' ইমাম হুজায়বীর সাথে সাক্ষাৎ করি।

আমি এবং আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইল গ্রেফতারীর পাঁচদিন আগেই এই দূর্ঘটনা হবে আশংকা করছিলাম। যাই হোক, এই দুর্ঘটনার পর আব্দুল ফাত্তাহ আমার সাথে সাক্ষাৎ করে আমাকে আলেকজান্দ্রিয়া গিয়ে মুর্শিদে 'আমের' সাথে দেখা করার জন্যে সফরে রওয়ানা হবার নির্দেশ দেন। তিনি একজন যুবকের সাথেও পরিচয় করিয়ে দেন এবং বলেন–

"আমি যদি গ্রেফতার হয়ে যাই তাহলে এ যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করবে।"

এর কয়েক ঘন্টা পরে তিনি টেলিফোন করে আমাকে নিজ বাসভবনে থাকার আদেশ দেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া সফর মুলতবী করতে বলেন। কিন্তু

আমি ইতিমধ্যেই মুর্শিদে 'আমের' সাথে যোগাযোগ কায়েম করে নিয়েছিলাম। মুর্শিদে 'আমের' স্ত্রীও আলেকজান্দ্রিয়া থেকে এসে গিয়েছিলেন। আমরা নিয়মিতভাবে জনাব হুজায়বীর সাথে যোগাযোগ রাখার সিদ্ধান্ত নেই। এবার আমাদের মধ্যেকার যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব দেয়া হয় ভাই মোস্তফা মুরসীকে।

এরপর আমি মুর্শিদে 'আমের' সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সব ব্যাপারে অবহিত করি এবং আমাদের কর্মসূচী ব্যাখ্যা করি। তিনি এতে সম্মতি দান করেন। তিনি গ্রেফতারীর ঘটনাবলী, বিশেষ করে সাইয়েদ কুতুবের গ্রেফতারীতে গভীর দুঃখ ও দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করেন।

এরপর গ্রেফতারী অভিযান চলতেই থাকে। দেখতে না দেখতে বেশ কয়েক হাজার ইখওয়ানকে কারারুদ্ধ করে নেয়া হয়। আমাকে গ্রেফতার করার পর শাম্স বদরান প্রেসিডেন্ট নাসেরের কাছে শপথ করে বলে যে গত কুড়ি দিনে ইখওয়ানের এক লাখ লোককে গ্রেফতার করে সামরিক কারাগার, দূর্গের জেলখানা, আবুজাওয়াল জেল, আলেকজান্দ্রিয়া এবং তান্তাহ্সহ আরো অনেক কারাগার ভরে দেয়া হয়েছে।

উনিশে আগষ্ট খবর পাই যে, ৮৫ বছর বয়স্কা ফাজেলা ওরফে উম্মে আহমদকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি ইসলামী আন্দোলনে প্রথম থেকেই আমাদের সহগামীনি ছিলেন। তিনি ইমাম হাসানুল বান্নার যথার্থ অনুসারী ছিলেন এবং কারারুদ্ধ ইখওয়ানদের পরিবার বর্গের দেখাশুনা এবং সাহায্য সহাযোগিতা দানে তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিল। এহেন মহিয়সী অশীতিপর বৃদ্ধার গ্রেফতারের দুঃসংবাদ আমাকে মর্মাহত করে। কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে আমি বার্তাবাহক তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্বোধন করে বলি–

"আমাদের সৌভাগ্য যে, পঁচাশী বছরের বৃদ্ধাও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করতে গিয়ে কারাগারের দুঃসহ নির্যাতনকে হাসিমুখে বরণ করে নিচ্ছেন, কিন্তু খোদাদ্রোহী বাতিল শাসনের সামনে মাথা নত করেননি। তাঁর উপর আল্লাহ্র রহমত নাজিল হোক এবং আল্লাহ্ তার কাজে সন্তুষ্ট হোন।"

আমি আমার ধর্ম মেয়ে গাদা আম্মারকে ডেকে বলি–

"শিবলার প্রখ্যাত মুজাহেদা ফাজেলা ওরফে উম্মে আহমদকেও গ্রেফতার করা হয়েছে....আমি ইসলামী আন্দোলন এর প্রচার কার্য পরিচালনা এবং গ্রেফতারকৃত লোকদের পরিবারবর্গের খরচ পত্রের জন্যে যে তহবিল তোমার কাছে রাখছি, আমি যদি গ্রেফতার হই তাহলে সব টাকা তুমি মুর্শিদে 'আম' অথবা কুতুব পরিবারের কারো কাছে হস্তান্তর করে দেবে। এই বলে আমি

গাদার কাছে টাকার থলে সোপর্দ করি। এসব টাকা কর্মীদের চাঁদা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। পরে কারাগারে গিয়ে খবর পাই যে, গাদা এসব টাকা আমার আরেক ধর্ম মেয়ে ফাতেমা ইসার কাছে হস্তান্তর করে। কিন্তু সেও যখন গ্রেফতার হয়ে যায়, তখন জালিম শাহীর এজেন্টরা সেসব টাকাও ছিনিয়ে নেয়। অথচ এসব টাকা ছিল সেসব নিরপরাধ লোকদের জন্যে খাদ্য, বাসস্থানের ভাড়া, ঔষধপত্র কেনা এবং লেখাপড়ার খরচের জন্যে নির্দিষ্ট, যাদের পিতাদেরকে শুধু এই জন্যেই গ্রেফতার করা হয় যে, তারা ইসলামী পুনর্জাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নয়া ইতিহাস রচনা করছিল।

গাদা আম্মার এবং আলীয়া হুজায়বী কারাগারে আমার সাথে দেখা করতে এসে সবকিছু বিস্তারিতভাবে জানান। আমি তাদের বললাম–

"দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই; আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনিই উত্তম ব্যবস্থাপক। আমাদের প্রকৃত ঠিকানা তো আখেরাতে..... । আর এই পৃথিবীতো ক্ষনস্থায়ী..... ।"

আমার গ্রেফতারীর আগে পর্যন্ত ইখওয়ানদের পাইকারী হারে গ্রেফতারের খবর প্রতিনিয়ত আমার বুকে তীরের মত এসে বিঁধছিল। এর মধ্যে বার্তাবাহক এসে আমাকে মুর্শিদে আমের সাথে আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে সাক্ষাৎ করার পয়গাম দিয়ে যায়। ১৯-শে আগষ্টেই আমি যখন রওয়ানার প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন দ্বিতীয় বার্তাবাহক এসে রওয়ানা আপাততঃ মুলতবী করতে বলে যায়।

এবার আমার পালা

২০-শে আগষ্ট শুক্রবার ভোরে ফজরের নামাজের সময় হঠাৎ জালিম-শাহীর সৈন্যরা আমার বাসভবনে চড়াও করে। আমি তাদেরকে খানাতল্লাসীর অনুমতিপত্র দেখাতে বললে তারা বলে–অনুমতিপত্র? কিসের অনুমতিপত্র? কার অনুমতিপত্র? আরে পাগল নাকি! তুমি জাননা যে এটা নাসেরের আমল! জানো আমাদের যা মর্জি তাই করব। তারা হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত রোগীর মত বিকট হাসির সাথে আবার বলে–

ইখওয়ানরা সত্যিই পাগল। জামাল নাসেরের যুগে তারা আমাদের কাছে ঘরে ঢোকার অনুমতিপত্র চাচ্ছে। এরপর তারা যা সামনে পাচ্ছিল, সব আসবাবপত্র এলোপাথাড়ি ভেঙ্গেচুড়ে দুমড়িয়ে যেতে থাকল, একটি জিনিষও তাদের অভিশপ্ত থাবা থেকে রেহাই পেলনা। তাদের এই জঘণ্য কর্মকান্ড দেখেও আমি একান্ত অসহায় দৃষ্টিতে নীরবে অবলোকন করতে থাকলাম।

ঘরের সব কিছু তছনছ করে পরে তারা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে গ্রেফতার করে নেয়। সে ছিল টিচার্স কলেজের ছাত্র এবং আমাদের বাড়িতে থেকেই লেখাপড়া করত। এরপর তারা বলল– তুমি বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবেনা। আমি প্রশ্ন করলাম–

ঃ এর মানে কি এটাই বুঝব যে আমি নজরবন্দী? তারা জবাব দিল দ্বিতীয় আদেশ না আসা পর্যন্ত তোমার তদারক আমাদের হাতে থাকবে। যদি তুমি বাড়ীর বাইরে যাবার চেষ্টা কর তাহলে তোমাকে গ্রেফতার করা হবে। আমি ভাবছিলাম, সম্ভবতঃ নজরবন্দী পর্যন্তই আমার ব্যাপার সীমিত থাকবে। তবুও আমি গ্রেফতারের আংশকায় প্রয়োজনীয় জরুরী প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় আমার প্রতিবেশিনীর স্বামী এবং ছেলেমেয়েরা আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য চলে আসেন। পাছে ভদ্রলোককেও গ্রেফতার করে নেয় এই ভয়ে আমি তাকে তক্ষুণি আমার বাড়ী ত্যাগ করতে অনুরোধ করি। কারণ ওরা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকেও গ্রেফতার করে নিয়েছিল। কিন্তু আমার শত অনুরোধ সত্ত্বে তাঁরা আমাকে ছেড়ে যেতে রাজী হলেন না।

ঠিক মধ্যাহ্ন ভোজের সময় নাসেরের জালিম সৈন্যরা আবার ঘরে ঢুকে অবশিষ্ট সব সাজ-সরঞ্জাম নষ্ট করতে শুরু করে। তারা আমার অফিস কক্ষের অর্ধেক জিনিষপত্র ধ্বংস করে দেয়। সিন্ধুক দখল করে নেয়। এত শিগগীর আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর অতি গুরুত্বপূর্ণ বই-পুস্তক-বিশেষ করে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ্‌ এবং ইতিহাস ইত্যাদি সরিয়ে নিতে ব্যর্থ হই। এছাড়া ১৯৫৮ সালে বেআইনী ঘোষিত পত্রিকার ৩টি বিশেষ সংখ্যার খসড়া পান্ডুলিপিও সরিয়ে নিতে পারিনি। পাষন্ডরা যাচ্ছেতাই নষ্ট করছিল এবং যা ইচ্ছে বাজেয়াপ্ত বা তসনস করছিল। সিন্ধুকের চাবি নিয়ে তাদের সাথে আমার বচসা হয়। আসলে সিন্ধুকটি আমার স্বামীর তত্ত্বাবধানেই ছিল। ওতে আমারও কিছু জিনিসপত্র সংরক্ষিত ছিল। সিপাহীরা যখন আমার কাছে সিন্ধুকের চাবি তলব করে তখন আমি তাদেরকে জানাই যে, চাবি আমার স্বামীর কাছে রয়েছে। তিনি গ্রীষ্মের ছুটিতে সফরে বেরিয়েছেন। এ কথা শুনে তারা হৈ-হল্লা শুরু করে দেয়। তারা তাদের একজনকে তালা খুলতে বলে। সে ব্যক্তি চাবির গোছা নিয়ে একে একে সব চাবি প্রয়োগ করেও তালা খুলতে ব্যর্থ হয়।

আমি এবার তাদের কাছে বাজেয়াপ্তকৃত জিনিসপত্র ও সাজ-সরঞ্জামের রসিদ তলব করি। আমার কথা শুনে তারা হাসিতে ফেটে পড়ে বলে–

"রশিদ, ওসবের রসিদ চাও তুমি? এস তোমাকে রসিদ দিচ্ছি–" বলে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে এনে তাদের গাড়ীতে তুলে নেয়। গাড়ীতে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সেই সকাল থেকেই আটক হয়ে বসেছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম– কেমন আছ মুহাম্মদ? কিন্তু সে কোন জবাব দিলনা। বুঝলাম তাকে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে। একটু আগে তাকে ধরে নেয়া হয়েছিল শুধু তাদের সুবিধার্থেই। বলাবাহুল্য, এবার যেসব সিপাহী এসেছিল, তারা ভোরবেলার সিপাহীদের দল থেকে আলাদা।

গাড়ী আমাদের নিয়ে চলতে শুরু করে। কারাগারের প্রধান গেটে নামফলক পড়েই আমি জানতে পারি যে, এই হচ্ছে কুখ্যাত জঘন্য সামরিক কারাগার। জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আমাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দেয়া হয়। এরপর এক ভয়ংকর আকৃতির লোক আমাকে একটি কক্ষে নিয়ে যায়। এখানে অপেক্ষমান এক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন শুরু করে। এরপর আমাকে অন্য একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে অন্য একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি আমার নাম জানতে চাইলে আমার সাথে আসা সেই ভয়ংকর লোকটি কুৎসিৎ গালি দিয়ে ওকে আমার নাম জানায়।

এরপর সেই কৃষ্ণকায় ব্যক্তি তীব্র রক্তচক্ষু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে প্রশ্ন করে-

তুই কে? আমি ধীর শান্তভাবে জবাব দিলাম–

ঃ জয়নব আল-গাজালী আল জুবায়লি……। আমার এতটুকু কথা! শুনতে না শুনতেই সে তার বিভৎস বিকৃত মুখে এমন সব অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করে দিল যে, জীবনে অমন কদর্য্য ভাষা আমি কোনদিন শুনিনি। আমার সাথে আসা ভয়ংকর লোকটি অগ্নিশর্মা হয়ে গালি দিতে দিতে বলল–

ঃ হতভাগী, যার সামনে দাড়িয়ে আছিস, তাঁর সাথে ভদ্রতার সাথে জবাব দিস। আমি এবার বললাম–

ঃ তোমরা আমাকে গ্রেফতার করেছ; আমার জিনিসপত্র সাজ-সরঞ্জাম টাকাকড়ি এবং বইপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে– ওসব কিছুর তালিকা এবং রসিদ আমাকে দেয়া উচিৎ যাতে মুক্তির পর আমি আমার সব জিনিস ফেরত পেতে পারি।

আমার একথা শুনে সরকারের তথাকথিত এটর্নি শাম্‌স বদরান অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সাথে বলল–

ঃ আমরা তোকে এক ঘন্টা পরেই হত্যা করব; আর তুই কিনা বইপত্র, টাকা-পয়সা, জিনিসপত্র এবং সাজ-সরঞ্জামের রসিদ চাচ্ছিস! বাহ্‌রে আমার কর্ত্রী! সাথে সাথে আরো অশ্রাব্য গালি দিয়ে বলল–

ঃ তোর আগে তোর অসংখ্য সাথীকে যেমনি এখানে দাফন করে দিয়েছি, তেমনি তোকেও এখানেই দাফন করা হবে।

এই বলে সে উচ্চস্বরে হোঃ হোঃ করে হেসে যা মুখে আসছিল, বকে যাচ্ছিল। এমন নোংরা অসভ্য, অভদ্র পরিবেশের কথা কোন সভ্য মানুষ কল্পনাই করতে পারে না। সুতরাং কোন কথা বলার পরিবর্তে আমি নীরবতা অবলম্বনকেই শ্রেয় মনে করি। এ অবস্থায় এটর্নি শাম্‌স বদরান সেই ভয়ংকর সিপাহীকে আদেশ দিল–

ঃ একে এখান থেকে নিয়ে যাও।

সে জিজ্ঞেস করল–

ঃ কোথায়?

এটার্নি সংকেতে বলল–

ঃ ওরা জানে।

এরপর ভয়ংকর লোকটি আমাকে গালি দিতে দিতে টেনে হেঁচড়ে নির্দয়ভাবে অন্য এক কক্ষে নিয়ে যায়। দেখি, দৈত্যের মত বিরাটকায় এক লোক ধোঁয়ার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মুখ খিস্তি করে আমার নাম ডাকছে। আমি তার নিষ্ঠুর চেহারা দেখে তার শয়তানী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করে বলি–

ঃ হে পাক পরওয়ারদেগার! আমাকে স্বস্তি দান কর এবং চরম পরীক্ষার মুহূর্তেও ধৈর্যের শক্তি দাও। আমাকে তোমার পাক নাম উচ্চারণে ব্যস্ত রেখ এবং তোমারই সন্তুষ্টির পথে অবিচল রেখ।

আমার সাথে আসা ভয়ংকর লোকটি দরজায় দাঁড়িয়ে নতুন শয়তানকে বলল–

ঃ নিন জনাব.....।

দৈত্যাকারের শয়তান বলল–

"তাকে ২৪ নাম্বার কক্ষে নিয়ে যাও।" এরপর আমাকে নিয়ে একটি কক্ষে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। এটি দেখতে একটি অফিসের মত মনে হলো। সেখানে দু'জন লোক বসেছিল। তাদের একজনের হাতে ছিল একটি ডাইরী। ডাইরী

দেখেই আমি চিনতে পারি যে, এটা জনাব আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইলের সেই বিশেষ ডাইরী, যা তিনি দারসে কুরআন দেওয়ার সময় বের করে প্রয়োজনীয় নোট লিখতেন। এতে করে আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি এবং তাঁর সাথীরাও গ্রেফতার হয়েছেন। কারণ তখন তার ওখানে বৈঠক হবার কথা ছিল। শয়তানরা তাদেরকে বৈঠকেই গ্রেফতার করেছে– এ কথা চিন্তা করে কেঁপে উঠি আমি।

এর মধ্যে আসরের আযান শোনা গেল। আমি নামাজের জন্যে প্রস্তুত হলাম। নামাজ শেষ করা মাত্রই সেই ভয়ংকর শয়তান হিংস্র জানোয়ারের মত আমার দিকে এগিয়ে এল।

চব্বিশ নম্বর কক্ষের পথ

এবারে আমার দু'হাত পিছমোড়া বেঁধে আরো দু'জন কৃষ্ণকায় সহ সামরিক কারাগারের বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সামনে নিয়ে চললো। ওদের হাতে ছিল লিকলিকে কালো চাবুক। কারাগারের বিভিন্ন অংশে আমি ইখওয়ানদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের বিভৎস চিত্র দেখে আঁতকে উঠি। তাদেরকে বিবস্ত্র করে থামের সাথে কষে বেঁধে বেপরোয়া চাবুক মারা হচ্ছিল। চাবুকের ঘায়ে তাদের চামড়া চৌচির হয়ে শত ধারায় রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। আবার কোন কোন ইখওয়ানকে হান্টার মেরে তাদের উপর ক্ষুধার্ত শিকারী কুকুর ছেড়ে দেয়া হচ্ছিল। কুকুরের বিষাক্ত দংশনে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছিল তাদের দেহ। অনেক ইখওয়ানকে দৈহিক নির্যাতনের আগে দেয়ালের দিকে মুখ করে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে অনেক যুবক কর্মীকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানতাম। তারা নিজ সন্তানের মত প্রিয় ছিল, আমার কাছে। এসব মানবহিতৈষী খোদাভীরু শিক্ষিত নবীনরা ছিল আল্লাহ্‌র পথে নিবেদিত প্রাণ-মুজাহিদ। দিন কেটে যেত তাদের ইসলামী আন্দোলনের কাজে আর রাতের অন্ধকারে তারা মশগুল থাকতো আল্লাহ্‌র জিকিরে। জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার এবং জনগণের নয়নের মণি এসব যুবকদের প্রতি এই নির্মম নির্যাতন, এই নিষ্ঠুর বর্বরতা প্রদর্শন কেবল ইসলামের জঘন্যতম শত্রুরাই করতে পারে! কিন্তু এই অকথ্য জুলুম-নিপীড়নের পরেও তাদের চেহারায় স্বাভাবিক দীপ্তি, ধৈর্য ও স্থিরতা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি আমি! তাদের ত্যাগ তিতিক্ষা এবং অত্যাচারের সামনে আতঙ্কিত না হবার বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখে তাদের প্রতি দস্তুর মত ঈর্ষা জাগে আমার। ধৈর্যের প্রতীক অসম সাহসী এসব যুবকের জন্যে গর্ববোধ করি আমি। আমি দেখেছি এসব নির্যাতিত-

উৎপীড়িতদের মধ্যে একদিকে যেমন যুব, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধরা রয়েছেন। তেমনি রয়েছেন অল্পবয়স্ক কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে আশি-নব্বই বছরের বৃদ্ধরা পর্যন্ত। প্রত্যেকের একই হাল, একই অবস্থা।

তাদের সারা শরীর রক্তাক্ত, হান্টারের ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত পিঠ, চেহারায় আঁচড়ের রক্তাক্ত চিহ্ন, আর শতচ্ছিন্ন পরনের একপ্রস্থ কাপড়। যে কপাল খোদার দরকার ছাড়া কোনদিন কারো সামনে নত হয়নি, সেই কপাল বেয়ে দরদর করে পড়ছে উষ্ণ রক্তধারা। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অদ্ভুত এক রশ্মিতে ভাস্বর তাদের চোখ-মুখ। শুলিতে চড়েও তারা প্রশান্ত মুখে আল্লাহ্‌র জয়গান গাইছে। তাদেরকে ছাদ থেকে উল্টো লটকিয়ে রাখা হয়েছে, তাতেও তাদের ধৈর্য ও সত্যবাদিতায় এতটুকু ব্যত্যয় ঘটেনি। কিন্তু এই মর্মান্তিক দৃশ্য আর দেখার শক্তি ছিল না আমার। অসহ্য....অসহ্য....অসহ্য!

হঠাৎ শুলিতে লটকানো এক যুবক আমাকে দেখে ফেলে। সে শুলি কাঠের উপর থেকেই জোরে চেঁচিয়ে আমাকে বলল–

ঃ ও আম্মা! আমাদের আম্মা! আল্লাহ্ যেন আপনাকে সত্যের পথে অবিচল রাখেন।

ঃ আল্লাহ্ তোমাকেও অবিচল রাখুন; আল্লাহ্ তোমাকে ধৈর্য ও সাহস দান করুন.... আমি বললাম।

আমি দেখেছে, তার ক্ষতবিক্ষত দেহের রক্ত এসে এক জায়গায় জমা হচ্ছে। সেই জমাট রক্ত থেকে কেমন যেন এক উজ্জল আলোর আভা ফুটে উঠেছিল। আমি দোয়া করলাম–

"হে রাব্বুল আলামীন, তোমার দ্বীনের মুজাহিদদের ধৈর্য, শক্তি, সাহস এবং প্রশান্তি দাও! তুমি রহমত বর্ষণ কর খোদা.....!"

অত্যাচারিত বীর মুজাহিদদের দিকে চেয়ে বললাম–

"আমার প্রিয় সন্তানরা, রাসূলের উত্তরসূরীরা! ধৈর্য ও সাহস হারিও না। আল্লাহ্ তোমাদের সহায় আছেন। –তোমাদের মঞ্জিল বেহেশত।" যে জল্লাদ আমাকে নিয়ে ঘুরে ফিরছিল, সে আমাকে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়াবাক্য উচ্চারণ করতে শুনে তার প্রকাণ্ড ভারী দু'হাত উপরে তুলে প্রচন্ড জোরে আমার কানপট্টির উপর মুষ্ঠাঘাত হানে। আঘাতের তীব্রতায় আমি বধির হয়ে পড়ি এবং কিছুক্ষনের জন্যে দৃষ্টিশক্তিও লোপ পেয়ে যায়। মনে হচ্ছিল, যেন আকস্মিক বজ্রপাতে হতভম্ব হয়ে পড়েছি। আরো মনে হচ্ছিল আমার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছে এবং সারা দেহ

থেকে এক অস্বাভাবিক আলোর ছটা ফুটে উঠেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় ছপফট করা সত্ত্বেও আমি বললাম–

"হে খোদা, তোমার সন্তুষ্টির পথে সব সহ্য করবো।" তখন আমার মনে হচ্ছিল, –যেন জান্নাত থেকেই শব্দ কয়টি ভেসে আসছিল– "হে প্রভু! আত্মপ্রত্যয় দান কর; হে খোদা, তুমি ঈমানদারদের জালিমের জুলুম থেকে নিরাপদ রাখ।"

"তুমি যদি আমাদের প্রভু না হতে তাহলে আমরা হেদায়াত পেতাম না, আমরা সাদকা এবং নামাজ আদায় করতাম না; বিপদ মুসীবতে তুমি আমাদের আত্মপ্রত্যয় দান কর।" –হাদীস

চাবুক এবং হান্টারের শপাং শপাং শব্দ বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল, কিন্তু ঈমানের আওয়াজ ছিল আরো সুস্পষ্ট শক্তিশালী। হঠাৎ আরেক আওয়াজ শুনতে পেলাম যেন জান্নাত থেকে ভেসে আসছে সেই আওয়াজ।

"আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন প্রভূ নেই, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়।" আমি পুনরায় বললাম–

"ধৈর্য ধারণ কর আমার সন্তানরা, ধৈর্য ধারণ কর। জান্নাত তোমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে।"

জালিম জেলারদের কঠিন মুষ্ঠাঘাত আমার পিঠের উপর মুষলধারে বৃষ্টির মত বর্ষিত হচ্ছিল। আমি বললাম–

আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ–আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্যে....। হে আল্লাহ্! ধৈর্য এবং সন্তুষ্টির সাথে তোমার সব পুরস্কারের জন্যে শুকর আদায় করছি, যা তুমি আমাদেরকে, ইসলাম, ঈমান এবং জিহাদের রূপে দান করেছ।

এরপর জল্লাদ এক অন্ধকার ঘরের দরজা খুলে আমাকে তাতে রেখে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে চলে গেল।

চব্বিশ নম্বর কক্ষে

আমি বিস্মিল্লাহ বলে সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করলাম। কক্ষের দ্বার বন্ধের সাথে সাথেই তীব্র বৈদ্যুতিক আলোকে চোখ ধাঁধিয়ে উঠল যেন। বুঝলাম, আমার দ্বিতীয় প্রকার শাস্তি শুরু হয়ে গেছে। দেখলাম, পুরো কক্ষটি কুকুরে ভরা। সংখ্যা ঠিক কত কুকুর ছিল তা আমার মনে পড়ছে না। আমি এত সব হিংস্র কুকুর দেখে ভয়ে চোখ বন্ধ করে নিলাম। আমার সারা শরীর জুড়ে অসংখ্য কুকুরের অসহ্য দংশন চলছিল। মাথা, হাত, ছাতি, পিঠ,

পা মোটকথা সর্বত্র কুকুরের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল। আমি এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখার জন্যে চোখ খোলা মাত্রই আবার বন্ধ করতে বাধ্য হলাম। অনন্যোপায় অবস্থায় আমি আল্লাহ্‌র নাম-আসমাউল হুসনা-জপতে শুরু করলাম। আমি কুকুরের বিষাক্ত দংশনের কথা ভুলে গিয়ে আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল হয়ে পড়লাম। বললাম–

"হে পাক পরওয়ারদেগার! পৃথিবীর সবকিছু থেকে আমার সম্পর্ক ছিনিয়ে নিয়ে কেবল তোমার সাথে আমার সম্পর্ক অটুট রাখছি। তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকলেই আমার সাফল্য..... আমি জীবন ও দুনিয়ার সবকিছুর বিনিময়ে কেবল তোমার নৈকট্য চাই। তোমার রহমতের দরবারে আমাকে ঠাঁই দাও.....আমাকে তোমার দ্বীনের পথে ভালবাসা, সন্তুষ্টি এবং শাহাদাতের মৃত্যু দান কর এবং তাওহীদবাদী প্রতিটি ব্যক্তিকে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় দান কর।"

এভাবে কুকুরের কামড় এবং আমার ইবাদতের মধ্যে বেশ কয়েক ঘন্টা কেটে যায়। হঠাৎ কক্ষের দরজা খুলে যায় এবং আমাকে ঘরে নেয়া হয়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমার পরনে সাদা-পরিচ্ছদ রক্তে লালে লাল হয়ে আছে। কিন্তু কি আশ্চার্য! আমার পরিচ্ছদ ঠিক আগের মতই নিখুঁত সাদা রয়েছে এবং শরীরের কোথাও কুকুরের কামড়ের কোন চিহ্নই নেই। এ কি বিস্ময়! আল্লাহ্ পাকের সে-কি গায়েবী রহমত! হে খোদা, আমি কি তোমার এত করুণা পাওয়ার উপযুক্ত!....সব তোমারই প্রশংসা, প্রভু!....আমি মনে মনে এসব বলছিলাম। এমন সময় কারাগারের জল্লাদ আমাকে জিজ্ঞেস করল–

ঃ কি ব্যাপার, তোকে কুকুরে কামড়ায়নি? কিন্তু কেন? কি অবাক কান্ড এসব.... বলে সে তার হান্টারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। তার সাথে আগত দ্বিতীয় ব্যক্তিও হাতের ছড়ি নাড়তে নাড়তে কি যেন ভাবছিল।

পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যার শেষ লালিমা ম্লান হয়ে আসছিল। এটা মাগরিবের নামাজের সময়। তিন ঘন্টার চেয়ে বেশী সময় পর্যন্ত হিংস্র কুকুরদের মধ্যে কাটিয়ে সম্পূর্ণ অক্ষত শরীরে বের করে আনার জন্যে আমি অশ্রুসজল হয়ে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলাম।

নামাজের পর জেলের এক কর্মী আমাকে নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এক বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড় করাল। দরজা খুললে সামনে দেখলাম ভয়াল এক নির্জন মাঠ। মাঠ পেরিয়ে এক দীর্ঘ অন্ধকার করিডোর হয়ে সামনে যাচ্ছিলাম। করিডোরের উভয় পাশে অসংখ্য বন্ধ দরজা। মাত্র একটি দরজা দিয়ে দেখলাম আলো বেরিয়ে আসছে। দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে

দেখলাম, এটা দু'নম্বর কক্ষের দরজা এবং উচ্চ পদস্থ এক অফিসার মোহাম্মদ রাসাদ মুহনা বসে আছেন। তিনি এক সময় মিশরের যুবরাজ ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে সরকারের এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল যে, ইখওয়ানরা সম্ভবতঃ তাঁকেই মিশরের প্রেসিডেন্ট পদে বসাবে। সুতরাং তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়।

তিন নম্বর কক্ষে

তিন নম্বর কক্ষের দরজা খুলে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঠেলে দেয়া হলো। দরজা বন্ধ হতেই ছাদে লটকানো তীব্র আলোক-সম্পন্ন বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠল। সে আলো এতই প্রখর ছিল য, তাতে চোখ খোলা রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। বুঝলাম, চোখ ধাঁধানো এই আলোর খেলা আমার শাস্তিরই একটি অংশ বটে!

কিছুক্ষন পরে আমি ভেতর থেকে দরজা খোলার জন্যে দরজায় করাঘাত করলে এক ভয়ংকর হাবশী দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি তাকে ওজুর পানি এনে দিতে বললে সে কর্কশ কণ্ঠে মুখ ভেংচিয়ে বলল–

"তুই জানিসনে, এখানে দরজা নাড়া নিষিদ্ধ, পানি চাওয়া নিষিদ্ধ, ওজু করা নিষিদ্ধ, পানি খাওয়া নিষিদ্ধ.....।" এই বলে সে শুন্যে হান্টার ঘুরিয়ে আবার বলল–

"খবরদার! আবার যদি তোর দরজা নাড়ার শব্দ শুনি, তাহলে এই হান্টার দিয়ে তোর গায়ের চামড়া খুলে ফেলব।"

কক্ষে কিছুই ছিল না। এমনিতেও চব্বিশ নম্বর কক্ষে তিন ঘন্টা পর্যন্ত কুকুরের সাথে কাটিয়ে দৈহিক ও মানসিক ভাবে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সুতরাং মাটিতে তায়াম্মুম করে গায়ের চাদর বিছিয়ে এশার নামাজ আদায় করি। এরপর আমি একটু আরাম করার চেষ্টা করি। কিন্তু হাড়ে হাড়ে প্রচন্ড ব্যথায় কাতরাচ্ছিলাম। তবুও জুতো দুটো মাথার নীচে পেতে শোয়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মানবতার দুশমনরা এমন কান্ড শুরু করে দিল যে, বিশ্রাম করার কথা ভুলেই গেলাম।

আমার কক্ষের ভান্টিলেটার ছিল অনেক বড়। ভ্যান্টিলেটারের পথে কারাগারের প্রাঙ্গণ স্পষ্টই দেখা যায়। ওরা ঠিক সেই ভ্যান্টিলেটারের সামনেই একটি শুলিকাষ্ঠ এনে দিল। এরপর ইসলামী আন্দোলনের যুবক কর্মীদের সেই শুলিতেই চড়িয়ে নির্যাতনের নিত্য নতুন কলাকৌশলের অনুশীলন শুরু করলো। হান্টারের আঘাতে তাদের দেহ জর্জরিত করে দেয়া হলো। কিন্তু আল্লাহর পথের সেসব বীর তুরুণরা পরম ধৈর্যের সাথে সব সহ্য করে।

কেবল আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া আর কোন শব্দই তাদের মুখ থেকে শোনা যেত না। চাবুকের প্রতিটি আঘাতের সাথে তাদের মুখ থেকে বের হতো শুধু ইয়া আল্লাহ্! শব্দ, ব্যাস।

এই জঘন্য-অমানুষিক নির্যাতনের সময় খুনী জল্লাদ তাদের অত্যন্ত কদর্য ভাষায় জিজ্ঞেস করতো.....

ঃ বল কুত্তার বাচ্চা, এখানে কবে এসেছিস?

ওরা এর জবাব দিলে জিজ্ঞেস করতো-

ঃ জয়নব আল-গাজালীর ওখানে শেষবার কবে গিয়েছিলি?

যদি কোন যুবক এই প্রশ্নের জবাবে বলতো যে, জানিনে বা মনে নেই তখন এই নরাধম বর্বর পশুরা সবাই এক সাথে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হান্টার এবং চাবুক মারতে মারতে তাদেরকে বলতো অশ্লীল ভাষায় আমাকে গালি দেয়ার জন্য। কিন্তু এসব চরিত্রবান শিক্ষিত যুবক যাদের মধ্যে কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ অধ্যাপক, কেউ বুদ্ধিজীবি, আইনজীবি মুসলিম প্রাণ থাকতে তারা গালি দেয়ার কথা ভাবতেও পারেনা। তারা বলত-

"তিনি তো আমাদের মায়ের মত, খোদাভক্ত মহিয়সী মহিলা। যুবকরা যখন অশ্লীল গালাগালি উচ্চারণ করতে অস্বীকার করতো তখন জল্লাদ তাদের উপর ক্ষেপে গিয়ে অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিত। কিন্তু কোনক্রমেই যুবকদেরকে নীতিভ্রষ্ট করা সম্ভব ছিলনা। কোটি কোটি প্রশংসা সেসব বীর যুবকদের, যারা মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও মিথ্যা-বাতিলের সাথে আপোষ করেনি, শত বিপদ-মুসীবতের মুখেও সত্যের পথ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হয়নি।

এসব উন্নত চরিত্রের অধিকারী বলিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যুবকদের উপর অন্যায় অত্যাচারের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তে দেখে আমার মনপ্রাণ যে কেমন ছটফট করছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শুধু আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছিলাম.....

"হে রাহমানুর রাহীম আল্লাহ্, তুমি ওসব নিরপরাধ যুবকদের শাস্তি আমারই কাঁধে চাপিয়ে তাদের মুক্তি দাও।"

আমি চাচ্ছিলাম, যুবকরা জালিমদের কথায় সায় দিয়ে মুক্তি লাভ করুক এবং আমি তাদের জায়গায় সব অত্যাচার সহ্য করি। কিন্তু তা হয়নি।

তারা একের পর এক কঠিন নির্যাতন ভোগ করছিল। আল্লাহ্‌কে ডাকছিল

কিন্তু সত্য পথ ত্যাগ করেনি। তাদের এসব দুঃখ কষ্ট দেখে আমি আমার ব্যথা-বেদনার কথা ভুলে যাই। তাদের কষ্টের সামনে আমার উপর কৃত অত্যাচারকে অনেক হালকা বলে মনে হচ্ছিল। এখন তাদের ব্যথাতেই আমি ব্যথা অনুভব করছিলাম। তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে শুধু রহমত কামনা করছিলাম।

স্বপ্ন

এই অবস্থায় কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি তা টেরই পাইনি। সম্ভবতঃ এতে আল্লাহ্‌রই মেহেরবানী নিহিত ছিল। আমি আমার বিপদের দিনগুলোতে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ইতিমধ্যেই তিনবার স্বপ্নে দেখেছি; আর আজ চতুর্থবারের মত এই সৌভাগ্য অর্জন করলাম।

আমি স্বপ্নে দেখলাম, বিরাট এক মরুপ্রান্তরে অনেকগুলো উট। সে সব উটের পিঠে আলো ঝমমল আসন পাতা এবং প্রতিটি উটের পিঠে চারজন করে শান্ত সৌম্য-কান্তির যাত্রী বসে আছেন। যতদূর দৃষ্টি যায় সারা মরুপ্রান্তর জুড়ে উট আর উটের দিগন্ত পরিব্যাপ্ত কাফেলা। এর মধ্যে আমি নিজেকে ভাবগম্ভীর অথচ হাসি মুখে দীপ্ত চেহারার এক মহাপুরুষের সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় পাই। দেখলাম এত অসংখ্য উট যে প্রান্তরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের প্রত্যেকের গলার রসি তাঁরই হাতের মুঠোয়।

আমি অত্যন্ত বিনয়-নম্রতার সাথে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম–

ঃ প্রিয় নবী কি এখানে আছেন? তিনি আমার প্রতি প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করে বললেন–

ঃ জয়নব! তুমি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বান্দা মুহাম্মদের অনুসৃত পথেই রয়েছে।

আমি আনন্দাপ্লুত হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম–

সত্যি সত্যিই কি আমি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁর বান্দার নির্দেশিত পথে চলছি?

ঃ হ্যাঁ, হে জয়নব, হে গাজ্জালী, আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথেই রয়েছ। আমি পুনরায় একই কথা জিজ্ঞেস করলাম–

ঃ ওগো আমার প্রিয় নবী; ওগো আমার আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথের অনুসরণ করছি?

ঃ প্রিয় নবী বললেন–

ঃ হে জয়নব তুমি সত্যের পথে রয়েছ; হে জয়নব! তুমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদের অনুসৃত পথে আছ।

ঘুম থেকে জেগে আমি নিজের মধ্যে অপূর্ব এক শক্তি ও প্রশান্তি অনুভব করলাম। এই স্বপ্ন আমাকে বর্তমানের সব জুলুম নির্যাতনের ভাবনা থেকে নির্লিপ্ত উদাসীন করে দেয়। হান্টারের আঘাত অথবা আমার সামনের প্রাঙ্গণে ইখওয়ানের উপর চালানো বর্বরতার অত্যাচার....কিছুকেই আর তেমন দুঃখজনক মনে হচ্ছিল না। দেখলাম, সামনে প্রাঙ্গণ থেকে শুলিকাষ্ঠ তুলে নেয়া হয়েছে। এখন বেশ দূর থেকেই মারপিটের শব্দ ভেসে আসছিল।

আমি ভেবে আশ্চর্য হলাম যে স্বপ্নে প্রিয় নবী আমাকে আমার আসল পৈত্রিক নামেই সম্বোধন করেছেন। আমার আসল পৈত্রিক নাম হচ্ছে জয়নব গাজ্জালী। কিন্তু জনসাধারণ আমাকে জয়নব আল-গাজ্জালী হিসেবে জেনেছেন।

এই সৌভাগ্যপূর্ণ স্বপ্ন দেখেছি বলে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করার জন্যে তক্ষণই তায়াম্মুম করে নামাজে দাঁড়াই। সিজদাবনত হয়ে আমি অশ্রু বিগলিত স্বরে আল্লাহ্‌কে বললাম–

ঃ আমার প্রভু! কি বলে আমি তোমার শোকর আদায় করবো? তোমার শোকর আদায় করার মত শক্তিও যে আমার নেই। ····ইয়া রাব্বুল আলামীন! আমি নিজেকে তোমার সন্তুষ্টির পথে শাহাদাতের জন্যে উৎসর্গ করছি। ····হে পারওয়ারদেগার! আমার কারণে যেন কেউ দুঃখ মুসিবতে না পড়ে যায়·····হে প্রভু! ····শুধু তোমার সন্তুষ্টির সরল-সুন্দর পথেই আমাকে অবিচল রাখ····।

আমি নামাজ আদায় করেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত একই প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছিলাম। তখন আমি এমন প্রশান্তি ও আনন্দ অনুভব করছিলাম যে, যেন কোন নতুন পৃথিবীতে পৌঁছে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কক্ষের বাইরের পথ ও প্রাঙ্গণে আমি অনেকগুলো গাড়ী এবং লোকদের ত্রস্ত চলাফেরার শব্দ শুনে চকিত হই। পরে জেনেছি যে, তা ছিল জল্লাদদের ডিউটি পরিবর্তনের সময়। পুরানো জল্লাদরা চলে গেছে এবং নতুন জল্লাদরা অত্যাচারের জন্যে নতুন উদ্যম নিয়ে এসেছে।

ফজরের আযান শুনে আমি তায়াম্মুম করে বারবার আজানের শব্দ উচ্চারণ করি এবং নামায আদায় করি। এ অবস্থায় ২০শে আগষ্ট থেকে ২৬শে আগষ্ট পর্যন্ত বরাবর ৬ দিন একই কক্ষে আবদ্ধ থাকি এর মধ্যে একটি বারও কক্ষের দরজা খোলা হয়নি, এক ফোটা পানি কিংবা কোন রকমের খাদ্য দেয়া হয়নি। বাইরের কারো সাথে যোগাযোগ বা কথাবার্তাও হয়নি। পানি নেই, খাদ্য নেই, কথাবার্তা নেই– ৬টি দিন ৬টি রাত অন্ধকার কক্ষে

একাকিত্বের এই জীবন, একটু কল্পনা করে দেখুনতো! পানাহার নাইবা হলো, কিন্তু মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণকে কেউ কিভাবে অস্বীকার করতে পারে।

সেসব লোকদের আপনারা কি নামে বিশেষিত করবেন, যারা নিজেদেরকে মানুষ বলে দাবী করে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপ শয়তানকেও লজ্জিত করে। এসব অত্যাচারী শাসকরা নিজেদের অতিমানবীয় কোন সৃষ্টি বলেই মনে করে নিয়েছে এবং নিজেদেরকে মানবতার সব নীতি থেকে মুক্ত বলে ভেবে নিয়েছে।

আপনারাও হয়তো বিস্মিত হচ্ছেন যে, ৬দিন পর্যন্ত পানাহার না করে, এমনকি প্রাকৃতিক প্রয়োজনও পুরণ না করতে পেরে একজন মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে। সেই একই বিস্ময় জেগেছিল আমার কক্ষের বাইরে প্রহরারত জল্লাদেরও। সে দরজা খুলে আমাকে সুস্থ ও শান্ত ভাবে বসে থাকতে দেখে একটা বিশ্রী গালি দিয়ে জিজ্ঞেস করল–

ঃ কিরে, তুই আজো মরিসনি বুঝি! এখনও বেঁচে আছিস? এমন অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য অবস্থায় এতদিন পর আমি কিভাবে বেঁচে আছি এবং সুস্থ আছি তা বলছি, শুনুন!

প্রথমত ঃ আল্লাহ্‌র উপর অবিচল ঈমান ও আস্থা। কারণ ইসলাম তার সত্যিকারের অনুসারীদের মধ্যে এমন এক শক্তির সঞ্চার করে, যার ফলে ঈমানদার ব্যক্তি সব রকমের দুঃখ-মুসিবত জয় করে নিতে পারে, তা জুলুম-অত্যাচার যত সাংঘাতিকই হোক না কেন। আল্লাহ্‌র ফজলে মু'মিন ব্যক্তি এমন সহ্য শক্তির অধিকারী হয়ে উঠে যে, কোন কঠিনতর বিপদও তাকে আতঙ্কিত বা বিচলিত করতে পারে না। জালিম অত্যাচারীরা তাদের বাহ্যিক শক্তির অহমিকায় মদমত্ত থাকে কিন্তু ঈমানদারের আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে অন্য সব শক্তিই তুচ্ছ প্রমাণিত হয়। মুমিন ব্যক্তি যেকোন রকমের ভয় ভীতি বা লোভ-লালসা থেকে মুক্ত জীবন-যাপনে সক্ষম। দ্বিতীয়ত ঃ সেই পবিত্র স্বপ্ন, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাকে সত্য জীবন এবং সাফল্য দানেরই সমতুল্য। এর ফলে আমি পরিবেশের প্রভাব উপেক্ষা করে বাঁচার শক্তি পাই। এই স্বপ্ন আমাকে যে কোন চরম দুঃখ বিপদ সহ্য করেও সহজ জীবন যাপনের শক্তি সঞ্চার করে।

পানাহার থেকে বঞ্চিত নিঃসঙ্গ বন্দিত্বের সপ্তম দিন সেই জল্লাদ পচা-

দুর্গন্ধযুক্ত চারটি ময়লা রুটি এবং এক টুকরো মাখন নিয়ে আমার কক্ষে প্রবেশ করে ওসব আমার সামনে মাটিতে ছুঁড়ে মেরে বলে–

ঃ যতক্ষণ বেঁচে আছিস, এসব খেয়ে নে..... ।

এর সাথে সাথে তার কুৎসিত মুখের বিশ্রী গালিগালাজ তো ছিলই। আমি রুটি বা মাখন স্পর্শও করিনি। তবে পানির পাত্র তুলে নেই। কিন্তু পানির পাত্র এবং পানিও এত ময়লা এবং দুর্গন্ধযুক্ত ছিল যে, মুখে নেয়ার উপায় নেই। কিন্তু চোখ-নাক বন্ধ করে এই বলে পানিটুকু খেয়ে নিলাম–

"সেই মহান আল্লাহ্‌র নামে, যার নামের বরকতে আকাশ মাটির কোন কিছুই আমার ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ সব কিছু শুনেন এবং জানেন। হে আল্লাহ্, তুমি আমার জন্য এই পানিকে স্বাস্থ্যের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যে রূপান্তরিত করে দাও।"

পানি পান করার পর দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপর সূর্য্যাস্তের সময় সেই জল্লাদ আবার এসে দরজা খুলে তার স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে বলল–

ঃ বেরিয়ে এসে পেশাব-পায়খানা সেরে আয়।

বেরুতে গিয়ে আমি শারীরিক দুর্বলতায় মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলাম। তা দেখে জল্লাদ আমাকে ধরে পায়খানা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। আমি যখন শৌচাগারের দরজা বন্ধ করতে যাই তখন সে বলে–

এর দরজা বন্ধ করা নিষেধ। একথা শুনে বেরিয়ে এসে আমি তাকে বললাম–

ঃ আমাকে আমার কক্ষে পৌছিয়ে দিয়ে এস। আমার কোন কিছুর দরকার নেই।

কথাগুলো শুনে সে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা ও নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়ে বলল–

ঃ আমি তোর প্রতিক্ষার জন্যে দাঁড়িয়ে অছি। তুই গিয়ে সেরে আয়!

ভেবে দেখুন, পশুত্বের এমন নজীর কি আর পাওয়া যাবে? সবচেয়ে নিকৃষ্টতম মানুষও কি এমন নীচ, এমন জঘন্য হতে পারে? কিন্তু নাসেরের হুকুমে এসব জল্লাদরা অসভ্যতা-পৈশাচিকতার ক্ষেত্রে পশুকেও হার মানিয়েছে।

আমি কক্ষে ফিরে এসে আফসোস করে বললাম–

এর চেয়ে তো মৃত্যুই ভাল। অন্ততঃ এমন অসভ্য-বর্বরের মুখ থেকে রক্ষা পেতাম। পানির কল পর্যন্ত এই শয়তানের সাথে যাবার জন্যে বাধ্য

হতাম না। সেই জল্লাদ কক্ষের দরজা বন্ধ করে চলে গেলে আমি তায়াম্মুম করে মাগরিবের নামাজ আদায় করি। নামাজ শেষ করার সাথে সাথেই দরজা খুলে কয়েক ব্যক্তি কক্ষে ঢুকলো। এর মধ্যে সেই পাষন্ড শয়তানকেও দেখতে পেলাম, যে আমাকে ৩ঘন্টা পর্যন্ত অসংখ্য কুকুরের মধ্যে থাকতে বাধ্য করেছিল। আমি তখন মাটিতে শুয়েছিলাম। সেই শয়তান কাউকে যেন বলল–

এস ডাক্তার, একে দেখ!

আমাকে পরীক্ষা করে ডাক্তার বলল–

ঃ "কিছুই হয়নি। এর হৃৎপিন্ড এখনো ঠিক আছে।"

কিন্তু অত্যাচারে আমার প্রাণ যে ওষ্ঠাগত, ডাক্তার তার কি জানে! এরপর ওরা দরজা বন্ধ করে সবাই চলে যায়। মিনিট কয়েক পরে দরজা আমাকে অন্য একটা অন্ধকার কক্ষে নিয়ে গিয়ে দেয়ালের সাথে দু'ঘন্টা পর্যন্ত বেঁধে রাখা হয়। তারা আমাকে নড়তে পর্যন্ত নিষেধ করে। তারা দরজা বন্ধ করে গালি দিতে দিতে বলল–

ঃ ওরে কুত্তার বাচ্চা, তোর মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে!

আমি তাদের কথাকে উপেক্ষা করে পূর্ণ শক্তির সাথে আল্লাহ্‌কে বললাম–

"হে খোদা; আমার মৃত্যু যেন ঈমান ও ইসলামের পথে হয়।" এরপর আমি সূরা ফাতেহা এবং সূরা বাকারা তেলাওয়াত শুরু করি। মনে হলো, যেন জীবনে এই প্রথমবার কুরআন তেলাওয়াত করছি। আমি চোখ বন্ধ করে কুরআন পাঠে মগ্ন ছিলাম, হঠাৎ প্রচন্ড জোরে আমার মুখের উপর কে যেন চড় বসিয়ে দেয়। সাথে সাথেই আলো জ্বলে ওঠে। দেখি বিরাটকায় এক জল্লাদ হান্টার নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার উপর নির্দয়ভাবে হান্টারের ঘা বসাতে লাগল। এরপর তিন খানা সাদা কাগজ আমার সামনে রেখে বলল–

ঃ আমরা যা যা বলব, এতে তা লিখে দিবি····।

হঠাৎ ওদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এসে আমাকে তার বলিষ্ট হাতে কষে ধরে প্রচন্ড বেগে দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে মারে। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি আমাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে ঝটকা দিতে দিতে দম্ করে মাটিতে ফেলে দেয় এবং একজন সিপাহীকে হুকুম দিয়ে বলে–।

ঃ বুট দিয়ে যত পার লাথি মার।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই নির্মম নির্যাতনের পর আমাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে সে কাগজ ও খানা হাতে দিয়ে বলে–

"তুই যত মানুষের নাম জানিস, এতে প্রত্যেকের নাম লিখে যা, তা সেসব ব্যক্তি সউদী আরব, সিরীয়া, সুদান, লেবানন বা দুনিয়ার যেকোন অংশেই অবস্থান করুক না কেন। যদি আমাদের হুকুম মোতাবেক না লিখিস, তবে তোকে এখানে এক্ষুনি গুলী করা হবে। আর হ্যাঁ, ইখওয়ান সম্পর্কে তোর সব জানা তথ্য এবং এর সাথে তোর সম্পর্কের ব্যাপারেও বিস্তারিত ভাবে লিখবি। নে, এই রইল কলম।"

এরপর দরজা বন্ধ করে ওরা চলে যায়।

আমি অত্যন্ত অবর্ণনীয় ব্যথায় জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও কাগজ কলম নিয়ে বসলাম–

আমি লিখতে শুরু করলাম–

"ইসলামী আন্দোলনের সূত্রে আমাকে চেনে এমন ভাই-বোন অনেক দেশেই ছড়িয়ে আছেন। আমাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েম করা। খোদার শপথ, আমাদের কাছে তারাই আসে, যারা সঠিক পথ নির্বাচন করতে সক্ষম। আর এই সঠিক পথ হচ্ছে প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং সাহাবাদের অনুসৃত পথ।

আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রচার এবং দ্বীনের বিধান মোতাবেক শাসন পরিচালনার জন্যে লোকদের আহবান জানানো। আর আমি আল্লাহ্‌র নামে তোমাদেরকেও আহবান করছি যে, তোমরা মূর্খতা ও জুলুমের পথ ছেড়ে দিয়ে ইসলামের পথে এস, তাওহীদ ও রিসালাতের অনুসরণ কর এবং নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ কর। বাতিলের পথে চলে তোমাদের মনমগজে যে অসত্য-অন্যায়ের বিষবাষ্প ঢুকেছে আল্লাহ্‌র পথে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে তুলে আনবেন।"

"আমার একথা দেশের প্রেসিডেন্টের কাছেও পৌঁছিয়ে দিও। সম্ভবতঃ তাওবা করে তিনি পুনরায় ইসলামের পথে ফিরে আসবেন। যদি তিনি তোমাদের দাওয়াত অস্বীকার করেন, তাহলে তিনি নিজে তার জবাবদিহি করবেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা এবং রাসূল।"

"হে আল্লাহ্‌, তুমি সাক্ষ্য থেকো যে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি।

এখন এরা যদি তাওবা করে তুমি তাদের তাওবা কবুল কর। আর তারা যদি জুলুমাতের অন্ধকারে থাকতে চায়, তাহলে তুমিই সব কিছু জানো, তুমিই উত্তম বিবেচক। আয় আল্লাহ্! আমাদেরকে সত্যের পথে অটল রেখ। আমাদেরকে শহীদী মৃত্যু দান কর।"

আমি আমার দ্বীনি দায়িত্ব মনে করে এসব লিখি এবং লেখা শেষ করে পুনরায় কুরআন শরীফ তেলাওয়াত শুরু করি।

কিছুক্ষণ পর সাফওয়াত রুবী এসে আমার লিখিত কাগজগুলো নিয়ে যায় আর আমাকে সেই নিঃসঙ্গ জায়গায় রেখে যায়। এরপর কয়েক মুহূর্তও কাটেনি, হঠাৎ দরজা খুলে সাফওয়াতের সাথে চারজন সামরিক ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করে; তাদের গালিগালাজের অভিধানে যত গালি আছে, সব প্রয়োগ করে বলল।

তুই কাগজে কি সব বাজে কথা লিখেছিস?

এরপর সে দরজার কাছ থেকে চেঁচিয়ে বলল–

ঃ সাবধান! সাবধান! সামরিক কারাগারের ডাইরেক্টর হামজা পাশা বসিউনি আসছেন।

ডাইরেক্টর কক্ষে প্রবেশ করে এমন সব অশ্লীল-বিশ্রী গালি উচ্চারণ করতে থাকল যে, কোন সাধারণ লোক তা ভাবতেও পারেনা। আমি অত্যন্ত ঘৃণাভরে তার দিকে চেয়ে রলাম। সে ওদের হাত থেকে আমার লিখিত কাগজ কয়খানা নিয়ে বলল–

ঃ তুমি যা কিছু লিখেছ, সব মিথ্যে কথা।

এই বলে সে ওসব টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে।

তারা সাফওয়াতের কথা উল্লেখ করে বলে–

ঃ এসব ঠাট্টা মস্করা নাকি! তোমার লিখিত বাজে কথা গুলো তাকে পীড়িত করেছে। বসিউনি বলল–

ঃ একে ধরে রাখ– বলে বাইরে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত পরে একজন সিপাহীকে নিয়ে ফিরে এলো। সিপাহীটি আমাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে অনেক উপরে উঠিয়ে ধড়াম করে নীচে ফেলে দেয়। মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ি। জ্ঞান ফিরে এলে দেখি, আমাকে কাঠের উপর এভাবে উল্টো লটকিয়ে বাঁধা হয়েছে, যেভাবে কসাই জবাইকৃত পশু লটকিয়ে রাখে। এরপর হান্টারের বেদম প্রহার। সেকি জঘন্য পাশবিক

মার! আমি তো আমি, কোন মানুষের পক্ষেই তা সহ্য করা সম্ভব নয়! এরই মধ্যে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে করতে আবার সম্বিত হারিয়ে ফেলি।

পুনরায় জ্ঞান ফিরে এলে দেখি আমি হাসপাতালের একটি স্ট্রেচারে শায়িত। তখন আমার কথা বলা বা নড়াচড়ার মত সামান্য শক্তিটুকুও ছিল না। অবশ্য আশেপাশের কথাবার্তা শুনছিলাম।

কিছুক্ষনের মধ্যে আমাকে আবার কারাকক্ষে রেখে আসা হয়। তখনো আমার শরীরের সর্বত্র রক্ত বয়ে পড়ছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় আমি দরজা নেড়ে প্রহরীকে ব্যান্ডেজ এবং ডাক্তার ডেকে পাঠাতে বলি। কিন্তু এর জবাবে বিশ্রী গালিগালাজ ছাড়া আর কিছুই পাইনি। অনন্যোপায় হয়ে আমি আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করি, যেন আমার ব্যথা-বেদনা এবং রক্ত পড়া বন্ধ হয়। আল্লাহ্ আমার দোয়া কবুল করেন। আমার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ব্যথা বেদনা অব্যাহত থাকে। এথেকে মুক্তির জন্যে আমি আল্লাহ্র নাম জপতে শুরু করি। এতে করে ব্যথা, যন্ত্রণা অনেকটা কম অনুভব করি। এমন সময় প্রিয় নবীর একটি হাদীস মনে পড়ল। প্রিয়নবী বলেছেন–

"অত্যাচারীতের ফরিয়াদ থেকে বেঁচে থেক। কারণ অত্যাচারীত ব্যক্তি এবং আল্লাহ্র মাঝখানে কোন যবনিকা থাকে না।"

এই দুঃসহ অবস্থাতেই বেশ কয়েক রাত কেটে যায়। কোন রকমের ওষুধপত্র বা চিকিৎসার নাম নেই। শুধু সেই কৃষ্ণকায় ভয়ঙ্কর প্রহরী দৈনিক নির্দিষ্ট সময়ে দরজা খুলে একটু মাখন আর বাসি কয়খানা রুটির টুকরো ছুড়ে দিয়ে যেত। কিন্তু খাবার অযোগ্য বলে আমি ওসবে হাতও দিতাম না। ফলে সে যেভাবে রেখে যেত, ঠিক ওভাবেই কুড়িয়ে নিয়ে যেত। ওসব রুটি ও মাখনের দুর্গন্ধ সহ্য করাই ছিল বড্ড কঠিন।

আল্লাহ্ তাদের সহায়

একদিন দরজার বাইরে কারো পায়ের চাপা শব্দ শুনে আমি এক আজব অনুভূতিতে দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছাই। দরজার যে ছিদ্রপথে প্রহরী আমার দেখাশুনা করত, সেই ছিদ্র পথে তাকিয়ে দেখি সামনে মুর্শিদে 'আম' ইমাম হুজায়বী। তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়েছে তাহলে! আমি সেই ছিদ্র পথে মুখ লাগিয়ে পবিত্র এই আয়াতটি পাঠ করলাম–

"যদি আপনি আহত হয়ে থাকেন তাহলে জাতিও ওভাবে আহত হয়েছে;

দুর্বলতা দেখাবেন না এবং দুঃখ করবেন না। আপনি যদি ঈমানের উপর কায়েম থাকেন তাহলে আপনি সাফল্য মন্ডিত হবেন।”

আমার দৃষ্টি তাঁর পবিত্র কদম চুম্বন করল এবং বারবার কুরআনের সেই আয়াত পড়তে থাকি। তিনি এর জবাব হাতের ইঙ্গিতে এমন ভাবে দিতেন যে, ছায়ার মত দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরী যেন কিছু বুঝতে না পারে। ইমাম হুজায়বীর এই নৈকট্য থেকে আমি আমার দুঃখ বেদনা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাই।

বস্তুতঃ মুমিন আল্লাহ্‌র পথে পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে। ইসলামে ছোট-বড় বলে কোন ভেদাভেদ বা বৈষম্য নেই। ইসলামে প্রত্যেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করে। সুতরাং নেতা এবং তার অনুসারী বা সেনাধ্যক্ষ এবং সাধারণ সিপাহীদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যেই কাজ করে এবং প্রত্যেকের কাছে আপন ভাইয়ের মত। এসব আদর্শগত চিন্তা আমার মনে প্রশান্তির শীতলতা এনে দেয়।

জুলুম-নির্যাতনের ষ্টীমরোলার

এই প্রশান্তি বেশী দিন থাকেনি। একদিন বিকেলে হঠাৎ কক্ষের দরজা খুলে সাফওয়াত এসে উপস্থিত। সে তার হাতের চাবুক দিয়ে দেয়াল পিটাতে পিটাতে আমাকে ধরে টেনে হেঁচড়ে কারাগারের অফিসের কাছে নিয়ে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে চলে যায়। কয়েক মুহূর্ত পরে এক ব্যক্তি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল–

ঃ তুমিই কি জয়নব আল-গাজ্জালী?

ইতিবাচক জবাব পেয়ে সে চলে গেল। এবার এলো বিরাটকায় ভয়ঙ্কর তিনজন সামরিক জওয়ান। মনে হচ্ছিল, তারা যেন এক্ষণি জাহান্নাম থেকে উঠে এসেছে। তাদের চেহারায় নিষ্ঠুরতার স্পষ্ট চিহ্ন। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে তাদের জিজ্ঞেস করল–

ঃ তারা কি আমাকে চিনতে পেরেছে?

জবাবে তারা সবাই বলল–

ঃ হ্যাঁ চিনেছে বৈ-কি। এর মৃত্যুর মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে।

এরপর দেখি, তারা বেরিয়ে গিয়ে ভাই ফারুক মনসাবীকে চাবুক মারছে। তাকে উঁচু কাঠের উপর লটকিয়ে রাখা হয়েছে আগ থেকেই। চাবুক মারার সাথে সাথে তারা ভাই ফারুককে জিজ্ঞেস করছিল–

"জয়নব গাজালীর সাথে কয়বার দেখা করেছিস? এর সাথে সাথে তারা আমাকে অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়ার জন্যেও বলছিল। কিন্তু সেই আল্লাহ্‌র বান্দা ওদের কথা মানতে অস্বীকার করলে পিটুনির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাঁর এই অবস্থা দেখে আমার চোখ ফেটে অশ্রুর বদলে যেন রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। অনেক মারধরের পর ভাই ফারুককে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি তাঁর প্রাণ বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে তিনি বেঁচে যান। শেষ পর্যন্ত বিচারের সাথে প্রহসন চালিয়ে তাঁকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়। আল্লাহ্‌র এই সৈনিক জেলে বসেও কায়েদীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করে তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ইসলামের দুশমনরা তাঁকে লিমানতারা জেলে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে (ইন্নালিল্লাহ.....) তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে অবিচল থেকে শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

পাপিষ্ঠরা শুধু ভাই ফারুকের উপরই এমন অত্যাচার করেনি। তারপর, তারা অন্য এক ভাইকে কাষ্ঠে লটকিয়ে সেই একই ধরণের প্রশ্ন করে এবং আমাকে গালি দিতে বলে। কিন্তু ভাইটি গালি দিতে অস্বীকার করলে তাঁকে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারা হয় যে, তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তিনি মরে গেছেন মনে করে ষ্ট্রেচারে তুলে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। আসলে পাপিষ্ঠরা মনে করেছিল, এসব দেখে আমি তাদের মর্জিমত মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে রাজী হয়ে যাব। এ উদ্দেশ্যেই তারা আমার কাছে এক ব্যক্তিকে পাঠায়। সেই ব্যক্তি আমার কাছে এসে নিজেকে অত্যন্ত ভদ্র এবং আমার শুভাকাঙ্খী হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করে।

সে এসে আমাকে সালাম করে পরিচয় দেয়–

"আমি এটর্নি ওমর ঈসা।"

পরে আমি জানতে পেরেছি, তার কথা মিথ্যে। আসলে সেও ঐ শয়তানদেরই একজন। সে তার কথা শুরু করতে গিয়ে বলে–

"জয়নব, আমি তোমার সাথে সমঝোতা করতে আগ্রহী। তুমি নিজেই নিজেকে যে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছ, তা থেকে তোমাকে মুক্তি করানোই আমার উদ্দেশ্য.....। তুমি একজন সম্মানীতা মহিলা। একটু ভেবে দেখতো! হুজায়বীর মতো লোকেরা পর্যন্ত সব স্বীকার করে নিয়েছে এবং তারা তোমার ব্যাপারে এমন সব কথা প্রকাশ করেছে, যাতে তোমার ফাঁসীর শাস্তিও হতে

পারে। তারা নিজেদেরকে তো বাঁচিয়ে নিয়েছে কিন্তু তোমাকে আরো বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আমার মতে সময় থাকতে তুমি এখনো নিজের মান-ইজ্জত রক্ষা কর এবং সব কিছু বলে দাও। বল, তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল? এবং তোমার নিজের মতামতও বিস্তারিত ভাবে জানাও। আমার ধারণা, তোমার মতামতই যথার্থই হবে।"

ওর এসব ভনিতা শুনেও আমি চুপ করে রলাম। কোন জবাব না পেয়ে সে আবার বলল–

"জয়নব, তুমি খুব ভেবেচিন্তে জবাব দিও। আসলে আমি প্রকৃত ব্যাপার জানতে চাই।"

এবার আমি বললাম–

"আমার যতটুকু ধারণা, ইখওয়ানুল মুসলিমুন এমন কোন কাজ করেনি, যা কোন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির কাছে ক্রোধের কারণ হতে পারে। আমি নিজেও ইখওয়ানের সাথে রয়েছি। আমরা এমন কিইবা অপরাধ করেছি? আমরা লোকদের ইসলামী শিক্ষা দেই, এটা কি কোন অপরাধের কাজ?"

এই বলে আমি চুপ করে গেলে সে বলল–

কিন্তু এতে করে এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তারা এমন অনেক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, যার মধ্যে জামাল আবদুন নাসেরের হত্যা এবং দেশে অরাজকতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্রও শামিল ছিল। আর তাতে তুমি তাদের মদদ দিচ্ছিলে। দেখ, আমি এটর্নি, বাস্তব সম্পর্কে অবহিত হওয়াই আমার কাজ। আমি বললাম–

আবদুন নাসেরকে হত্যা করা বা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করা ইখওয়ানের উদ্দেশ্য হতেই পারে না। বরং জামাল নাসেরই দেশকে ধ্বংস করে ছেড়েছে। বস্তুতঃ আমাদের উদ্দেশ্য অনেক উন্নত এবং গঠনমূলক এটা একটা অকাট্য সত্য। আমরা নিখুঁত তাওহীদ, ইবাদাত তথা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে আল্লাহ্‌র মনোনীত জীবনাদর্শ কায়েম করতে চাই। আমরা যখন এই মহৎ উদ্দেশ্য অর্জন করব, তখন মিথ্যে জুলুমাতের তখ্‌ত্‌-তাউস আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সব নকল কাহিনীর বিনাশ ঘটবে। মনে রেখো, আমাদের উদ্দেশ্য সংস্কার সাধন ও পুনর্গঠন। ভাঙ্গা নয় নির্মাণ এবং উন্নতিই আমাদের কাম্য।

একথা শুনে সে হেসে বলল–

"প্রকৃতপক্ষে তোমরা জামাল নাসের এবং তার সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলে। এটা তোমার কথাতেই বোঝা যায়।"

আমি বললাম–

ঃ দেখ, ইসলামে ষড়যন্ত্র, চক্রান্তের কোন অবকাশ নেই। আমরা ওসব জানিনে। বরং আমরা সব রকমের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। আমরা মানুষের সামনে দুটি পথের স্বরূপ তুলে ধরি। তার একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথ এবং অন্যটি শয়তানের পথ। যারা শয়তানের পথে চলে আমরা তাদেরকে বিভ্রান্ত রোগী মনে করি। এসব লোকদের আমরা অত্যন্ত স্নেহের সাথে সত্যের ওষুধ দান করি। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র শরীয়ত-আল্লাহ্‌র দ্বীন।

"আমরা কুরআন নাযিল করেছি, তা মোমেনদের জন্যে রহমত এবং মুক্তি (স্বরূপ), এবং অত্যাচারীদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নেই।"

এবার সেই শয়তানের কথাবার্তা পাল্টে যেতে লাগলো, যে নিজেকে এটর্নি হিসেবে জাহির করছিল। আসলে এ ছিল সাঈদ আব্দুল করিম। সে এই বলে বেরিয়ে গেল–

"আমি তোমার উপকার করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে, তুমি এখনো ইখওয়ানের ভাব প্রবণতার শিকার হয়ে রয়েছো।"

এরপর সাফওয়াত রুবী এসে আমাকে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়ে দেয়। এভাবে বেশ কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত আমাকে নিশ্চলভাবে দাঁড় করিয়ে রাখে এবং আমার সামনে ইখওয়ানদের উপর অকথ্য অমানুষিক নির্যাতন চালাতে থাকে। এসব দেখে দেখে আমার রক্ত পানি হচ্ছিল শুধু। এঁদের মধ্যে অনেককেই আমি ঘনিষ্টভাবে জানি। যেমন, সারসী মুস্তফা, ফারুক আসসাদী, তাহের আব্দুল আজীজ সালেম। এঁরা আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী। কিছুক্ষণ পর সেই তথাকথিত এটর্নি, হামজা বিসিউবি এবং সাফওয়াত রুবি ফিরে আসে। হামজা বলল–

"তুমি এটর্নির সাথে সমঝোতায় আসতে চাচ্ছনা কেন? আমরাতো তোমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে চাচ্ছি। আমি তোমার স্বামীকে যতটুকু জানি, তিনি খুবই ভাল লোক। কিন্তু তুমি প্রতারণার শিকারে পরিণত হয়েছ। হাসান হুজায়বী সব কিছুই বলে দিয়েছে।

আমি শ্লেষের স্বরে জিজ্ঞেস করলাম–

"সত্যিই কি ইখওয়ানরা সব কিছু বলে দিয়েছে? আর এজন্যেই তোমরা ওদের উপর এখনো অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছ? তাদের গুলিকাঠে

ঝুলিয়ে চাবুক মারছো! ....জেনে রেখো, আমি কক্ষনো ইখওয়ানের বিরুদ্ধে বা আমার নিজের বিরুদ্ধে মিথ্যে বলতে পারবো না। আমরা মুসলমান। ইসলামের জন্যেই আমাদের সব চেষ্টা সাধনা। এই আমাদের কাজ কর্ম।"

এদের পিছনে চারজন জল্লাদ দাঁড়িয়েছিল। ওদের হাতের হান্টার ও চাবুক এই ক্ষণিক আগে ইখওয়ানদের রক্ত ঝরাচ্ছিল।

আমি তথাকথিত এটর্নির দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করে তিরস্কারের স্বরে বললাম–

মিষ্টার এটর্নি! এসব হান্টার আর চাবুকও বুঝি আপনাদের আইন কলেজের পাঠ্য সূচীর বিষয়বস্তু ছিল? আমার কথা সম্পন্ন হবার আগেই হামজা বিসিউনি আমার গালে প্রচন্ড এক চড় বসিয়ে দিয়ে বলল–

"তুই আমাদের সবাইকে পাগল ঠাউরিয়েছিস, না? আমি তোকে আজ এমন ভাবে দাফন করে দেবো, যেভাবে রোজ দশজন ইখওয়ানকে দাফন করে থাকি।"

আমি দ্বিতীয় বার তথাকথিত এটর্নির দিকে লক্ষ্য করে বললাম–

সত্যি সত্যিই যদি এটর্নি হয়ে থাক, তাহলে তুমি তোমার সার্বক্ষণিক ডায়রীতে এসব অত্যাচারের ঘটনা নোট করছ না কেন? ....তাছাড়া তুমি যে এটর্নি তার প্রমাণ কি.....?

একথা শুনে হামজা বিসিউনি বলল–

"ব্যাস, যাও তোমরা নিজ নিজ কাজে যাও। আমি তো এর উপকার করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে যে তা চায় না।"

এর সাথে সাথে সাফওয়াত এবং তার সাথী জল্লাদরা এলোপাথাড়ী ভাবে আমার উপর হান্টার চালাতে শুরু করে। চোখ রক্ষার জন্যে আমি দু'হাতে চোখ ঢেকে রাখি। বাকী সমগ্র শরীর হান্টারের আঘাতে জর্জরিত হচ্ছিল। আমি এই দুঃসহ উৎপীড়নের অনুভূতি হ্রাসের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র দারবারে মোনাজাত করি এবং হান্টারের প্রতি ঘায়ের সাথে "ইয়া রব-ইয়াআল্লাহ্' শব্দ উচ্চারণ করতে থাকি।

সাফওয়াত ও তার সঙ্গীরা অনেক হান্টার চালিয়ে প্রায় ক্লান্ত হয়ে গিয়ে আমাকে বেঁধে দেয়ালের গায়ে লটকিয়ে রাখে এবং হাত দু'টোকে যতটুকু সম্ভব উপর দিকে টেনে বেঁধে রেখে চলে যায়। এ অবস্থায় আমার শাস্তি ও

আরাম লাভের একমাত্র সম্বল ছিল আল্লাহ্‌র নাম জিকির করা। সুতরাং আল্লাহ্‌র নাম জিকির এবং তাঁরই কাছে মোনাজাত করতে থাকি।

বেশ কয়েক ঘন্টা এভাবে রাখার পর সাফওয়াত সাম্বো নামক এক কৃষ্ণকায়কে নিয়ে আমার কাছে আসে। আসা মাত্রই তারা উভয়ে আমার উপর দমাদম কিল ঘুষি আর চড় মারতে থাকে। এরপর আমাকে সেলে নিয়ে বন্ধ করে দেয়।

ওরা চলে যাবার পর দূরে কোন মসজিদের মিনার থেকে ফজরের আযান ধ্বনি ভেসে আসে। আমি সব ব্যথা-বেদনা ভুলে গিয়ে প্রথমে নামাজ আদায় করি এরপর দু'হাত তুলে খোদার কাছে বলি- "ইয়া রাব্বুল আলামীন, তুমি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হও তাহলে দুনিয়ার কোন অত্যাচারকেই ভ্রুক্ষেপ করিনে। তোমার দয়া এবং রহমত আমার জন্যে যথেষ্ট। আমি তোমার আলোক কামনা করি যা দুনিয়া ও আখেরাতকে আলোকিত করে এবং তোমার অসন্তুষ্টি ও গজব থেকে মুক্তি চাই। হে খোদা, আমি তোমারই দরবারে হাজির হ:: :-হে প্রভু! তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট থাক; নিঃসন্দেহে তুমিই সব কিছুর মালিক সর্ব শক্তিমান।"

প্রেসিডেন্ট নাসেরের প্রতিনিধি

একাধারে তিন দিন পর্যন্ত সেলে আবদ্ধ রাখার পর আমাকে দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে লম্বা চওড়া এক শ্বেতকায় ব্যক্তি আমারই অপেক্ষায় বসে ছিল। আমি দফতরে পৌছান মাত্রই ভদ্রলোক বলল-

"বস, জয়নব! আমরা জানি যে, এরা তোমাকে মেরেপিটে খুব ক্লান্ত করে রেখেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে জানি। .....আমি প্রেসিডেন্টের দফতর থেকে সরাসরি এসেছি। আমি তোমার সাথে আপোষ মীমাংসায় আসতে চাই। সারা দেশের জনতা তোমাকে ভালবাসে, আমরাও তোমাকে শ্রদ্ধা করি।....কিন্তু তুমি আমাদেরকে দুরে ঠেলে রেখেছো এবং আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছ। .....জানিনে, তুমি আমাদের সাথে সমঝোতায় আসতে কেন রাজী নও। খোদার শপথ করে বলছি, তুমি যদি আমাদের সাথে সমঝোতা কর তা হলে আজই তোমাকে সামরিক কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হবে। আমরা সবাই জানি যে, কারাগারে থাকার মত ব্যক্তি তুমি নও। আমরা তোমাকে কেবল কারাগার থেকে মুক্তি দেয়ার কথাই বলছিনা বরং তোমাকে হেকমত আবু

জায়েদের জায়গায় সমাজ কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রী পদে বরণ করার নিশ্চয়তাও দিচ্ছি।"

ওর কথা শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম–

"তা আপনারা হেকমত আবু জায়েদকে মন্ত্রী বানানোর আগে বুঝি খুব চাবুক লাগিয়েছিলেন, এবং হিংস্র কুকুরদের মধ্যে ছেড়ে রেখেছিলেন?"

ঃ তা হবে কেন? তা হবে কেন? সত্যি বলছি, তুমি এখানে কারাভোগ করছ, দুঃখ পাচ্ছ; আসলে আমরা তা চাইনি।

ঃ তা হলে আপনারা আমার কাছে কি চান? –আমি জিজ্ঞেস করি। সে বলল–

"দেখ, ইখওয়ানুল মুসলিমুনের প্রত্যেকেই তোমার উপর অভিযোগ আরোপ করেছে....। হুজায়বী সাহেবও এ ব্যাপারে সবিস্তারে সব জানিয়েছেন। আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইল এবং সাইয়েদ কুতুবও সব ব্যাখ্যা করে বলে জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, ওরা সবাই নিজেদের মুক্তি এবং তোমাকে জব্দ করার জন্যেই ওসব বলেছেন। এজন্যে আমি প্রেসিডেন্ট নাসেরের নির্দেশে তোমার সাথে সমঝোতায় আসার জন্যে নিজেই হাজির হয়েছি। তুমি সমঝোতায় এলে এক্ষণি তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে এবং আমি নিজেই আপন গাড়ীতে করে তোমাকে তোমার বাড়ী পৌছিয়ে দেব। তোমাকে প্রসঙ্গত এটা বলে দেয়া প্রয়োজন যে, ইখওয়ানদের দেয়া বিবৃতিতে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা গদী দখলের চেষ্টায় ছিল এবং তুমি প্রেসিডেন্ট নাসের ও তাঁর চারজন মন্ত্রীকে হত্যা করার স্কীম তৈরী করেছিলে। এ ব্যাপারে আমরা তোমার বিবৃতি জনাব হুজায়বী এবং সাইয়েদ কুতুবের ভুমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। আর যে চারজন মন্ত্রীকে হত্যা করার স্কীম নেয়া হয়, তারাই বা কারা? অনুগ্রহ করে বিস্তারিত বিবৃতি দান করো।"

আমি মুহূর্তে বিলম্ব না করে বললাম–

প্রথম কথা হচ্ছে, ইখওয়ানুল মুসলিমুন কখনো গদী দখলের কিম্বা তথাকথিত চারজন মন্ত্রীকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার কোন স্কীম তৈরী করেনি। আসল ব্যাপার ছিল ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন, মুসলমানদের দারিদ্র ও অধঃপতনের কারণ নির্ণয় এবং সামগ্রিক অবস্থার বাস্তব ভিত্তিক পর্যালোচনাই ছিল ইখওয়ানের কাজ এবং এ ব্যাপারে ইখওয়ান সাফল্য অর্জন করে।

ভদ্রলোক আমার কথায় বাধা দিয়ে বলল–

"জয়নব; ওরা সব কিছুই বলে দিয়েছে।"

আমি বললাম–

ঃ বলেছে বৈ-কি! জল্লাদরা তাঁদেরকে যা বলার জন্যে বাধ্য করেছে তা তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়তো বলে থাকবেন। যা হয়নি, তা হয়েছে বলে স্বীকার করার জন্য জোর-জুলুম চালিয়ে বাধ্য করা হচ্ছে। কিন্তু এ ধরনের জবরদস্তি স্বীকারোক্তির কোন মানে হয় না। অথচ আসল কথা হচ্ছে, আমরা নিছক ইসলামের শিক্ষাই প্রচার করছিলাম এবং নবীন বংশধরদের এমন প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলাম, যাতে তারা যথার্থ ভাবে ইসলামকে বুঝতে ও বাস্তবায়ন করতে পারে। আপনাদের দৃষ্টিতে যদি এটা অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে ন্যায় বিচারের জন্যে আল্লাহ্‌র দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই।"

প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি এবার খোদার শপথ করে সহানুভূতির ভঙ্গিতে বলল–

"আমি তোমার কল্যাণ কামনা করি। তোমাকে মুক্ত করানোর জন্যেই আমি এসেছিলাম।"

"আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম–

"দেখুন, পদস্থ সরকারী অফিসার অথবা মন্ত্রীত্ব লাভের বাসনা আমার মনে কোন দিনই জাগেনি। আমি আমার সারা জীবন দ্বীন-ইসলামের সেবায় কাটিয়ে দিয়েছি। বড় লোক বড়নেতা বা মন্ত্রীত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহও আমার নেই। আমার প্রথম এবং শেষ কাজ হচ্ছে শুধু ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করা।"

এরপর কক্ষ থেকে বেরুতে প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি আক্ষেপ করে বলল–

"তোমার সেবায় এসেছিলাম তোমাকে মুক্ত করানোর জন্যেই– কিন্তু তুমি তা অস্বীকার করছ, প্রত্যাখ্যান করছ।"

প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি চলে যাওয়ার ঘন্টাখানেক পর রিয়াজ এবং সাফওয়াত আমার কাছে আসে। এর আগে রিয়াজ বেশ কয়েকবার আমাকে শাশিয়ে দিয়ে বলেছিল, আমি যদি তাদের কথা মত বিবৃতি না দেই তাহলে আমাকে খুন করা হবে।

এর পরপরই সেই তিন দিন আগের মত আমাকে বেদম প্রহার করা হয়। আমার সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত করে ওরা আবার আমাকে সেলে বন্ধ করে চলে যায়।

আমার সেলে অনেক চেহারা

সেলে দ্বিতীয় দিন বিকেলে আসরের নামাজের সময় কিছু পরিচিত কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজে। আমি কোন রকমে উঠে দরজার কাছে গিয়ে প্রহরীর জন্যে নির্দিষ্ট সেই ছিদ্রপথে বাইরের অবস্থা দেখার প্রয়াস পাই। কিন্তু ছিদ্রের কেবল সামনেই হামজা, সাফওয়াত এবং তার সাথীরা দাঁড়িয়েছিল বলে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আমি কিন্তু অপেক্ষা করতে থাকি। কিছুক্ষণ পর ওরা একটু এদিক-সেদিক হলে আমার সামনে মুহতারেমা আলীয়া হুজায়বী এবং গা'দা আম্মারের দীপ্তিময় প্রশান্ত চেহারা মওজুদ ছিল। আমি জল্লাদদের শ্যেন দৃষ্টি থেকে নিজেকে যথাসম্ভব লুকিয়ে রেখে ওদের পাক-পবিত্র চেহারা দেখে যাচ্ছিলাম। ওদের এত কাছে দেখতে পেয়ে আমি আমার ব্যথা-যন্ত্রণা পর্যন্ত ভুলে যাই। অথচ দাঁড়িয়ে থাকা তো দূরের কথা, শুয়ে বসেও আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। কিন্তু এখন কোন অজানা যাদুর স্পর্শে যেন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি.....। আমি তাদের দেখছি আর দোয়া করছি, হে পাক পরওয়ারদেগার! আমার এসব বোন এবং মেয়েদেরকে জালিমের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে রক্ষা কর। আমি ভাবছিলাম- আলীয়া শিগগিরই মা হতে যাচ্ছে এবং গা'দা আম্মার তো বলতে গেলে এখনো দুধ খাওয়া মেয়ে। কিন্তু সত্যের দুশমনরা এমন মাসুম বালিকাকেও গ্রেফতার করতে ইতস্ততঃ করেনি। কি নিষ্ঠুর এসব জালিম! শাসন ক্ষমতায় মদমত্ত এসব নির্দয় কাফুরুষরা অসহায় নিরীহ বালিকা ও মহিলাদের উপর এই জঘণ্য নির্যাতন চালিয়ে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে কোন বীরত্বের প্রতিযোগিতায় নেমেছে জানিনে। বস্তুতঃ স্বঘোষিত এসব স্বৈরাচারী শাসকরা যখন তাদের আসল পাশবিক চেহারায় ধরা দেয় তখন দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং নিকৃষ্টতম মানসিকতা প্রকাশ করতেও তারা দ্বিধা বোধ করে না। এদের বিবেক এবং সুবুদ্ধি বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন এরা দেশের সাধারণ নাগরিকদের কাছে এক অভিশাপের মত ছেয়ে যায়। এদের জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠে দেশের শান্তিকামী মানুষ। নাসের এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা ছিল ঠিক এরকমেরই অভিশপ্ত শাসক।

"হে অত্যাচারী নাসের, তুই ধ্বংস হ' –খোদার কাছে তোর মৃত্যু কামনা করি– জাতিকে প্রতারিত করে কি-ই না ভয়ানক অবস্থার মধ্যে টেনে এনেছিস তুই–! আবেগের আতিশয্যে আমি ঢলে পড়ি।

একটু পরেই আমার কক্ষের দরজা খুলে সেই কৃষ্ণকায় প্রহরী একখানা চাদর ও একটি বালিশ ভেতরে রেখে যায়। আমি বিস্মিত হলাম! গত আঠার দিন ধরে আমি মাটিতে পড়ে আছি-- আজ হঠাৎ এই দয়া কেন?

এরপর প্রহরী এসে আরো দু'খানা চাদর এবং দুটি বালিশ রেখে যায়। এর কিছুক্ষণ পরে আলীয়া হুজায়বী এবং গা'দা আম্মারকে নিয়ে সাফওয়াত এবং হামজা বিসিউনি প্রবেশ করে। ওঁদের দু'জনকে ভেতরে ছেড়ে তারা দরজা বন্ধ করে ফিরে যায়।

আলীয়া কক্ষে প্রবেশ করা মাত্রই আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আমি তখন আমার নিজের অবস্থা এবং সারা দুনিয়ার কথা ভুলে গিয়ে অত্যন্ত ভরাক্রান্ত মুখে কেবল জিজ্ঞেস করছিলাম-

ঃ আলীয়া....আমার আলীয়া....! তুমি সুস্থ আছতো?

এরপর গা'দা আম্মারের দিকে চেয়ে দেখি তার দু'চোখের তপ্ত অশ্রুধারায় নীচে ঊষর মাটি সিক্ত হয়ে উঠেছে। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম-

ঃ গা'দা আমার মেয়ে! আমাকে চিনতে পারছিস্‌নে? সে বলল-

ঃ না, ...না হে আলহাজ্জা! তুমি একেবারে বদলে গেছ মা। তোমার শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। আর তোমার চেহারা দেখে তোমার ভাই সা'দ উদ্দিনের কথা মনে পড়ছে..... আমি তাকে সান্তনা দিয়ে বললাম-

ঃ আমরা যে অবস্থায় আছি, তাতে তো এমন হওয়াই স্বাভাবিক। এক ভয়ঙ্কর পরিবেশে শ্বাস নিচ্ছি আমরা। তাছাড়া জানিস, আমি রাতদিনের চব্বিশ ঘন্টায় খাদ্য হিসেবে পাই শুধু এক চামচ সালাদ। তাও একজন সিপাহী লুকিয়ে দিয়ে যায়। ধরা পড়লে তার আর রক্ষে নেই।

এরপর চাদর আর বালিশ বিছানা পেতে দিয়ে ওরা আমাকে দারসে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তারা ভেবেছিল অন্ততঃ কুরআন শরীফ রাখা ও পড়ার সুযোগ আমার ছিল। তারা জানতো না যে, আমি যাদের কাছে আছি, তারা কুরআন এবং মানবতার দুশমন আমি যখন সব ঘটনা খুলে বললাম তখন ক্ষোভে-দুঃখে আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়ে তারা। একটু পরে আলীয়া এবং গা'দা আম্মার তাদের নিজ নিজ কুরআন শরীফ আমার কাছে পেশ করলো। এতদিন পর চোখের সামনে পবিত্র কুরআন দেখে আমার দু'চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দেয়।

একটু পরে আমি যখন ব্যথা লাঘবের উদ্দেশ্যে আমার আহত পা বিছিয়ে দেই, তাতে হান্টারের দগদগে ঘা দেখে আঁৎকে উঠে তারা। তাদের উভয়ের চোখের অশ্রু ছলছল করছিল। আমি পবিত্র কুরআনে আস্হাবুল উখদুদ' সংক্রান্ত আয়াত পড়ে শুনাই। গা'দা আম্মার নীরবে কাঁদতে থাকে আর আলীয়া বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে স্বাগত প্রশ্ন করে।

ঃ মহিলাদের সাথেও এমন নির্মম-নিষ্ঠুর ব্যবহার কিভাবে সম্ভব হলো? কোন বন্য নৃশংসতার নির্দশন এসব.....।

কিন্তু আলীয়া হয়তো কল্পনা করতে পারেনি যে, ইসলাম ও মানবতার দুশমন জামাল নাসেররা আল্লাহ্র ও তাঁর রাসূলের শত্রুতায় এর চেয়েও নীচে নামতে পারে।

রাফাত মুস্তফা নুহাসের ইন্তেকাল

আলীয়া আলোচনার ধারা পাল্টিয়ে আমাকে বাইরের জগত সম্পর্কে অবহিত করতে শুরু করে। প্রথমে সে আমাকে মুস্তফা নুহাসের মৃত্যু-সংবাদ জানায়।

"হে রাহমানুর রাহীম! তুমি কারো মুখাপেক্ষী নও, সবাই তোমার রহমতের– তোমার দয়ার মুখাপেক্ষী। তুমি তার উপর দয়া কর।"আলীয়া আমাকে জানায় যে, আমার গ্রেফতারীর দু'তিন দিন পরই তার ইন্তেকাল হয়। হাজার হাজার লোক তাঁর জানাজায় অংশ গ্রহণ করে। এসময় লোকেরা সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জনসাধারণ তার লাশ নিয়ে মসজিদে হোসাইন পর্যন্ত মিছিল বের করে। শ্লোগানে-শ্লোগানে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠছিল। সরকার এই বিক্ষুব্ধ জনস্রোতের সামনে বেসামাল হয়ে পড়ে মোটকথা; মুস্তফা নুহাসের জানাজার সামাবেশে জনসাধারণ সরকারের জুলুম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার সুযোগ গ্রহণ করে। ....এ সম্পর্কে দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কে ও আলীয়া আমাকে সবিস্তারে জানায়।

মুস্তফা নুহাসের মৃত্যুতে লোক প্রকাশ্যভাবে সরকারের সমালোচনা শুরু করে। তারা এও বলে যে, নুহাসের পর আর কোন নেতা নেই। দেশবাসী তাদের মতামত প্রকাশ করতে থাকে। তাদের মনের পুঞ্জিভূত ব্যথার বিস্ফোরণ ঘটেছে মিছিলে দেয়া সোচ্চার শ্লোগানে। তাদের শ্লোগান ছিল "মিথ্যাশাহী মুর্দাবাদ; দিকে দিকে শুনেছি আজ নাসের হলো ধোকাবাজ"

"খুলে ফেল, খুলে ফেল, মুখোস তাদের খুলে ফেল" নাসের শাহী জালেমশাহী ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি মুস্তফা নুহাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বললাম–

ঃ হে জনগণের বন্ধু! তুমি যে সব ধোকাবাজ মোনাফেকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলে, তারা ক্ষমতা পেয়ে অন্যায়-দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। আর তুমি তাদের সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছ। বর্তমান সরকার টিকে আছে প্রচার প্রপাগান্ডা আর তাদের খরিদা লেখক এবং লাঠিয়ালদের জোরে। .....এসব কাঠের সিংহও একদিন জ্বলে পুড়ে ছাইয়ের গাদায় পরিণত হবে.....।

আলীয়া আরো জানায়ঃ জানাজায় শরীক হবার জন্যে আগতদের মধ্যে বিশ হাজার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। জনসাধারণ এর বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। বস্তুতঃ মুস্তফা নুহাসের জানাজায় জনসাধারণের সুপ্ত ক্রোধ ফেটে পড়ে। তারা উদাত্ত কণ্ঠে সত্যের পক্ষে তাদের সমর্থন ঘোষণা করে। আলোচনার মাধ্যমে মুস্তফা নুহাসের স্মৃতি-কথা মনে পড়লো। বড্ড সাদাসিধে এবং নিরহংকার লোক ছিলেন তিনি। একান্ত শত্রুদের বিরুদ্ধেও তিনি মনে কোন বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। আর নিজের ভুলকে প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করার মতো সৎসাহস তাঁর ছিল। সকল অর্থেই তিনি ছিলেন মিশরের জাতীয় নেতা।

এরপর আমি আমার ভাই সাইফ আল গাজ্জালীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা তা আলীয়াকে জিজ্ঞেসা করি। আলীয়া এর জবাবে হ্যাঁ অথবা না কিছুই না বলে আমার কাঁধে হাত রেখে ইতস্ততঃ করে বলল–

ঃ হে আলহাজ্জা! সব কিছুর জন্যে সময় নির্ধারিত রয়েছে। এতে করে বুঝতে পারলাম, আমার ভাই সম্পর্কে আমি যে শংকায় ছিলাম, তাই ঘটেছে।

আলীয়া জানালো যে, আমার ভাইয়ের জানাজায় লোকদের অংশ গ্রহণ না করতে দেয়ার জন্যে সরকারের তথ্য বিভাগ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে সমাগম হয়, তা ছিল ধারণাতীত। আলীয়ার ভাষ্য মোতাবেক, জনগণ যাদেরকে তাদের ভাগ্যবিধাতা বলে মনে করতো, এখন তাদের মুখোস খুলে পড়েছে। জনগণকে আর বেশী দিন বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না।

সরকার ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তৎপরতার বিনিময়ে বিবেকহীন স্বার্থ সন্ধানী লোকদের মন্ত্রীত্বের আসন বন্টন করছে। জাতির বিবেক ক্রয়েরও চেষ্টা চলছে। এভাবে নাসের সরকার যা করে চলছে তা দেশ ও জাতির জন্যে যে তিক্ত পরিণাম বয়ে আনবে, তা ভাবতেও ভয় লাগে।

আলীয়ার পর্যালোচনা শুনে আমি গা'দা আম্মারের দিকে চেয়ে তার স্বামী ছেলে-মেয়ে এবং মা-বাবার কুশল জিজ্ঞাসা করলাম। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল–

"তার স্বামী সরকারী অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সুদান পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। মা খুবই অসুস্থ, বাচ্চা দু'টো সাথে না থাকলে সে হয়তো জীবন সম্পর্কেই বিতৃষ্ণ হয়ে যেতো।

আমি তাকে শান্ত্বনা দিলাম এবং প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্যে আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করলাম।

এরপর আমি জিয়া তুহীর বিয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তারা জানালো, তাদেরকে বিয়ের মাহ্ফিল থেকে বিয়ের পোষাক পরিহিত অবস্থাতেই গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। দুলহা-দুলহান উভয়ই এখন কারাগারে বন্দী। এ ছাড়া তার বোন মলি এবং তার ডাক্তার ভাইকেও জেলে আটক করা হয়েছে।"

এমনি নির্বিচার গ্রেফতারী, বিশেষ করে নিরীহ মেয়েদের গ্রেফতারীতে আমি ভীষণভাবে মর্মাহত হই।

ঃ কেন, ইখওয়ানের ভাইবোন বা আত্মীয়-স্বজন হওয়াও কি অপরাধ যে, সবাইকে নাহক জেলে ভরা হচ্ছে? আমার প্রশ্নের জবাবে আলীয়া বলল–

ঃ তাতো বটেই; এ ছাড়া সরকার কাউকে নামাজ পড়তে দেখলেও গ্রেফতার করে নিচ্ছে।

এভাবে কত নিরীহ লোককে যে গ্রেফতার করা হয়েছে, গা'দা তার বিবরণ পেশ করে। যাদেরকেই মুসলমান মনে হয়েছে, তাদের ঘরবাড়ী তল্লাসী করা হয়েছে এবং নিছক সন্দেহের বসে অসংখ্য লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসব শুনে আমি মন্তব্য করলাম–

"আমার মনে হয়, মোঙ্গল তাততারী দস্যুরাও এমন জঘন্যতার পরিচয় দেয়নি, যা জামাল নাসের করে বেড়াচ্ছে। মিশরে ইসলামী বিপ্লবের আগে রোমানরাও কোনদিন এমন নির্যাতন চালায়নি। বস্তুত জামাল আবদুন নাসের মানবেতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য অপধীদেরকেও অপরাধের ক্ষেত্রে হার মানিয়েছে। নাসেরের মত এমন বিবেকহীন অন্ধ পাপিষ্ঠ দুনিয়াতে আর জন্মেছে কিনা সন্দেহ। ইসলাম, সত্য ও ন্যায়ের নাম শুনে সে জ্বলে উঠতো। তার মত নীচ-হীন ব্যক্তির পক্ষে মহিলাদের গ্রেফতার করে তাদের উপর হান্টার চালানো মোটেই আশ্চর্যের কথা নয়। নিরীহ লোকদের হয়রানী করা, মহিলাদের বিধবা করা; খুন করা, এমনকি

মানুষকে জীবন্ত দাফন করে দেয়া কেবল নাসেরের মত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। রাজনৈতিক বিরোধীদের জান, মাল, ইজ্জত এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের জীবন নিয়ে চিনিমিনি খেলা ছিল তার সবচেয়ে প্রিয় অভ্যাস। অত্যন্ত তিক্ত হলেও এই হচ্ছে সত্য কথা।"

এসব তিক্ত ও উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনার পর আলীয়া আমার পায়ের ক্ষত পরিস্কার এবং তাতে পট্টি বাঁধার দিকে মনোযোগ দেয়। সে আশংকা করে বলল–

ঃ এবার মনে হয় আমাদেরকে হান্টারের শিকারে পরিণত হতে হবে, আমি বললাম–

"আল্লাহ্ সবাইকে জালিমের অত্যাচার থেকে নিরাপদ রাখুন।"

গা'দা পট্টি তালাশ করতে করতে জিজ্ঞেস করলো–

"আপনার কাপড়ের থলে কোথায় আলহাজ্বা।" আমি অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও স্মিত হেসে বললাম–

"গত আঠার দিন থেকে এই রক্তাক্ত পোষাকেই আছি মা।" সে আমার পরণের রক্তাক্ত ছিন্ন বসনের দিকে তাকিয়ে হু-হু করে কেঁদে উঠলো। এরপর ওরা আমার পোষাক পরিবর্তনের জন্য যখন আমার জামা উঠালো তখন গায়ে হান্টারের অসংখ্য আঘাত দেখে উভয়েই চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। কোন মহিলার সাথে এমন নির্দয় নিষ্ঠুরতার কথা তারা ভাবতেই পারেনি।

আমি তাদের অনুভূতিকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর প্রশংসা এবং ইসলামের পথে ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে শুরু করি। আমি বললাম–

ঃ দেখ, কোন পার্থিব স্বার্থের জন্যে নয়, বরং আল্লাহর পথে এগিয়ে চলেছি বলেই দুনিয়ার এই শাস্তি এতে দুঃখের কি আছে? ····আল্লাহর শোকর যে তিনি আমাদেরকে ইসলাম তাওহীদ ও রিসালাত দান করেছেন এবং কালেমায়ে তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছেন। আলীয়া কথার প্রসংগ ঘুরিয়ে বলল–

জানেন মুহতারেমা, খালেদা হুজায়বী বলেছেন, বোন জয়নব যদি আমার সাথে থাকে, তাহলে জেলের কোন দুঃখকেই আমি পরওয়া করব না।"

একথা শুনে আনন্দিত হলাম আমি। কিন্তু খালেদা যদি এখন আমার এই ক্ষত-বিক্ষত শোণিত সিক্ত শরীর দেখতে পেতো তাহলে জানিনে তার সেই ভাবনা থাকতো কিনা। আমি আল্লাহর দরবারে সব মুসলমান ভাই-বোনকে জালিমের অত্যাচার থেকে নিরাপদ রাখার মোনাজাত করি।

খাদ্য গ্রহণ ইবাদত তুল্য

এরই মধ্যে হঠাৎ দরজা খোলা হয় বলে আমাদের আলাপ বন্ধ হয়ে যায়। কৃষ্ণকায় সেই শয়তান প্রহরী এক হাতে তিনখানা রুটি এবং অপর হাতে সিদ্ধ সেমাইয়ের প্লেট রেখে ফিরে যায়। প্রহরী চলে গেলে আলীয়া দরজা বন্ধ করে দেয়। আমি এ ধরণের খাবারের বাসী গন্ধ সহ্য করতে অক্ষম; এদিকে ক্ষিধেতে প্রাণও ওষ্ঠাগত প্রায়। আলীয়া আমার ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। সে খাবার আমার নিকটে করে বলল–

ঃ নিন আলহাজ্বা! খাবার দেখছি মোটামুটি ভালই আছে। এই বলে সে তিনখানা রুটি আমাদের তিন জনের মধ্যে বন্টন করে দেয়। আমরা তিনজনেই একান্ত অনন্যপায় হয়ে এসব খেতে বাধ্য হচ্ছিলাম। আলীয়া খেতে খেতে বলল–

ঃ অনন্তঃ অনাগত অতিথির স্বার্থে কিছু না কিছু খেতে বাধ্য। সম্ভাব্য সন্তানের প্রতিই ছিল তার ইঙ্গিত। কিন্তু আমাকে খাওয়া বন্ধ করে দিতে দেখে সেও তাই করলো। গা'দাও খাবার ছেড়ে দিল। এবার আলীয়া আমাকে সম্বোধন করে বলল–

"দেখুন আলহাজ্বা! আপনি না খেয়ে না খেয়ে এতটুকু হয়ে গেছেন। এ অবস্থায় তো খাদ্য গ্রহণ করা ইবাদাতেরই সমতুল্য। যদি এভাবে অনশন চালাতে থাকেন তাহলে এর পরিণাম সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন কি? জালিমরা তো জয়নব আল-গাজালী যে কোনভাবে মরতে দেখলে খুশী হবে। আসলে এটাই তারা চায়।" আমি তাকে বললাম–

"কোন রকমে বেঁচে থাকার জন্যে তো আমি কিছু কিছু খাচ্ছিই। এক চামচ সালাতের উপরেই তো আল্লাহ্ আমাকে বেঁচে থাকার শক্তি দিচ্ছেন।" কিন্তু তারা বারবার খাবার প্রতি জোর দিলে শেষ পর্যন্ত খেতে রাজী হই। কিন্তু কত কষ্টে যে সে খাবার খেয়েছি তা কেবল আল্লাহ্ই জানেন।

দ্বিতীয় দিন সকালে, আলীয়া ও গা'দা আম্মারের উপস্থিতিতে আমি দরজার ছিদ্রপথে মুর্শিদে 'আম' জনাব হুজায়বীর সাথে রোজকার মত সাক্ষাৎ করি। আলীয়া এবং গা'দাকেও আমি সে সুযোগ করে দিই। মুর্শিদে 'আমের' সাথে সাক্ষাৎ করে অপূর্ব এক প্রশান্তি অনুভব করি। আলীয়াও তার বাবাকে নিয়মিত দেখতে পেত। বলাবাহুল্য, আলীয়া মুর্শিদে 'আম' হুজায়বীর মেয়ে। আমাদের কক্ষের সামনের পথে গোসলখানায় আসা যাওয়ার পথে তারা মুর্শিদে 'আমকে' দেখে নিতো।

গা'দা আম্মার তার নিজের গ্রেফতারীর ঘটনা, হামীদা কুতুবের সাথে তার সাক্ষাৎ এবং পুরো কুতুব পরিবারের গ্রেফতারীর ঘটনাবলী একে একে বলে যায়। এতে করে অনেক নতুন তথ্য অর্জন করি। সময় কাটছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে। আমরা অস্বস্তি থেকে বাঁচার জন্যে জামায়াতে নামাজ আদায় এবং দারসে কুরআনের আয়োজন করি।

দুর্যোগের রাত

এশার নামাজের পর জল্লাদ সাফওয়াত রুবী একজন সিপাহীকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। তারা আমাকে অফিসে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, একই অফিসে এর আগে আমি আরো দু'বার ঘুরে এসেছি।

অফিসকক্ষে এক ব্যক্তি আগে থেকেই বসেছিল। আমি তাকে সালাম জানালাম। কিন্তু সে সালামের জবাব না দিয়ে অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো–

"তুমিই কি জয়নব আল-গাজালী?"

"জী হাঁ।" আমি জবাব দিলাম। সে আমাকে সামনের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে বলল–

"আচ্ছা, তাহলে তুমিই হচ্ছ জয়নব গাজালী·····! বলতো, তুমি স্বেচ্ছায় এমন ভয়ঙ্কর স্থান বেছে নিয়েছ কেন····কেন এসব দুঃখ কষ্ট সহ্য করছ কেবল ইখওয়ানুল মুসলিমুনের জন্যেই? ····ওরা তো সবাই মুক্তির জন্যে ছটফট করছে এবং প্রত্যেকেই সব দোষ তোমার উপর চাপাচ্ছে। ·····আর এদিকে তুমি আমাদেরকে মুশকিলে ফেলে রেখেছ। আমি কিন্তু তোমাকে মুক্ত করানোর এবং কয়েকটি ব্যাপারে তোমার সাথে আপোষ মীমাংসায় আসার প্রতিজ্ঞা করে এসেছি। এরপর তুমি তোমার বাড়ী চলে যাবে। শুধু তাই নয়। তুমি যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ কর তাহলে আমি প্রেসিডেন্ট নাসেরের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, অবিলম্বে ইসলামী মহিলা সংস্থার সদর দপ্তর তোমাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। ····তোমার পত্রিকার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হবে এবং পত্রিকার জন্যে মাসিক দু'হাজার মিশরীয় পাউন্ড সাহায্য দেয়া হবে। তুমি যদি সমঝোতায় আস তাহলে তোমার সংস্থাকে আরো সম্প্রসারিত করার জন্যে সাহায্য দেয়া হবে। তুমি যদি সমঝোতার জন্যে এক্ষুণি হাঁ বলে দাও, তাহলে আমি তোমার যাবতীয় পোষাক পরিচ্ছদ আনিয়ে দিচ্ছি এবং এক ঘন্টার মধ্যেই প্রেসিডেন্টের

সাথে বৈঠকে বসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সত্যিই ইখওয়ানরা তোমাকে খুব প্রতারিত করেছে। আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করুন। তুমিও আমাদেরকে ভীষণ বিপদে ফেলে রেখেছ, যাই হোক, আমাদের প্রেসিডেন্ট খুবই উদারমনা লোক।"

সে এক তরফা বলেই যাচ্ছিল আর আমি চুপচাপ শুনছিলাম। আমাকে আগাগোড়া নীরব থাকতে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো–

ঃ "কি ব্যাপার তুমি কিছু বলছ না যে! দেখ জয়নব, তুমি আমার কথা বুঝবার চেষ্টা কর। আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি প্রেসিডেন্ট আবু জায়েদকে বরখাস্ত করে তোমাকে তার স্থলে মন্ত্রী নিয়োগ করবেন। আমরা তোমার সহযোগিতা কামনা করি। দয়া করে তুমি তোমার মনকে বড় কর এবং সত্যি সত্যি সব কথা বলে দাও। কাজে কর্মে তুমি দেখে নেবে যে, আমি তোমার ভাই এবং শুভাকাঙ্খীই প্রমাণিত হবো। তুমি জান, কারাগারের বাইরে কত লোক তোমাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। তোমার জন্যে ওরা যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত। তারা তোমাকে ভালবাসে, ভক্তি করে, তোমার জন্য তারা সব কিছুই করবে।"

এবার আমি শান্ত স্বরে বললাম–

ঃ মন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণ তো দূরের কথা, সে সম্পর্কে কোন ভাবনাকেও স্থান দিতে আমি রাজী নই। আর ইসলামী মহিলা সংস্থা এবং পত্রিকা সম্পর্কে এতটুকুই বলবো যে, আমি ওসবকে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করে রেখেছি। তাছাড়া, মুসলমানদের জন্যে কোন সংস্থা বা পত্রিকার অনুসরণ জরুরী নয় বরং "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র ঝান্ডাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করাই প্রত্যেকের জন্য ফরজ।" সে মাঝখানে প্রশ্ন করলো–

ঃ তাহলে জয়নব, তুমি ইখওয়ানুল মুসলিমুন পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলে কেন?" আমি বললাম–

"আসলে আমার কাজের ধরণটাই আলাদা। যেমন, আমি মনে করি ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী মহিলা সংস্থা কখনও ভেঙ্গে যায়নি। অথচ জামাল নাসের মনে করেছে সংস্থার সব সম্পত্তি এবং সদর দপ্তর দখল করে সংস্থাকে কার্যকরী ভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। এটা তার ভুল ধারণা। বস্তুতঃ আমাদের সাফল্য বা ব্যর্থতা আল্লাহ্‌র মর্জির উপরই নির্ভরশীল। আর তুমি তো শুনেই থাকবে সে প্রবাদ বাক্য-রাখে খোদা মারে কে? এভাবে ইখওয়ান বা মুসলিম মহিলা সংগঠন ভাঙ্গেনি। আল্লাহ্‌র দ্বীনের কাজে তার নিজ পথে স্বাভাবিক ভাবেই অব্যাহত রয়েছে। সত্য সদা টিকে থাকবে। জামাল

নাসেরদের সরকার এবং ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু আল্লাহ্র দ্বীন, আল্লাহ্র শাসন চিরস্থায়ী। আমরা তো আমাদের পথে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করব। কিন্তু সরকার তার অবৈধ কার্যকলাপের জন্যে শিগগীরই তিক্ত পরিণামের সম্মুখীন হবে।"

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর এর খেদমতে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের গতিরোধ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় এবং এরই মধ্যে আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে। আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাকে সত্যের স্বপক্ষে এবং মিথ্যের বিপক্ষে রাখেন এবং সত্যপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। ন্যায় ও সত্যের পক্ষে এবং বাতিল ও মিথ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তারা হচ্ছে রাসূলের যথার্থ প্রতিনিধি। আর এরাই ইসলামের নবীন কর্ণধার। তোমাদের জানা উচিৎ যে, হাসানুল বান্না বিনা চিন্তা ভাবনাতেই ইখওয়ানের ভিত্তি স্থাপন করেননি। বরং তিনি এর মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠা তথা আল্লাহ্র শাসন কায়েম করার জন্যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তাছাড়া এমন এক মহান আন্দোলনের উপর বিধিনিষেধ আরোপের ক্ষমতা জামাল নাসেরকে কে দিয়েছে?"

এ-ই বলে আমি চুপ করলাম। সে বলল–

ঃ সত্যিই তুমি চমৎকার বক্তৃতা করতে পার। কিন্তু এখন আমি তোমার কাছে এজন্য আসিনি যে, তুমি আমাকে ইখওয়ান সম্পর্কে বক্তৃতা শোনাবে। আমি তোমার কাছে ইখওয়ান হতে আসিনি, বরং এসেছি তোমাকে কারাগারের আযাব থেকে মুক্ত করানোর জন্যে একটা পরস্পরিক সমঝোতায় পৌছানোর চেষ্টা চালাতে। সব ইখওয়ান তোমাকে দোষী করছে। আবুদল ফাত্তাহ ইসমাইল বলছে, তুমিই তাকে উস্কিয়ে সশস্ত্র করেছ; হুজায়বী সাহেবও নিজেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সব দোষ তোমার কাঁধে চাপিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তুমিই নতুন সংগঠনের বুনিয়াদ স্থাপন করেছ। সাইয়েদ কুতুবও তোমার উপর দোষ চাপিয়ে রেহাই পেয়েছেন। তা তুমি কি সুস্থ আছ, না পাগল হয়ে গেছ? জামাল নাসের স্বয়ং তোমাকে বাঁচাতে চাচ্ছেন। আজ সারা দেশ জামাল নাসেরের হাতের মুঠোয়। জামাল নাসের তোমার অতীতকে ক্ষমা করে সম্পর্কের নতুন অধ্যায় রচনা করতে আগ্রহী। তিনি ভাল করেই জানেন যে, তুমিই কত বড় বাগ্মী এবং জনসাধারণ তোমাকে কতো বেশী ভালবাসে।.....জয়নব, এখন লাভ-ক্ষতির চাবিকাঠি তোমারই হাতে। –বলতো আজকের মিশরে এমন কোন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে কি, যার

সাথে জামাল নাসের নিজেই ঘনিষ্ঠ হতে চায় আর সে ব্যক্তি তাতে অস্বীকৃতি জানায়। আমার তো মনে হয়, তুমি সত্যিই পাগল হয়ে গেছ। -আমি তোমার কল্যাণকামী বলে এ সব কথা খোলাখুলি বলছি। মুক্তি পেয়ে তুমি সারা জীবন এতীম বিধবাদের সেবা এবং অন্যান্য সৎকর্মে লাগতে পারবে। -বুদ্ধির সাহায্যে কাজ কর জয়নব। নিজের পরিবারবর্গের মর্যাদার কথা খেয়াল রেখ এবং আমার প্রস্তাবে সায় দাও-"

অবশেষে আমি তাকে বললাম-

তোমার সব কথা কি শেষ হয়েছে?" সে বলল-

দেখ, আমাকে শুধু এতটুকু কথা বলে দাও যে, ইখওয়ানের কারা কারা তোমার বাড়ীতে যাতায়াত করতো এবং কিভাবে তারা নাসেরকে হত্যা করতে চেয়েছিল? আর হ্যাঁ, প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার জন্যে তুমি হুজায়বী থেকে নির্দেশ কবে নিয়েছিলে? সাইয়েদ কুতুবের অভিমতও আমি জানতে চাই। কিভাবে পরিকল্পনা তৈরী হয় এবং তার বিস্তারিত বিবরণও জানতে চাই। আমি আরেকবার তোমার কাছে জামাল আবুদন নাসেরের মাথায় দিব্যি দিয়ে বলছি যে, আজ রাতেই তোমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং শীঘ্রই তোমাকে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী নিয়োগ করা হবে। এই সুযোগ নষ্ট করো না। আমি তোমার কাছে আমার প্রেসিডেন্টের মর্যাদার শপথ করেছি, অতএব বুদ্ধিমানের মত কাজ কর এবং নিজের স্বার্থে চিন্তা কর। সব ইখওয়ান এখন কেবল নিজের স্বার্থেই চিন্তিত" এরই মধ্যে লম্বা চওড়া এক ব্যক্তি এসে বলল-

কর্ণেল সাহেব। আমরা জয়নবের নয়া মিশরস্থ বাসভবন থেকে সব ক্যাসেট বাজেয়াপ্ত করে এনেছি। আপনার অনুমতি পেলে ওসব শুনানোর ব্যবস্থা করতে পারি।

"কর্নেল এ ব্যাপারে পরে কথা বলবে বলে লোকটিকে বাইরে যেতে বলে। এরপর আমাকে সম্বোধন করে আবার বলতে লাগল-

দেখ জয়নব, আমি জানি যে তোমার স্বামী একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তোমার জন্য আমি তাঁকেও খুব শ্রদ্ধা করি। তাছাড়া তোমার ভাইও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু! ....বিশ্বাস কর, আমি এবং প্রেসিডেন্ট নিজেই তোমার সাথে মৈত্রী সম্পর্ক কায়েমে আগ্রহী....আমি শপথ করে বলছি তোমার সাথে আপোষে আসার পর মুহূর্তে এসব ক্যাসেট আমি নিজ হাতে জালিয়ে দেব। ....ইখওয়ানরা তোমাকে যে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে, আমরা তোমাকে

তা থেকে মুক্ত করতে চাই। খোদার শপথ, আমরাও ভাল মুসলমান। ইসলাম কি? ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে মানুষ তার ভাইয়ের ক্ষতি করবে না।"

আমি তার কথাকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করি-

"তুমি যে খোদাকে সাক্ষ্য মানছ, সে খোদার শপথ করে বলতো তোমাদের অত্যাচারের ফলে তোমাদের ভাইয়েরা এবং অন্যান্য লোকেরা কি ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি?"

সে বিষয় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে বলল-

"সত্যি আমরাও ভাল মানুষ! আমাদের সাথে সমঝোতায় এলে তুমি নিজেই সব দেখতে পাবে যে, আমরা কত ভাল।"

আমি বললাম-

"আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তোমাদেরকে তওবা করার তাওফীক দেন এবং তোমরা সত্যিকার অর্থে মুসলমান হয়ে যাও।"

এরপর সে তার ব্যাগ থেকে কাগজ কলম বের করে জিজ্ঞেস করল-

"জয়নব তুমি এখন আমাকে বলবে কি যে, তোমার কাছে কোন ব্যক্তি যাতায়াত করতো?" আমি বললাম-

ঃ কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম আমার মনে নেই। আসলে লোকদের নাম আমার মনে থাকেনা, আর কারও নাম জিজ্ঞেস করাটা আমার স্বভাব নয়।

ঃ ঠিক আছে, তাহলে আপাততঃ আমরা এ নিয়ে আলাপ করছিনে। চল, হুজায়বী সাহেব এবং সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে আলোচনা করা যাক, সে বলল-

আমি জিজ্ঞেস করলাম-

ঃ এটা আবার কোন ধরনের ব্যাপার? সে বলল জামাল নাসেরকে হত্যা করে সরকার দখল করার প্রচেষ্টা সংক্রান্ত ব্যাপার।

আমি বললাম-

ঃ দেখুন জনাব! আবদুন নাসেরকে হত্যা করা নিতান্তই একটা বাজে কাজ। কোন মুসলমানই এমন বাজে কাজ করার কথা ভাবতে পারে না। আসলে প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে ইসলাম নিয়ে। আমাদের দেশে ইসলাম কায়েম নেই। তাই আমরা ইসলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠা এবং এ উদ্দেশ্যে নবীন বংশধরদের প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। অথচ জামাল নাসের এবং তার লোকেরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছি। সে ইসলামের আলোকে সরকার পরিচালনা করতে অস্বীকার করছে। আর

প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে, ইসলাম নাকি সেকেলে এবং যারা ইসলামের কথা বলে, সে তাদেরকে সাম্প্রদায়িকতা বলে অভিযুক্ত করছে। নাসেরের এসব বাজে কথায় তোমাদের মনে কি কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়না?

একথা শুনে সে বলল–

ঃ তুমি পাগলই বটে। জান, তোমাকে খুন করে যদি এখানে পুঁতে রাখি, তাহলেও কেউ জানতে পারবে না: বরং তুমি এরই উপযুক্ত। আমি যদি তোমাকে এক্ষণি ছেড়ে দেই তাহলে এক ঘন্টার মধ্যেই তোমাকে খুন করে দেয়া হবে।

আমি শান্তভাবে বললাম–

আল্লাহ্ যা চান, তাই করেন·····আমি এই বাক্যটুকু পুরো করার সাথে সাথেই সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে আমাকে গালি দিতে শুরু করল এবং এক সিপাহীকে ইঙ্গিত করে রিয়াজ ইব্রাহীমকে ডেকে পাঠালো। রিয়াজ এলে তাকে বলা হয়–

ঃ এসব টেপ ও ক্যাসেট আদালতে পেশ করার জন্যে রেখে দিও।

·····এ হচ্ছে আস্ত পাগলি। ·····তোমরা এর ব্যাপার নিজেদের কর্তব্য পালন করে যাবে। এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য সা'দকে ডেকে দাও। কয়েক মুহূর্ত পরে সা'দ এসে তাকে স্যালুট করে দাঁড়াল। সে সা'দকে বলল–

ঃ তুমি একে ঠিক করে দাও সা'দ।

ঃ কি পরিমাণ চাবুক মারব, পাশা? সা'দ তাকে জিজ্ঞেস করল।

ঃ পাঁচশো চাবুক। আমি একটু পরেই ফিরে আসছি।

হুকুম পাওয়ার সাথে সাথেই সা'দ চাবুক লাগাতে শুরু করে দেয়। আমার সারা গায়ে চাবুক মেরে সে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন আমাকে সে অর্ধহাতেই দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে ক্ষণিকের জন্যে বাইরে চলে যায়। তারপর আবার নতুন উদ্দীপনায় আমার উপর চাবুক মারতে শুরু করে। এরপর ইখওয়ানের কয়েকজন যুবক কর্মীকে এনে নির্মমভাবে পিটাতে শুরু করে এবং আমাকে বিশ্রী গালি দেয়ার জন্যে তাদের বলতে থাকে। কিন্তু সত্যের সৈনিক ইখওয়ানদের মুখে গালি উচ্চারণ করা যখন সম্ভব হয়নি তখন তাদেরকে আরো বেদম প্রহার করা হয়। এ সব যুবক কর্মীদের মধ্যে মিশরীয় বিমানের পাইলট জিয়া তুয়াইজীও ছিল। তাকে বিয়ের পোষাক পরিহিত অবস্থায় বিয়ের আসর থেকেই গ্রেফতার করে আনা হয়।

এবার হামজার পালা

আমাকে এবং ইখওয়ানের যুবক কর্মীদেরকে খুব মারধোর করার পর আমাকে আবার জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। নির্দিষ্ট সেলের কাছে নিয়ে গিয়ে সা'দ আমাকে এক ঘন্টা পর্যন্ত দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে রাখে। প্রচন্ড শীত পড়ছিল তখন। উন্মুক্ত স্থানে হিমেল বাতাসে আমার সারা শরীর জমে বরফে পরিণত হচ্ছিল যেন। এর উপর চাবুকের ঘায়ে ব্যথার যন্ত্রণা। ক্ষতস্থান থেকে প্রবাহমান রক্ত জমে শক্ত হয়ে যায়। এমন অসহ্য অবস্থায় রিয়াজকে নিয়ে সেখানে হামজা বিসিউবি এলো। রিয়াজ এসেই বলল–

"এই মেয়ে! বুঝে-সুঝে কাজ কর। নিজের মঙ্গল নিজে ভেবে নে। এতে তোরই লাভ……। হামজা পাশা, তুমি একে বুঝাও।" এবার হামজা তার বক্তৃতা শুরু করল–

"জয়নব! জ্ঞানবুদ্ধিকে কাজে লাগাও। বোকামীর পরিচয় দিওনা। অন্যান্য সব ইখওয়ানের মত তুমিও তোমার ভুল স্বীকার করে নিচ্ছনা কেন?

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম–

"কি ভুল করেছি যে, তা স্বীকার করবো? দেখ, আমরা নবীন বংশধরদের মধ্যে তওহীদের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়েছিলাম"

আমার কথা শুনে হামজা সাফওয়াতের দিকে তাকাল। সাফওয়াত ইতিমধ্যেই তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে সাফওয়াতকে বলল–

"আমার জন্যে এবং এর জন্যে দু'খানা চেয়ার আন। এর স্বামী আমার বন্ধু। এ জন্যেই আমি একে বুঝাবার এত কসরৎ করছি।" চেয়ার আনা হলে সে আমাকে বসতে বলল।

কিভাবে আলোচনা শুরু করবে সে ভাবতে লাগল। এবার সে আমার স্বামীর সাথে তার বন্ধুত্বের বানোয়াট কাহিনী এবং সে সুবাদে আমার প্রতি তার সহানুভূতি প্রকাশের চেষ্টা করে। আমি বসতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু চাবুকের আঘাতে শরীরের যা অবস্থা, তাতে বসতেই পারছিলাম না। খুব ব্যথা পাচ্ছিলাম।

হামজা আমাকে আবার বসতে বলল। আমি তাকে বললাম–

"আমার পক্ষে এখন বসা সম্ভব হচ্ছে না। আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে এবং শুনতে দাও।"

সে কথা শুরু করলো এভাবে–

"তুমি নিজের উপর নিজেই জুলুম করেছ। তোমার চেহারা ভেঙ্গে ম্লান হয়ে গেছে। পা দু'টো বন মানুষের পায়ের রূপ ধারণ করেছে। তোমার স্বামী তোমাকে এ অবস্থায় দেখলে কি-ই না দুঃখ পাবেন। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন ষাট বছরের বুড়ী। তোমার স্বামী আমার বন্ধু। তোমাকে এ অবস্থায় দেখে আমি খুবই দুঃখ পাচ্ছি। তোমার হাত দুটোর দিকে চেয়ে দেখতো···· যেন শ্রমিক মজুরের হাত।"

সাফওয়াত পেছন থেকে টিপ্পনী কেটে বলল–

"পাশা! তুমি বলছ এক ষাট বছরের বুড়ী আর আমার মনে হচ্ছে এক'শ কুড়ি বছরের বুড়ি। দেখ তার চেহারা-সুরত পর্যন্ত বিগড়ে গেছে। তার স্বামী তো আজকাল তার নাম শুনে গালি দেয় এবং শিগগীরই একে ছেড়ে দেবে এবং যেকোন দিন ডাকযোগে তালাকনামা পাঠিয়ে দিবে।

এসব কথায় কোন মন্তব্য না করে হামজা আমাকে সম্বোধন করে বলল–

"তুমি আমার সামনে এক চ্যালেঞ্জ খাড়া করে রেখেছ। আমি তোমাকে বর্তমান দুরবস্থা থেকে মুক্তি দিতে চাই। বিশ্বাস কর, আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী।"

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওর প্রতি ঘৃণা মিশ্রিত দৃষ্টিতে চেয়ে রলাম। সে আমার নীরব ঘৃণা প্রকাশ বুঝতে পারছিল কিনা জানিনে। তবে আমার মতে সে ছিল এক নম্বর কাপুরুষ।

সে যখন আমাকে ধমক দিয়ে কথা বলতো তখন মনে হতো; আমাকে ভয় দেখিয়ে সে নিজের ভয় লুকানোরই চেষ্টা করছে। বস্তুতঃ আমার অবিচলতায় তারা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

সে হঠাৎ বন্য জন্তুর মত গর্জন করে আমাকে শায়েস্তা করার আদেশ দিল সাফওয়াতকে। আমি তৎক্ষণাৎ দেয়ালের দিকে মুখ করে হাত দু'টো দেয়ালের সাথে উঁচু করে তুলে দেই। এরপর সাফওয়াতের হাতের হান্টার আমার আগের ক্ষত-বিক্ষত পিঠের উপর নাচতে লাগল। সে সা'দ নামক আরো একজন সিপাহীকে ডেকে আমার পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়। তার হাতেও হান্টার। আরও একজন সিপাহী জয়তুন তেলে ভেজানো হান্টারের একটি ভাঁড় এনে আমার সামনে রেখে দিল। নিষ্ঠুর সা'দ গরম জয়তুনে সিদ্ধ সেসব হান্টারের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। এরপর আরো

ডজন খানেক সিপাহী এসে গরম তেলে সিদ্ধ এক একটি হান্টার হাতে নিয়ে তা বাতাসে দুলিয়ে আমাকে কুৎসিত গালাগালি দিতে লাগল।

কিন্তু আমি ওদের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে তাদের কোন গুরুত্ব না দিয়ে, আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল থাকি। আমি পবিত্র কুরআনের সেই আয়াতই বারবার পাঠ করছিলাম–

(সত্যিকার ঈমানদার তারা) যাদেরকে বলা হয় তোমাদের বিরুদ্ধে লোকেরা সংঘবব্ধ হয়েছে; সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো। একথা শুনে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা বলে উঠে "হাসবুনাল্লাহ ওয়া নে'মাল ওয়াকীল" -আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনিই তো সর্বোত্তম অভিভাবক।"

একটু পরেই পাষন্ড রুবী এসে আস্ফালন করতে করতে বলল–

"তোমরা সব····বেরিয়ে যাও অপেক্ষা কর····। আমি আজ রাতের জন্য এর হত্যা মুলতবী করেছি।" এরপর আমার হাত ধরে টেনে হেঁচড়ে সেলের দিকে নিয়ে যায়।

সেলে প্রত্যাবর্তন

দরজা খুললে সেলে ঢুকে দেখি আলীয়া ও গা'দ আম্মার ঘুমোচ্ছে। আমার আসার শব্দ পেয়ে উভয়েই জেগে উঠে আমার পা বেয়ে রক্ত গড়াতে দেখে ভীষণভাবে ঘাবড়ে যায়। আমি তাদের ঘুমিয়ে পড়তে বলি এবং নিজে প্রিয় নবীর সেই হাদীস আবৃত্তি করতে থাকি–

আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। আল্লাহ্‌র মহান ইজ্জত ও অসীম কুদরতে আমার সামনে-পেছনের সব কিছুর অনিষ্ট থেকে তাঁর হুকুমে পানাহ্‌ চাই।"

এভাবে দু'রাত কেটে যায়। কিন্তু যন্ত্রণার কোন উপশম হয় না। আমি আলীয়া ও গা'দার চোখ থেকে চাবুকের চোট লুকানোর জন্যে সারা শরীর ঢেকে রাখি। ওরা সে রাতের ঘটনা জানার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিল। দ্বিতীয় দিন গা'দা সেদিনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে গেলে আলীয়া তাকে চুপ করিয়ে দেয়। গা'দার প্রশ্নে কোন নতুন প্রস্তাবের ইঙ্গিত পেয়ে আমিও চুপ করে থাকি।

দ্বিতীয় রজনী

এশার নামাজের পর সেলের দরজা খুলে সাফওয়াত তার ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে প্রবেশ করে। সে তার স্বভাবগত কঠোরতার স্বরে বলল–

"এই মেয়ে, জয়নব– এই বলে আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলল

চল–। আমাকে ধাক্কা মেরে-মেরে সে পথ চলছিল। পথে এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো' সে বলল–

"সাফওয়াত, খলীল তোমার অপেক্ষায় রয়েছে।"সাফওয়াত আমার প্রতি গালি ছুঁড়ে বলল–

"একে ওর কাছেই তো নিয়ে যাচ্ছি।"

সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল–

"এ-ই কি জয়নব আল-গাজালী?"

সাফওয়াত গালি দিয়ে বলল–

"হ্যাঁ এ-ই হচ্ছে জয়নব আল-গাজালী।" একটু পরেই আমাকে এক কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়।'টেবিলের ওপাশে বীভৎস চেহারার এক ব্যক্তি বসেছিল। আমাকে দেখা মাত্রই সে জীন্‌গ্রস্থ রোগীর মতো প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এরপর কক্ষময় টহল দিতে দিতে সাফওয়াতকে বলল–

"যাও ওকে ডেকে নিয়ে এস।"

সাফওয়াত এক লোককে নিয়ে প্রবেশ করল। সে এসেই চেয়ারে বসে আমাকে জিজ্ঞেস করল–

এই বুড়ি! তুই কে?

ঃ জয়নব আল-গাজালী- জবাব দিলাম।

সে জিজ্ঞেস করল–

ঃ তুমি এখানে কেন?

ঃ আমি তার কি জানি-বললাম....

সে বলল–

ঃ তোমার জানা উচিৎ যে, তুমি হুজায়বী, সাইয়েদ কুতুব এবং আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইল মিলে প্রেসিডেন্ট নাসেরকে হত্যার পরিকল্পনা নিয়েছিলে বলেই আজ তুমি এখানে–

আমি দৃঢ়তার সাথে প্রতিবাদ করে বললাম–

ঃ এসব মিথ্যে অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সে বলল–

ঃ সাবধানে কথা বল। আজ রাতে আর মারধোর নয় একেবারে খুন···তুমি জান না, আমি কে? আমি সামরিক কারাগারের জানোয়ার, কথা বুঝেছ?

আমি বললাম–

ঃ কারাগারে আসা পর্যন্ত জানোয়ার আর কুকুর ছাড়া কোন মানুষের সাক্ষাৎ পাইনি। অবশ্য নির্যাতিত ইখওয়ানদের কথা আলাদা। জনগণের প্রিয় নেতারা এখানে জানোয়ার এবং কুকুরের হাতে নির্মমভাবে লাঞ্ছিত-নিপীড়িত হচ্ছে।

সে ব্যক্তি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আমাকে জোরে লাথি মারে এবং দু'হাতে প্রচন্ড ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে অবিরাম লাথি মারতে থাকে। এই অতর্কিত হামলায় আমি প্রায় অচেতন হয়ে পড়ি। সে নিজেও হাঁফাচ্ছিল। সে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো-

ঃ আমি দার্শনিক সুলভ কথা শুনতে চাইনে- ঠিক মতো কথা বলবে। এই বলে সে আমার গালে জোরে এক চড় বসিয়ে দেয়।

সাফওয়াত দু'হাতে আমাকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল। এরপর দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি এসে বলল-

ঃ হে জয়নব, এসব কি করছ তুমি? তুমি লোকদের অপমানিত করছো, উপহাস করছো? জান, প্রেসিডেন্ট খুব উদারমনা লোক। তিনি তোমার মঙ্গল কামনা করেন। আমরা তোমাকে মামলায় রাজসাক্ষী বানাতে চাই। ইখওয়ানের সাথে মিলে তুমি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলে, আমরা তোমার উপর থেকে সে অভিযোগ তুলে নেব।

আমি বললাম-

ঃ অপরাধ ইখওয়ানুল মুসলিমুন বা আমার নয়। বরং তোমরাই অপরাধী। একটি মুসলিম দেশের উপর জবরদস্তী শাসন চালানোর দায়ে অপরাধী।

সে বলল-

ঃ তুমি হয় পাগল-নয়তো হতে পারে তোমার মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। যাই হোক, আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি। তবে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবো, যে এটা ভাল করেই জানে যে, তোমার সাথে কিভাবে সমঝোতায় পৌঁছানো যাবে।

সে চলে গেলে আমি আল্লাহর শোকর আদায় করি। সে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে বাধ্য করে যায়নি।

আমি অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করছিলাম।

একটু পরে এক ব্যক্তি চাবুক হাতে ভেতরে এসে আমাকে দাঁড়াতে বলে, আমার নাম জিজ্ঞেস করল। আমি স্বাভাবিকভাবে বললাম–

ঃ জয়নব আল-গাজালী।

সে বলল-

ঃ রে-হতভাগী মেয়ে! আজ তোর জীবনের শেষ রাত। তোর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এখানেই থাকবো।

এমন সময় আরেক ব্যক্তি এসে প্রথম জনকে বলল–

ঃ তুমি যাও। আমি কিছুক্ষণের জন্যে এর কাছে আছি। এই মেয়ে অনেক সৎকাজ করেছে জীবনে। কিন্তু অবশেষে ইখওয়ানের পাল্লায় পড়ে এতবড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছে আজ।

প্রথম জন বিস্ময়ের সাথে বলল–

ঃ সত্যি! এ জীবনে ভাল কাজও করেছে?

কিন্তু যাই হোক, তার জীবনের আর সামান্য সময়ই অবশিষ্ট আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওকে খুন করা হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল–

ঃ তুমি যাও তো। আমি দেখি ওর সাথে কোন মীমাংসায় আসতে পারি কিনা! তা তোমরা ওর কাছ থেকে কি আশা কর?

প্রথম জন বলল–

ঃ প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর উপদেষ্টা উভয়েরই ইচ্ছে হচ্ছে যে, ও মামলায় রাজসাক্ষী হোক এবং ইখওয়ানের বিরুদ্ধে বিবৃতি দান করুক। ইখওয়ানরা ইতিমধ্যেই তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। এই বলে প্রথম জন চলে গেল।

এবার দ্বিতীয় জন আমার প্রতি কৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ করে বলল–

ঃ জয়নব, তুমি নিজের সাথে অবিচার করছ কেন? তোমার পরিচ্ছদ ছিঁড়ে পেঁজা পেঁজা হয়ে গেছে।

এরপর সে টেবিলের উপর বসে বলল–

ঃ তুমি তোমার সব জ্ঞানবুদ্ধি একত্রিত করে শোন এবং আমার এক একটি প্রশ্নের জবাব দাও।

আমাকে নীরব দেখে সে আবার বলল–

ঃ আমি আজ সকালে তোমার ভাই আব্দুল মোমেন ও সাইফ এবং তোমার স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তোমার স্বামী সত্যিই খুব ভাল মানুষ। কিন্তু তুমি তার জন্যে অসুবিধার সৃষ্টি করেছ। আমি তোমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে আগ্রহী। আর এর জন্যে তোমাকে শুধু রাজসাক্ষী হতে হবে। এটা খুবই সহজ পথ।

এরপর সে সাফওয়াতকে ডেকে বলল–

ঃ এর ঘুমানো এবং আরামের প্রয়োজন। একে সেলে রেখে এসো।

আমাকে বলল–

ঃ আর হ্যাঁ! আগামীকাল আবার সাক্ষাৎ হবে; তুমি খুব ভেবে চিন্তে এসো।

সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম

আমি যখন সেলে পৌঁছাই তখন আলীয়া ও গা'দা ঘুমুচ্ছিল। আমার আসার শব্দ পেয়ে আলীয়া জেগে উঠল। সে ঘুম জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করল–

ঃ আপনি এসে গেছেন আলহাজ্জা!

ঃ আলহামদু লিল্লাহ। –আমি জবাব দিলাম। আমি ঘুমুতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু ঘুম এলো না। এরই মধ্যে ফজরের আযান হলো। আমরা সবাই মিলে জামায়াতে নামাজ আদায় করলাম। নামাজের পর গা'দা রাত্রির দুরবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে বললাম–

ঃ আল্লাহর কাছে দোয়া কর যেন তিনি আমাকে সত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। ওরা আমাকে নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন করতে চাচ্ছে। তারা আমার কাছে অসম্ভব কাজ আদায় করার দাবী করছে।

ঃ আল্লাহ্ আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। কিন্তু গা'দা রাতের ব্যাপারে জানার জন্যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত এবং যন্ত্রণাপীড়িত ছিলাম বলে ওকে কিছু জানাতে পারলাম না। আমি মনে মনে পরবর্তী রাতের অবস্থার মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আলীয়া অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করছিল। সে গা'দাকে চুপ করিয়ে রাখলো। এভাবে কোন রকমে সেদিন কেটে গেল।

জুলুমের রাত

শেষ পর্যন্ত যে আশঙ্কায় ছিলাম, সেই রাত এলো। আলীয়া এবং গা'দা আম্মার আমার জন্যে এবং সব ইখওয়ানদের মঙ্গল ও মুক্তির জন্যে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলো। দরজা খুলে সাফওয়াতের সাথে এক নতুন লোক এলো। আমাকে নিয়ে এক কক্ষে প্রবেশ করে নতুন লোকটি সাফওয়াতকে চলে যাবার আদেশ দিয়ে আমাকে একটি চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে বলল–

ঃ জয়নব! যারা তোমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যে এসেছিল তাদের প্রত্যেককে তুমি নিরাশ করে ফিরিয়ে দিয়েছ। আজ আমিও তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি! আমি আশা করি, আমাদের প্রভু আমাকে সাহায্য করবেন এবং তোমাকেও আল্লাহ্ সঠিক পথের সন্ধান দেবেন। আর তুমি ইখওয়ানের পক্ষে কথা বলার চেয়ে আশা করি এদিকেই মনোযোগ দেবে যে, ওরা তোমাকে বিভ্রান্ত করে এই নাজুক অবস্থায় টেনে এনেছে। তুমি ওদের ব্যাপারে প্রতারিত হয়েছ। ভেবে দেখতো; তারা সত্যি-সত্যিই কি ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন চায়? নাকি ক্ষমতা লাভের জন্যে ইসলামের নাম ব্যবহার করছে। আমরা চাই, তুমি আমাদের ব্যাপারে উদার দৃষ্টিকোণ গ্রহণ কর। জনাব হুজায়বী তোমার ব্যাপারে এমন সব কথা বলেছেন, যার ভিত্তিতে তোমার ফাঁসির শাস্তিও হতে পারে। সাইয়েদ কুতুবও জনাব হুজায়বীর মতের সমর্থন করেছেন আমরা অবশ্য তাঁদের কথা স্বীকার করি না, কারণ আমরা তোমাকে এই বিরোধ থেকে মুক্ত করতে চাই। তোমাকে সরকারের পক্ষে রাজসাক্ষী বানাতে চাই। আমরা চাই, তুমি এখন ঘরে ফিরে যাও এবং যখনই তোমার সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে, কাউকে পাঠিয়ে অথবা আমি নিজে গিয়ে তোমাকে আনবো। তুমি যদি এ ব্যাপারে আমার সাথে একমত হও তাহলে তোমার সাথে প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর উপদেষ্টার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারি। এছাড়া তোমার সংস্থার সদর দফতর তোমাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে অবিলম্বে প্রেসিডেন্টের আদেশ জারি করা হবে। শুধু তাই নয়, প্রেসিডেন্ট তোমাকে উচ্চতর মন্ত্রী পদে বহাল সহ দেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানের ডিগ্রীও দান করা হবে। ইখওয়ান তোমার সাথে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তা এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে। তারা সব দোষের বোঝা তোমার আমার কাঁধে চাপিয়ে নিজেরা মুক্তির পথ খুঁজছে।

লোকটি এভাবে বলে যাচ্ছিল আর আমি নীরবে শুনে যাচ্ছিলাম। সে কথা বলার সাথে সাথে আমার চেহারার প্রতিক্রিয়া পাঠেরও চেষ্টা করছিল। এরপর সে টেবিলের উপর রাখা কলিং বেল টিপে সাফওয়াতকে ডাকল। এরপর আমার দিকে লক্ষ্য করে বলল–

ঃ তুমিতো 'কাহ্ওয়া' (এক জাতের কফি) খাও তা তোমার জন্যে এক বাটি কাহ্ওয়া আনতে বলব?

আমি বললাম–

ঃ অনেক ধন্যবাদ। আমার আপাততঃ কিছুর প্রয়োজন নেই। আমার জবাব পেয়ে সে সাফওয়াতকে তার জন্যে চা আনতে পাঠিয়ে দিয়ে বলল–

ঃ জয়নব, আমি তোমাকে কাগজ কলম দিচ্ছি। যেসব ব্যাপারে আমরা ঐক্যমতে পৌঁছেছি সেসব কথা তুমি এতে লিখে দাও।

আমি তাজ্জব হয়ে বললাম–

ঃ আমিতো কোন বিষয়ে আপনার সাথে একমত হইনি। আমাকে কি লিখতে হবে তাও জানিনে।

সে কাগজ-কলম দিতে গিয়ে বলল–

ঃ তুমি এখনো তোমার স্বার্থ সম্পর্কে যথার্থ অনুমান করতে পারনি। প্রেসিডেন্ট জামাল নাসের তোমার সাহায্য করতে চাচ্ছেন এবং তোমাকে এই মামলা থেকে উদ্ধার করতে ইচ্ছুক।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম–

ঃ কিসের মামলা? জনসাধারণ যথার্থভাবে দ্বীনকে বোঝবার জন্যে একতাবদ্ধ হচ্ছে তার জন্যে মামলা? আসলে মামলা চালানো উচিৎ প্রেসিডেন্ট, তার উপদেষ্টা এবং সাঙ্গ-পাঙ্গদের বিরুদ্ধেই। কারণ, দেশে নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়, অশ্লীলতার প্রসারতা এবং নাস্তিক্যবাদী চিন্তা-ধারার আমদানির জন্যে তারাই দায়ী। তারাই দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে। আমাকে যদি লিখতেই হয়, তাহলে এই দরিদ্র দেশের সামগ্রিক বাস্তবতা সম্পর্কেই লিখব। যেসব সত্য আমার কাছে স্পষ্ট এবং যা আমার পর্যবেক্ষণে এসেছে, আমি তাই লিখতে পারি।

সে বলল–

ঃ আমি জানি জয়নব, তুমি উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা এবং তোমার প্রতিভা অনন্য; তোমার অবস্থা আরো শোচনীয় হোক আশা করি তা কামনা করবে না। এই রলো কাগজ কলম, ভেবেচিন্তে যা তোমার জন্যে ভাল তা লিখে রেখো, আমি চললাম। আর হ্যাঁ, লিখতে গিয়ে এটা মনে রেখো যে,

প্রেসিডেন্ট তোমাকে মামলা থেকে মুক্ত রাখতে চান। মামলার বিষয়বস্তু তোমার কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আবার বলছি, হুজায়বী এবং সাইয়েদ কুতুব উভয়েই জামাল নাসেরের হত্যা এবং সরকার দখলের পরিকল্পনা নেয়। উভয়ের বক্তব্য মোতাবেক জয়নব আল-গাজালীই স্কীম তৈরী করে। তারা সব দোষ তোমার উপর আরোপ করে নিজেরা রেহাই চাচ্ছে। তারা বরং এও বলছে যে, এসব ঘটনাবলীর জন্যে কেবল তুমিই দায়ী এবং তোমারই কারণে তারা আজ এই বিপদের মুখোমুখি হয়েছে। এবার লিখ। তবে নিজের মতামত এবং তোমার ব্যাপারে ইখওয়ানদের অভিমত সম্পর্কে খুব ভেবে চিন্তে লিখ। ওরা সব কিছুর জন্যে তোমাকেই দায়ী করছে। আমাদের মতে ওরাই তোমাকে বিপথগামী করেছে এবং তোমাকে উস্কিয়ে নিজেরা পিছু হটে গেছে। বলতো এটা কি বাহাদুরী হয়েছে, নাকি কাপুরুষতা?

এরপর সে আমাকে কাগজ কলম সহ একা রেখে চলে যায়। আমি লিখতে শুরু করলাম ঠিকভাবে–

ঃ হতভাগ্য এই কাগজ আর কলমের উপর শত আফসোস যে, সেলের এক নির্যাতিত কয়েদীর হাতেই তারা পড়েছে। আমরা নবীন ইখওয়ানদের সাথে ইসলামী আইন শাস্ত্র, হাদীস ও রাসূলের সুন্নাত, পবিত্র কুরআনের তাফসীর ইত্যাদিই অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিলাম। ইবনে হাজমের আল্‌মুহাল্লা, ইবনে কাইয়ুমের জাদুল মায়াদ, হাফেজ মোন্তাজারীর আত্‌তারগীব ওয়াত তারতীব' এবং সাইয়েদ কুতুবের ফী যিলালিল কুরআন এবং ময়ালেমু ফিত্‌তারিক গ্রন্থাবলী পড়তাম। আমরা রাসূলে করীমের জীবনী ও সাহবীদের জীবনীগ্রন্থ পাঠ করি, ইসলামী জীবনাদর্শ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তা জানার জন্যে। এসব পাঠক্রম চলতো ইমাম হুজায়বীর অনুমতি এবং তত্ত্বাবধানে। এসব পাঠক্রমের উদ্দেশ্য ছিল নবীন বংশধরদের সৎচিন্তা ও সৎকর্মের দিকে আকৃষ্ট করা এবং সুষ্ঠু নেতৃত্বের ক্ষেত্র তৈরী করা। আমরা দুনিয়ার বুকে পুনরায় ইসলামী আদর্শ কায়েমের আশায় যথার্থ কর্মী সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করি। বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা এবং চিন্তা-ভাবনার পর আমরা তুরুণদের সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেই। সামাজের অশিক্ষিত এবং বিভ্রান্ত তরুনদের সুপথে আনাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে তের সাল মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এরপর আমরা সারাদেশে সমীক্ষা চালিয়ে দেখবো। যদি তাতে ইসলামী আদর্শে বিশ্ববাসীদের অনুপাত শতকরা ২৫ ভাগের কম বের হয় তাহলে আমরা আবার তের বছরের পরিকল্পনা কার্যকরী করব বলে সিদ্ধান্ত নিই। এইভাবে

নিয়মতান্ত্রিক পর্যায়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ বার পর্যন্ত অবস্থা দেখবো। যতদিন না দেশের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোক ইসলামী আদর্শের সক্রীয় সমর্থক হচ্ছে, ততদিন এইভাবে প্রশিক্ষণমূলক কাজ চলতে থাকবে। তা এতে জামাল নাসেরের ভয় পাওয়ার কি আছে? আর তোমরা যারা সরকারের সাথে জড়িত রয়েছ তোমাদেরই বা এত ভয় কিসের? আমাদের উদ্দেশ্য অর্জনের আগেই হয়তো বেশ কয়েক যুগ পেরিয়ে যাবে। তাহলে তোমাদের বুক শংকায় দুরুদুরু করছে কেন? আমাদের পরিকল্পনা নাসেরকে খুন করার কোন কথাই নেই। তাকে খুন করা কোন সমস্যা নয় বরং ওর মতো অনেককে খুন করার চেয়েও বড় সমস্যার সম্মুখীন গোটা জাতি। কাউকে খুন করাতো দূরের কথা কোন প্রাণীকে সামান্য আঘাত দেয়াও আমাদের কল্পনার বাইরের কথা। কিন্তু তোমরা এ ধরনের ভিত্তিহীন মিথ্যা অভিযোগ তুলে অসংখ্য মুমিন মুসলমানকে নাহক খুন করার ফন্দী আটছো। বরং তুমিই আমাকে জবাব দাও যে আমাদেরকে এভাবে নির্বিচারে আটক করে নির্যাতন করার এবং হত্যার পরিকল্পনা কার্যকরী করার হুকুম তোমাদেরকে কে দিয়েছে? তোমরা কি এসব অন্যায় অবৈধ কাজ করছ ইহুদীদের নির্দেশে, না কি সমাজতন্ত্রী শিখদন্তীদের আদেশে? মুসলমানদের ইসলামী পুনর্জাগরণ দেখে আজ নাস্তিক্যবাদী কুম্যুনিষ্ট সোস্যালিষ্ট এবং পাশ্চাত্যের ধর্মবৈরী খৃষ্টান, শোষণবাদী পুঁজিপতি এবং ইহুদীবাদীদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ইসলামী বিপ্লবের শ্লোগান তাদের রাতদিনের আরামকে হারাম করে দিয়েছে। জী হ্যাঁ! ইসলামের নাম তাদের অসহ্য। এজন্যে তারা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের পেছনে তাদের গোয়েন্দা বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছে এবং তারা তাদের পোষা এজেন্টদের মাধ্যমে ইসলামের মুজাহিদদের হয়রানী এবং হত্যা করার চক্রান্ত কার্যকরী করছে।

কিন্তু জেনে রেখ, আল্লাহ্ তাঁর আলোক ছড়িয়ে দিবেন এবং অবিশ্বাসীদের অপদস্থ করবেন। আজ তোমরা যদি আমাদের হত্যা কর তাহলে আগামীকাল ইসলামের ঝান্ডাকে সমুন্নত রাখার জন্যে এগিয়ে আসবে লাখো মুমীনের অপ্রতিরোধ্য কাফেলা।

মুসলিম মহিলা সংস্থার পত্রিকা, সংস্থার সদর দফতর বা আমাদের চারপাশের এই গোটা পৃথিবী সম্পর্কে এইটুকু বলবো যে, আমরা কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নই। আমরা শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আল্লাহ্র দুনিয়াতে আল্লাহ্রই দ্বীনের প্রতিষ্ঠা চাই। আমার বক্তব্য লিখে নীচে আমার নাম 'জয়নব আল-গাজালী' স্বাক্ষর করি।

সাফওয়াত রুবী ভিতরে এসে লিখিত কাগজ চাইলে আমি তা তাকে দিয়ে দেই। সে তা নিয়ে বাইরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর সেই ব্যক্তি আমার কাছে এল, যে কাগজ কলম দিয়ে গিয়েছিল। ওর হাতে কয়খানা কাগজ ছিল। অবশ্য এগুলো আমার লিখিত ছিলনা। কিন্তু সে এসব কাগজকে কেটে চিরে এমনভাবে ছুঁড়ে মারলো, যেন আমাকে বুঝাতে চাচ্ছে যে, আমারই লিখিত কাগজগুলো ছিড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলে দিয়েছে।

সে এবার সাফওয়াতকে ডেকে বলল–

ঃ একে ধর সাফওয়াত·····। এ আসলে ফাঁসিতে ঝুলারই উপযুক্ত মেয়ে, লোকেরা তাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিকই করেছে। আমি তার সাহায্য করতে এসেছিলাম। সে যখন আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, তাকে এখন ফাঁসিতেই ঝুলতে দাও। –এসব বলে সে ফিরে যায়। এরপর সেই সাফওয়াত আমাকে পশুর মত মারতে শুরু করলো। সে দু'হাতে আমাকে ঘুষি মারছিল আর পা দিয়ে লাথি মেরে চলছিল। ক্লান্ত হয়ে পড়লে, পরে আমাকে সেলে বন্ধ করে চলে যায়।

আমি ভেবে বিস্মিত হচ্ছিলাম যে, আমি যখন নিজের বক্তব্য মৌখিক এবং লিখিত ভাবে বার বার স্পষ্ট করে দিয়েছি তখন তারা আমার বিরুদ্ধে এবং লোভ-লালসা দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত কি আদায় করতে চায়? তাদের তো এখন বিশ্বাস করা উচিৎ যে, কোন কিছুতেই আমাকে নীতি থেকে টলানো যাবে না। নাকি, তারা পুর্বনির্দ্ধারিত কর্মসূচী মোতাবেক আমাকে হত্যা করে স্বস্তি পেতে চাচ্ছে। আমি তো সবকিছু একাধিকবার স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছি, কিছুই তো গোপন নেই, সব স্পষ্ট এবং সব কিছুরই ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করা হয়েছে। **তাহলে এরা চায় কি?**

স্যুটকেস এবং প্রেসিডেন্ট নাসেরের চিঠি

সেলের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে আমি যেন আরেক দুনিয়ায় গিয়ে পৌছুই। সমস্ত শরীর, প্রতিটি জোড়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। ব্যথা-বেদনা, জ্বালা ও যন্ত্রণায় অস্থির অবস্থা। কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। বসতে পারছি না, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। জড় সড় হয়ে একটু শুতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ব্যথ্যা। চাবুক-হান্টার, কিল-ঘুঁষি এবং লাথির আঘাতে অসহ্য যন্ত্রণায় শুধু ছটফট করছিলাম। মেরে মেরে ওরা আমার গোটা শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে আর অকথ্য অশ্রাব্য গালি দিয়ে আমার আত্মাকে বিষন্ন করে দিয়েছে। অস্থিরতা ও যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করতে করতে

ফজরের আজান শোনা গেল। আলীয়া এবং গা'দা আমার নামাজের জন্য জেগে উঠল। আমরা তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করি। আমার অবস্থা ছিল তখন সকল প্রশ্নে জবাবের মত। কি হয়েছে, কেন হয়েছে, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। আলীয়া আমাকে বলল–

ঃ ডাক্তার আমাকে ঘুমের বড়ি দিয়েছে। আপনি নেবেন কি একটা ·····? আমি বললাম--

ঃ দিতে পার। আমি ঘুমোবার উদ্দেশ্যে চাইলাম। কিন্তু কোথাত ঘুম; আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ শরীর আর আহত মনের অস্থিরতায় ঘুম আসবে কোত্থেকে? একমাত্র আল্লাহ্র রহমত ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমি আল্লাহ্র নামের মধ্যেই প্রশান্তি খুঁজে পাই। এত নির্যাতনের মধ্যেও নামাজের জন্যে এবং আল্লাহ্র কুরআন পাঠের জন্যে নিজের মধ্যে এক অজানা শক্তির আভাষ পাই।

গা'দা আমার সেলে দেয়ালে দাগ কেটে তারিখে লিখে রাখতো। সে বলল–

ঃ আজ আঠারই অক্টোবর। আমি বললাম–

ঃ আল্লাহ্র ফজলে অবশিষ্ট দিনগুলোও পেরিয়ে যাবে। আলীয়া বলল–

ঃ ইনশাআল্লাহ।

বিকেল চারটায় সেলের দরজা খুলে সাফওয়াতের সাথে দু'জন সিপাহী প্রবেশ করল। তাদের হাতে মস্তবড় এক স্যুটকেস। স্যুটকেস দেখেই তা আমি চিনে নিয়েছি। এটা আমার বাড়ী থেকেই আনা হয়েছে। সাফওয়াত স্যুটকেস খুলে একটা জিনিস বের করে দেখাতে দেখাতে বলল–

ঃ জয়নব, এসব কাপড়-চোপড় এবং জিনিসপত্র আমরা তোমার বাড়ী থেকে আনিয়েছি এরপর সব জিনিস আবার স্যুটকেসে ভরে তা বন্ধ করে রাখল। দেখে মনে হচ্ছিল, যেন আমাকে কোথাও লম্বা সফরে পাঠানো হবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম–

ঃ এসব কে আনিয়েছে এবং কে এনেছে? সাফওয়াত বলল–

ঃ আমরাই আনিয়েছি এবং তোমার বোন হায়াত এসব এখানে পৌঁছিয়ে গেছে। এরপর সে সিপাহীদেরকে চলে যেতে বলে, একটু পরে নিজেও ফিরে যায়। জল্লাদকে আবার ফিরে আসতে দেখ বিরক্তিতে চোখ বন্ধ করে রাখি এবং হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়ি। আলীয়া ও গা'দা ত্বরিত আমার হাত পায়ের তালূ মালিশ করতে শুরু করল। ওদের চেষ্টায় আমার চেতনা ফিরে এলে ওরা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল–

ঃ কিছু নয়, আলহাজ্বা! ব্যাপারটা তো খুবই সহজ। আপনার পরণের কাপড় নষ্ট হয়ে গেছে তাই হয়তো ওরা ভাল কাপড়-চোপড় আনিয়েছে। আর কোন বিশেষ কারণ নেই।

আলীয়াকে বললাম-

ঃ এটা আসন্ন সংকটের ইঙ্গিত বহন করছে, আলীয়া!

ঃ না আলহাজ্বা! ওরা স্রেফ আপনার প্রয়োজনের তাগিদেই এসব আনিয়ে থাকবে। -আলীয়া বলল।

আমি বললাম-

ঃ না আলীয়া, না! এটা আরেক পরীক্ষা নয়তো! শুধু আমার কাপড়ই আনা হবে কেন? আমি তো আনতে বলিনি- আমার উপর বিরাট বিপদ আসতে যাচ্ছে···· আল্লাহ্ আমাকে সত্যের উপর সুদৃঢ় রেখে বিপদমুক্ত করুন।

আমরা আসরের নামাজ আদায় করছিলাম। হঠাৎ সাফওয়াত ভেতরে ঢুকে আমাকে নামাজ থেকেই ধাক্কা মেরে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল-

ঃ আমার সাথে চল। এরপর আলীয়া ও গা'দাকে সেলে বন্ধ করে আমাকে নিয়ে চলে যায়। সে আমাকে আলাদা, এক গ্যালারীতে নিয়ে যায়। এরপর এক সংকীর্ণ অন্ধকার এবং দুর্গন্ধময় স্থানে ঠেলে দেয়া হয়। এ স্থানটি ছিল সাপ ইঁদুরের গর্তে ভরা ভীষণ ভয়ঙ্কর স্থান। প্রচন্ড শীত দুর্গন্ধ এবং ভয়াল নীরবতা আমাকে দারুণভাবে সন্ত্রস্ত করে তোলে। আমি অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি এবং সংকট মোকাবিলার জন্যে তাঁর সাহায্য কামনা করি। "জেনে রেখো, আল্লাহ্র নাম জপলে, আত্মায় এক অবর্ণনীয় শক্তি ও প্রশান্তির সঞ্চার হয়।

হঠাৎ আলো দেখা দেয় এবং সাফওয়াত ভেতরে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল-

ঃ নে এই চিঠি পড়ে নে।

আমি চিঠি খুলে দেখলাম ছাপার অক্ষরে লেখা-

"প্রেসিডেন্টের দফতর। এরপর টাইপের অক্ষরে লিখিত হয়েছে-

"প্রেসিডেন্ট আবদুন নাসেরের নির্দেশে জয়নব আল-গাজালীকে পুরুষদের চেয়েও বেশী নির্যাতন এবং দুঃখময় শাস্তি দেয়া হোক।"

স্বাক্ষর
জামাল আবদুন নাসের
মিশরের প্রেসিডেন্ট।

চিঠিতে সরকারী মনোগ্রাম এবং বিশেষ প্রেসিডেন্সিয়াল সীলমোহরও অংকিত ছিল।

আমি প্রেসিডেন্টের চিঠি পড়ে সাফওয়াতকে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে বলি–

ঃ তোমাদের সবার চেয়ে আল্লাহ্ অনেক বড় এবং শক্তিমান। আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ঠ।

সে আমাকে খুনী দৃষ্টিতে দেখে অকথ্য গালি দিতে দিতে সেলের দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

একটু পরেই পুনরায় সাফওয়াতের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠি; সে বলছিল–

ঃ হুঁশিয়ার, সাবধান!

সেলের দরজা খুললে দেখলাম বিসিউনি। ভেতরে' এসে বলল–

ঃ আরো ভাল করে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে তোমাকে আরো এক ঘন্টা সময় দেয়া হচ্ছে। নিজের উপকারের ব্যাপারে যথার্থ ধারণা করে নাও। প্রেসিডেন্ট জামাল নাসের এবং তাঁর উপেদেষ্টা আবদুল হাকীমের সাথে সাক্ষাতের জন্যে তোমার প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় আনিয়ে রেখেছি। এরপর মামলা সম্পর্কে তোমার অভিমত পাল্টে যাবে। সাফওয়াতের দিকে চেয়ে সে বলল–

ঃ একে প্রেসিডেন্টের চিঠি পড়ে শোনাও। সাফওয়াত চিঠিখানা আবার পড়লো।

"প্রেসিডেন্ট আবদুন নাসেরের নির্দেশে জয়নব আল-গাজালীকে পুরুষদের চেয়েও বেশী নির্যাতন এবং দুঃখময় শাস্তি দেয়া হোক।"

স্বাক্ষর
জামাল আবদুন নাসের
মিশরের প্রেসিডেন্ট।

হামজা, সাফওয়াতের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে আমাকে দিয়ে বলল–

ঃ ধর পাগলী! চিঠি পড় এবং এর বিষয়বস্তু ভাল করে বুঝে নেয়ার চেষ্টা কর।

আমি বললাম–

ঃ এ চিঠি আমি ইতিমধ্যেই পড়েছি। সে বলল–

ঃ আবার পড়। হান্টার কোথায় সাফওয়াত? আমি চিঠি নিয়ে আবার পড়লাম। এরপর চিঠিখানাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললাম–

ঃ পাপিষ্ট কাফেরের বাচ্চারা; বেরিয়ে যাও বলছি। আমার প্রভু অনেক শক্তিমান····। হামজা বিসিউনি সেলের বাইরে গিয়ে সিপাহীদের ডাকল। সিপাহীরা কাপড়ের সেই স্যুটকেস নিয়ে ভেতরে এসে চেঁচিয়ে বলল–

ঃ আমরা তোকে আর এক ঘন্টার সুযোগ দিচ্ছি। এ হচ্ছে তোর পোষাক-পরিচ্ছদ। নিজের ভালোর জন্যে ভেবে চিন্তে যা হয় কর। সমস্যার সমাধান এখন তোর হাতেই রয়েছে।

এরপর সেলের দ্বার বন্ধ করে ফিরে যায়। আমি আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করছিলাম–

"হে পাক পরওয়ারদিগার! আমাকে শক্তি ও সাহস দাও, যেন বিপদের মোকাবেলা করতে পারি।"

এক ঘন্টা পরই সাফওয়াতের কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল–

ঃ হুশিয়ার, সাবধান! হামজা বিসিউনি আসছেন। হামজা ভেতরে ঢুকে আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করল–

ঃ কি ব্যাপার, তুমি এখনো কাপড় পরনি। তা তুমি মৃত্যুই চাও বুঝি? আমি বললাম–

ঃ কোন পরওয়া নেই। আমি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছি। হামজা বলল–

ঃ ঠিক আছে সাফওয়াত, এই মেয়ে সাইয়েদ কুতুব এবং হুজায়বীর প্রাণের বিনিময়ে নিজের প্রাণ নিবেদন করছে। ওরাতো এরই কাছ থেকে মুক্তি চায়। ওরা এখন বে-কসুর খালাস পাবে । সাফওয়াত আমাকে কঠিন হাতে টেনে হিঁচড়ে অজানা পথের দিকে চলল। আমি গ্যালারীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উচ্চ কণ্ঠে 'আল্লাহ্ আকবর' ধ্বনি তুললাম। আলীয়া এবং গা'দা আম্মারকে শোনানোই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কারণ হামজা বিসিউনির কথা মত আমি ভাবছিলাম এটাই হয়তো আমার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত।



চতুর্থ অধ্যায়

শামস্ বাদরানের অত্যাচার

সাফওয়াত আমাকে নিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে অফিসার হা'নীর দফতরে পৌঁছায়। এরপর হা'নী আমাকে শামস্ বাদরানের অফিসে নিয়ে যায়।

জানেন, কে এই শামস্ বাদরান? নির্দয়-নিষ্ঠুর পশুর চেয়েও অধম এক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি। হায়নার চেয়ে হিংস এবং অসভ্য এই লোকটি মানুষের উপর জুলুমের ভয়ঙ্কর রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। মুমিন মুসলমানদের পেলে তো সে আরো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। এ বিশেষ পদ্ধতিতে বর্বরতার পন্থায়, এমন কঠোর এবং প্রচণ্ডতার সাথে সে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালায় যে, এর সঠিক বর্ণনা পেশ করা অসম্ভব। সে তার সর্বশক্তি দিয়ে মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাস নষ্ট করার এবং মারের চোটে মুসলিমকে অমুসলিম বানানোর চেষ্টা করে। অবশ্য তার সব পাশবিক প্রয়াসই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

আমি পৌঁছলে সে অত্যন্ত দম্ভ এবং তাচ্ছিল্যের সাথে জিজ্ঞেস করল–

ঃ জয়নব আল-গাজালী! তুই এখনো বেঁচে আছিস?

ঃ হ্যাঁ! ধীর শান্ত কণ্ঠে একই শব্দে জবাব দিলাম আমি।

শামস্ বাদরানের অফিসের পাশেই ছিল হামজা বিসিউনির অফিস। আমার পিছনে সাফওয়াত আরো দু'জন জল্লাদকে নিয়ে চাবুক হাতে প্রস্তুত ছিল। আগুনের হল্কার মত লক্‌লকে দেখাচ্ছিল চাবুকের চক্‌চকে কালো ডগা।

শামস্ বাদরান দাম্ভিকতার সাথে বলল–

ঃ এই মেয়ে জয়নব····! এখনও সময় আছে, তোমার মন দুরস্ত করে নাও····নিজের মঙ্গল দেখ। আমরাও তোমার ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে অন্যদের দিকে দৃষ্টি দিতে চাই। ·····আবদুন নাসেরের মর্যাদার শপথ! হান্টারের আঘাতে আঘাতে তোমাকে কেটে-চিরে টুকরো টুকরো করে ছাড়বো।

আমি তেমনি ধীর-শান্ত কণ্ঠে বললাম–

ঃ আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়, তিনিই সর্বশক্তিমান।

সে বলল–

ঃ এ-ই মেয়ে! কেমন আজব ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছিস তুই? আমি চুপ করে রলাম।

এবার সে প্রশ্ন করল–

ঃ সাইয়েদ কুতুব এবং হুজায়বীর সাথে তোর কি সম্পর্ক? আমি স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললাম–

ঃ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক।

সে আহমকের মত জিজ্ঞেস করল–

ঃ কিসের ভ্রাতৃত্ব?

আমি আবার বললাম–

ঃ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

ঃ সাইয়েদ কুতুবের পেশা কি? সে প্রশ্ন করল।

আমি বললাম–

ঃ অধ্যাপক ইমাম সাইয়েদ কুতুব আল্লাহর পথের বীর মুজাহিদ, পবিত্র কুরআনের মোফাস্সির, মানে ব্যাখ্যাকার, মুজাদ্দিদ এবং মুজতাহিদ।

সে মূর্খের মতো জিজ্ঞেস করল–

ঃ এসবের অর্থ কি?

আমি এবার প্রতিটি শব্দের উপর বিশেষ জোর দিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে বললাম–

ঃ অধ্যাপক সাইয়েদ···· কুতুব···· নেত····এব শিক্ষক···· ইসলামী চিন্তা নায়ক····লেখক····বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং রাসূলে খোদার সার্থক অনুসারী····।

সে জল্লাদের দিকে নীরব ইঙ্গিত করলে এবার জল্লাদরা তাদের চাবুক ও হান্টার নিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত মার-পিট চলার পর সে আবার প্রশ্ন করল–

ঃ এ-ই মেয়ে! হুজায়বীর পেশা কি?

আমি জবাব দিলাম–

ঃ অধ্যাপক ইমাম হাসান হুজায়বী মুসলমানদের নেতা-ইমাম। তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সাথে সম্পর্ক রাখেন। ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আল্লাহর পথের মুজাহিদ। তাঁর উদ্দেশ্যে, গোটা মুসলিম মিল্লাত কুরআন ও সুন্নাহর পথে ফিরে আসুক····।

আমার কথা শেষ হবার আগেই আবার চাবুক আর হান্টার আমার পিঠে আগুন জ্বালাতে শুরু করল।

শামস্ বাদরান রাগে জ্বলে পুড়ে বলল–

ঃ সব বাজে কথা, অর্থহীন প্রলাপ বকছিস মেয়ে····!

হাসান খলীলও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলল–

ঃ পাশা তুমি তাকে বলতে দাও। একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার হতে যাচ্ছে। এরপর সে আমার সামনে এসে আমার হাত ধরে জিজ্ঞেস করল–

ঃ তুমি সাইয়েদ কুতুবের গ্রন্থ 'ময়ালিমু ফিত্‌তারীক' –মাইলষ্টোন-পড়েছ কি? আমি জবাব দিলাম–

ঃ হ্যাঁ পড়েছি বৈ-কি।

সেখানে অনেক পদস্থ অফিসার উপস্থিত ছিল। ওরা এসেছিল আমার উপর পৈশাচিক নির্যাতন উপভোগ করতে। তাদের একজন বলল–

ঃ তুমি কি এই গ্রন্থের সারাংশ বলে শোনাবে? আমি বললাম হ্যাঁ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু 'আলা রাসূলিহিল আমীন– শুরু করছি সেই আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম দয়ালূ ও অতি করুনাময়। পরম বিশ্বাসী রাসূলের প্রতি অশেষ দরূদ ও সালাম····

কিন্তু শামস্ বাদরান আমাকে আর এগুতে দিল না। সে অদ্ভুত কায়দায় হাত ঠুকে আমাকে জিজ্ঞেস করল–

ঃ এটা কি মসজিদের মিম্বার পেয়েছিস? মনে রাখবি, আমরা মসজিদে নয়····গীর্জায় অবস্থান করছি। এর সাথে সাথে শোনাল কদর্য্য গালিগালাজ।

হাসান খলীল বলল–

ঃ মাফ করবেন পাশা! ····আচ্ছা জয়নব, 'ময়ালিমু ফিত-তারীক' থেকে তুমি কি শিক্ষা পেয়েছ?

এবার আমি গাম্ভীর্য্যের সাথে বললাম–

ঃ 'ময়ালিমু ফিত্-তারীক' মুফাস্‌সির ও সাহিত্যিক-মুজতাহিদ সাইয়েদ কুতুবের বিখ্যাত গ্রন্থ। এতে তিনি মুসলিম মিল্লাতকে ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসার আহবান জানিয়েছেন। তিনি মুসলমানদেরকে তাওহীদ বিশ্বাসের ভিত্তিতে পুনরায় জেগে উঠার ডাক দিয়েছেন····। বিভ্রান্ত এবং পথভ্রষ্ট লোকদের তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলো দেখিয়েছেন···· তিনি ভুল-ভ্রান্তির জন্যে তাওবা করে দ্বীনের পথে

এগিয়ে আসতে বলেছেন, মুসলিম মিল্লাতকে মুর্খতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামী আদর্শের আলোকবর্তিকা তুলে ধরতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, মুক্তি ও অগ্রগতির একমাত্র পথ ইসলাম। শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের একমাত্র পথ ইসলাম। মুসলমানরা যতক্ষণ না ইসলামের পথ অবলম্বন করছে, ততক্ষণ তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না। এজন্যে কুরআন পড়তে হবে, বুঝতে হবে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে চলতে হবে। তিনি বলেছেন, জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেকের ডাকে মুসলমানদের সাড়া দিতে হবে। তাওহীদ ও রিসালাতের অনুসরণ করতে হবে। কারণ, তাওহীদ এবং রিসালাতের আদর্শই মুসলিম মিল্লাতকে উজ্জলতর জীবনের নিশ্চয়তা দান করতে পারে।

আমার কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত সবাই নীরব-নিশ্চুপ বসে রলো। এরপর নীরবতা ভঙ্গ করে হাসান খলীল আহম্মদ সুলভ মন্তব্য করল–

ঃ এ দেখছি ভাল বাগ্মী, চমৎকার বক্তৃতা করতে পারে। অপর একজন বলল–

ঃ তা ছাড়া সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকও। এরপর সে আমার গ্রেফতারীর সময় আটককৃত আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে একটি অংশ পড়ে শোনাল।

কিন্তু শামস্ বাদরানের কাছে এসব ভাল লাগছিল না। সে কথা কেড়ে নিয়ে আমার দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে বোকার মত বলল– এ মেয়েটির কোন কথাই মাথায় ঢোকে না।

ঃ তার এই কথার সাথে সাথেই জল্লাদরা তাদের চাবুক নিয়ে আমার উপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা আমাকে মারতে মারতে বলল–

ঃ পাশাকে সব কথা ঠিক ঠিক বলে দে।

হাসান খলীলের কথাবার্তার ধরণ-ধারণে বোঝা যাচ্ছিল যে, সে যেন আমাকে শিকার করার ফাঁদ পাতছে। সে ওদেরকে বলল–

ঃ কিছু আসে যায় না। এতো তাড়াহুড়ো কেন?

এরপর আমাকে লক্ষ্য করে বলল–

ঃ তোমরা যে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-কে তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ শ্লোগান হিসেবে গ্রহণ করেছে, আমি তার তাৎপর্য জানতে চাই।

আমি বললাম–

ঃ বেশত, প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) গোটা বিশ্বমানবতাকে আহবান করে

বলেছেন, মুর্তি-মানুষ বা অন্য যে কোন বস্তু বা শক্তির উপাসনা করা মানুষের শোভা পায় না। মানুষ এক আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। সৃষ্টি জগতের সব জীব বস্তু থেকে মানুষের মর্যাদা ও গুরুত্ব বেশী। সুতরাং মানুষ এক আল্লাহ্‌র ইবাদত-উপাসনা ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না। শুধু এক আল্লাহ্‌র সামনেই তার মাথা নত হবে। এছাড়া আর কোথাও কারো কাছে নয়। মোটামুটি এ হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র অর্থ। আর মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'র অর্থ হচ্ছে মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র মনোনীত শেষ রাসূল। তাঁরই মাধ্যমে আল্লাহ্ মানুষের জন্যে শাশ্বত চিরস্থায়ী জীবন বিধান ইসলামকে পাঠিয়েছেন দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠার জন্যে। কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে ইসলামের মুল কথা। আল্লাহ্ তাঁর রাসূল মোহাম্মদ তথা কুরআন ও সুন্নাহর উপর পুর্ণাঙ্গ বিশ্বাস স্থাপন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর বাস্তব উদাহরণ পেশ করাই হচ্ছে অবশ্য কর্তব্য। সংক্ষেপে এটাই হলো আমাদের কালেমায়ে তাইয়্যেবার তাৎপর্য।

শামস্ বাদরান এসব কথায় জ্বলে উঠলো যেন। সে চেচিয়ে বলল–

ঃ বন্ধ কর এসব বাজে কথা।

ঃ এর সাথে সাথেই তার পোষ্য পশুরা আমার উপর হান্টার আর চাবুক বর্ষাতে শুরু করলো। হাসান খলীল, শিকার তাঁর ফাঁদের কাছাকাছি বলে মনে করেই যেন শামস্‌কে বলল–

ঃ পাশা! আমার খাতিরেই আর একটু অবকাশ দাও।

এরপর আমার দিকে চেয়ে বলল–

ঃ আমাদের ব্যাপারে তোমার কি মন্তব্য। আমরা মুসলিম না কাফের?

আমি বললাম–

ঃ নিজেকে কুরআন-সুন্নাহর কষ্টি পাথরে রেখে পরখ করে দেখ। তুমি কি, এবং ইসলামের সাথে তোমার সম্পর্ক শত্রুতার না বন্ধুত্বের, তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আমার একথা শুনে শামস্ বাদরান রাগে ফেটে পড়ল। সে যা মুখে আসছে, তাই বলে যাচ্ছিল। অত্যন্ত নোংরা অশ্লীল গালাগালি শুরু করে। আমি চুপ থাকলাম। তাছাড়া করার মত আর উপায়ই বা কি ছিল? এতেও শান্ত না হয়ে সে হিংস্র পশুর মত হাঁফাতে-লাফাতে লাগল। সে বকতে লাগল–

জামাল নাসেরের বন্যতন্ত্র সম্পর্কে তুমি কিছুই জাননা। এতে অন্ধ বর্বরতার রাজত্ব চলছে এবং তা প্রচণ্ড ঝনঝার সামনের সব কিছুকে খড়কুটোর মত উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তার লোকেরা ক্ষুধার্ত বাঘের মত পথের পথিকদের সাবাড় করতেই অভ্যস্ত·····।

শামস্ বাদরান সাফওয়াতের দিকে চেয়ে বলল–

মারধোরেও এ কাবু হবে না দেখছি; একে উল্টো করে লটকিয়ে দাও।

সাফওয়াত বাইরে গিয়ে লোহার এক মোটা রড এবং কাঠের দু'খানা ষ্ট্যান্ড নিয়ে হাজির হলো। তার পেছনে চাবুক হাতে আরও তিন জন জল্লাদ।

আমাকে লটকিয়ে রাখার ব্যবস্থাদী পূর্ণ হলে আমি তাদের কাছে পরার জন্যে একটি ফুলপ্যান্ট চাইলাম।

হাসান খলীল বাদরানকে বলল–

ঃ তা' কিছু আসে যায় না। এরপর শামস্ বাদরান আমার জন্যে ফুল প্যান্ট আনতে বলল। একজন সিপাহী তাড়াতাড়ি তা এনে হাজির করল। শামস্ বাদরান বলল–

ঃ যা ঐ ঘরে গিয়ে প্যান্ট পরে এস।

প্যান্ট পরার জন্যে এসে দেখলাম, কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিরাট ঘর। উন্নতমানের আসবাবপত্র; দামী কার্পেটে মোড়া মেঝে এবং বিলাসিতার সব সাজসরঞ্জাম ভর্তি সুসজ্জিত এই হল ঘর। যাই হোক, ফুল প্যান্ট পরে আমি ফিরে এলে শামস্ বাদরানের নির্দেশে আমাকে শুন্যে লটকিয়ে দেয়া হয়। তারা কিভাবে যে আমার হাত পা জুড়ে বেঁধে লটকিয়েছে, তা আমার ঠিক মনে নেই। তবে মনে পড়ে শামস্ বাদরান আমাকে লটকানোর কাজে লোকদের উপর এমনভাবে হুকুম চালাচ্ছিল যেন সে রণাঙ্গনে সৈন্য পরিচালনা করছে।

আমাকে বেঁধে লটকানো হয়ে গেলে সে হেঁকে বলল–

ঃ সাফওয়াত, একে পাঁচশো বার বেত্রাঘাত কর। এর সাথে সাথেই শুরু হলো সেই নৃশংস অত্যাচারের তান্ডব লীলা। তারা কে কার চেয়ে বেশী পেটাতে পারে, তারই যেন প্রতিযোগিতা চলছিল এমন সম্মিলিত প্রহারে আমার ব্যথা-যন্ত্রণা যে কি পরিমাণ বেড়েছিল, তা অনুমেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব পশুদের সামনে নিজের দুর্বলতা প্রদর্শন করিনি। তাদের বেত ও চাবুকের ক্রস্ত ঘা সহ্য করে যাচ্ছিলাম আর আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে অন্তরের প্রশান্তি খুঁজছিলাম। কিন্তু ব্যথা-বেদনা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করল, তখন আর নীরবে সয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলনা, তখন সেই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমানের দ্বারে ফরিয়াদ ধ্বনি তুললাম, যাঁর কাছে প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সবকিছুই সমানভাবে স্পষ্ট। আমি 'ইয়া আল্লাহ-ইয়া আল্লাহ' ধ্বনি তুলছিলাম এবং চাবুকের ঘা আমার ব্যথা আরো তীব্রতর করছিল। এরপর অচেতন হওয়া পর্যন্ত শুধু আল্লাহ্‌কেই ডাকতে থাকি। বেহুশ

হয়ে আমি প্রাণহীন দেহের মত মাটিতে পড়ে যাই। ওরা আমাকে দাঁড় করিয়ে আবার লটকানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারল না। দাঁড়ানোর জন্যে বিন্দুমাত্র শক্তিও আমার অবশিষ্ট ছিলনা। দাঁড়াবার চেষ্টা করলেই আবার পড়ে যেতাম। আমার ব্যথা সহ্যের সীমা অতিক্রম করছিল। আমার দু'পায়ে রক্তের ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল আর শামস্ বাদরান সাফওয়াতকে হুকুম দিচ্ছিল, আমাকে দাঁড় করিয়ে আবার লটকিয়ে দিতে। আমি যন্ত্রণার আতিশয্যে দেয়ালের সাথে হেলান দেয়ার চেষ্টা করলে সাফওয়াত চাবুক মেরে আমাকে দেয়াল থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

আমি এবার অনন্যোপায় হয়ে বললাম-

ঃ আমাকে একটু মাটিতে বসতে দাও।

এর জবাবে শামস বাদরান বলল-

ঃ মোটেই বসতে দেয়া হবে না। কোথায় তোর আল্লাহ্! ডাকতো দেখি তাকে আমাদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য! কিন্তু এর পরিবর্তে আবদুন নাসেরকে ডেকে দেখ্ কি লাভ হয়। আমি এমন ইতর-মূর্খের কথা কানে না নিয়ে চুপ করে থাকি। সে আস্ফালন করে বলল-

ঃ আমাকে বল দেখি, এখন তোর আল্লাহ্ কোথায়?

আমাকে চুপ থাকতে দেখে সে আবার চেঁচিয়ে বলল-

কোথায় তোর আল্লাহ্? জবাব দে!

এবার আমি অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললাম-

ঃ আল্লাহ্পাক সর্বশক্তিমান এবং উত্তম ব্যবস্থাপক।

এরপর আমাকে শামস্ বাদরানের অফিস থেকে সোজা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পানির সেলে

শামস্ বাদরানের অফিস থেকে বের হবার সময় আমার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। আমি মুহূর্ত কয়েক বসে শ্বাস-নিশ্বাস স্বাভাবিক পর্যায়ে আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার খসে পড়েছে যেন। কিন্তু উপায় নেই জল্লাদরা মানুষের ব্যথা বুঝতে অক্ষম। সাফওয়াত আমাকে টেনে হিঁচড়ে যখন হাসপাতালের শেষ গ্যালারীতে পৌঁছায়, তখন হঠাৎ হাসান খলীল পিছন থেকে বলে-

ঃ সাফওয়াত, ফিরে এস। পাশা জয়নবকে ডাকছে। ফলে আবার শামস্ এর আদেশে ফিরতে হল। অফিসে ঢুকেই আমি সামনে বোন হামিদা কুতুবকে দেখতে

পাই। আমিতো তাকে দেখা মাত্রই চিনেছি কিন্তু আমার শারীরিক কাঠামো বিগড়ে গেছে বলে তিনি দেখা মাত্রই আমাকে চিনতে পারেননি। ক্ষিধেয়, পিপাসায়, তার উপর প্রতি মুহূর্তের এই অকথ্য নির্যাতনে আমার শরীর, চেহারা এবং গায়ের রং-বর্ণ সব বিগড়ে গিয়েছিল। শামস্ বাদরান মুহতারেমা হামীদা কুতুবকে জিজ্ঞেস করল–

ঃ এ কি জয়নব আল-গাজালী?

প্রশ্ন শুনে হামীদা আমাকে গভীরভাবে দেখে ম্লান স্বরে বলল–

ঃ হ্যাঁ।

আমার তখন অচেতন অর্ধচেতন অবস্থা। এজন্যে বোন হামীদা কুতুবের সাথে জিজ্ঞাসাবাদ এবং কথোপকথনে বিস্তারিত মনে রাখতে পারিনি। তবে কোন কথা শুনে মনে হচ্ছিল শামস্ বাদরান বোন হামীদা কুতুবের কাছে বোন ঈসা ফাতেমা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল। তিনি আমার সেলের পাশের সেলেই ছিলেন।

হামীদা কুতুব যখন শামস্ বাদরানের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন, তখন সে আমাকে বেরুবার আদেশ দেয়।

তার অফিস থেকে বেরুবার সাথে সাথেই আমি পরিপূর্ণ অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে যাই। সাফওয়াত সিপাহী আবদুল মাবুদের মাধ্যমে একজন নার্সকে ডেকে পাঠায়। নার্স একটি শিশির ঢাকনা খুলে আমাকে তা শুকালে পরে আমার চেতনা ফিরে আসে। এরপর জল্লাদ সাফওয়াত আমাকে দাঁড় করিয়ে তার হাতের চাবুক ঘুরাতে ঘুরাতে বলে–

ঃ দ্রুত পায়ে চল-আরো দ্রুত।

চলতে গিয়ে আবার বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে যাই। হুঁশ হতে সে আবার আমাকে দাঁড় করিয়ে দ্রুত চলার হুকুম দেয়। সাথে সাথে সে আমার উপর তার হান্টার ব্যবহার করছিল। আহত শরীরের উপর হান্টারের মার পড়ছিল জ্বলন্ত আগুনের মত। এভাবে উঠতে-পড়তে মার খেতে খেতে আমার লবেজান দশা। জল্লাদের পাগলা চাবুক বড্ড নির্দয়। হে আল্লাহ! এরাও কি তোমার সৃষ্টি মানুষ! বড্ড আজব সৃষ্টি বটে, তারা দু'পা এবং এক চাবুকের উপর ভর করে চলে। এমন সময় কেউ যেন হুকুম করল–

ঃ একে পাঁচ নম্বর সেলে ছেড়ে দাও। অন্য এক হুকুম এল–

ঃ একে পানির সেলে নিয়ে যাও।

সাফওয়াত আমাকে এক কক্ষে ঢুকিয়ে বসতে বলে নার্স ডেকে এনে আমার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেস বাঁধালো।

সেলের দরজা খুললে আমি দরজার পেছনে একটি লৌহ প্রাচীর দেখতে পাই। এর উচ্চতা ছিল বড় গাছের বরাবর। সেই প্রাচীরে তুলে সে আমাকে লাফিয়ে নীচে পড়তে আদেশ দেয়। তার কথা শুনে ভয়ে আমার সারা অস্তিত্বই যেন জমে গেল। এমনকি এক ইঞ্চি নড়ার শক্তিও পাচ্ছিলাম না আমি। প্রাচীরের ওপারে পানির কুপ দেখতে পেলাম। আমি আমার সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সাফওয়াতকে বললাম–

ঃ আমি কোন অবস্থাতেই কাপড় ছাড়বো না। সে ক্রুর হাসি হেসে বলল–

ঃ তুমি শুধু এক কাপড়েই পানিতে নামবে। আমি বললাম–

ঃ আমিতো কেবল একখানা চাদর জড়িয়ে আছি। সে তাচ্ছিল্যের সাথে বলল–

ঃ ঘন্টা খানেকের মধ্যে তো এমনিতেই মরতে হবে। ফুল প্যান্টও খুলে দে।

আমি বললাম–

ঃ কক্ষে গিয়ে আমি তা তোমাকে ফেরৎ দেবো। সে পাল্টা প্রশ্ন করল–

ঃ কোথাকার কক্ষ? আমিতো তোকে এক্ষণি এই কূপে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

আমি বললাম–

ঃ তাহলে তুমি উল্টো দিকে ঘুরে যাও। সে উল্টো মুখো ঘুরে দাঁড়ায় এবং আমি ফুলপ্যান্ট খুলে ফেরত দেই। এভাবে, শামস্ বাদরানের অফিসে আমাকে পাঠানোর সময় যে ফুলপ্যান্ট পরতে দেয়া হয়েছিল, তা ফেরত দিয়ে দেয়া হয়।

এখন আমি শতচ্ছিন্ন পুরানো কাপড় পরে ভাবছিলাম যে, কি করব! সাফওয়াত আমাকে পানিতে ঝাঁপ দিতে বললে আমি রুখে দাঁড়াই এবং বলি–

ঃ না, আমি আত্মহত্যা করবোনা। যদি তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও তো তোমাদেরই তার পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে।

আমি ভাবছিলাম, তারা সত্যি সত্যিই আমাকে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ অবস্থা দেখে তাই মনে হচ্ছিল। কারণ, অস্বাভাবিক নির্যাতন, অকথ্য গালিগালাজ, শাসানো এবং পানির কুপে ঝাঁপ দেয়ার নির্দেশের পিছনে আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, আমার হত্যাই তাদের কাম্য। তারা চাইলে আমাকে ধাক্কা দিয়ে কুপে ফেলে মারতে পারে। এভাবে আল্লাহ্র পথে শহীদ হওয়া ছিল আমার বাসনা। আমি বলছিলাম–

ঃ হে আল্লাহ্, পাক পরওয়ারদিগার। তোমার দ্বীনের পথে শহীদী মৃত্যুকে আমি স্বাগত.... খোশ্ আমদেদ জানাই।

জল্লাদ এসে চাবুক মেরে আমাকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করছিল। কিন্তু আমি নিজ থেকে ঝাঁপ দিতে অস্বীকার করি। আর যায় কোথা, অনবরত চাবুক শ্রাবনের বৃষ্টির মতো আমার পিঠকে রক্তে প্লাবিত করতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত সইতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। তা দেখে সাফওয়াত; সা'দ এবং সাম্বকে নিয়ে ধরাধরি করে আমাকে পানির কূপে নিক্ষেপ করে।

আমি নীচে পড়ে দেখি, পায়ের নীচে কঠিন মাটি। তখন আমার ভুল ভাঙ্গলো যে, এটা পানির কূপ নয় বরং পানির সেল। শাস্তির আর এক জঘন্য পদ্ধতি। আমি আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে বললাম–

ঃ ইয়া রাব্বুল আলামীন। আমি আমার সব ব্যাপার তোমার উপর ছেড়ে দিয়েছি। আমি কেবল তোমারই সন্তুষ্টিই চাই। যতক্ষণ প্রাণ আছে তোমার সন্তুষ্টির পথে অবিচল থাকব। হে আল্লাহ্‌, আমি তোমার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা চাই। তুমি আমাকে ধৈর্য ও সাহস দাও, যেন তোমার পথে চলতে গিয়ে যে কোন বিপদের মোকাবেলা করতে পারি।

এরই মধ্যে সাফওয়াত আমার উপর নির্দয়ভাবে চাবুক মারতে থাকল।

সে চাবুক মারতে মারতে বলল–

ঃ বস।

আমি বললাম–

ঃ এত পানিতে আমি বসবো কেমন করে? এতো অসম্ভব!

অত্যাচারী সাফওয়াত তার মুখ এবং চাবুককে একই সাথে ব্যবহার করে বলল–

ঃ যেভাবে নামাজ পড়তে বসা হয়, ওভাবে বস। আর তা তোর ভাল করে জানা থাকারই কথা। বস···· বসে দেখা জলদি। ····জামাল নাসেরই শুধু ইখওয়ানদের শায়েস্তা করতে জানে····। বস বলছি···· এ-ই মেয়ে শুনছিস কথা?

আমি যখন কোনমতে বসলাম তখন চিবুক পর্যন্ত আমার পানিতে ডুবে গেছে। সাফওয়াত বলল–

সাবধান! চুল বরাবরও এদিক সেদিক নড়াচড়া চলবে না। হাত পা বা শরীরের কোন অংশ নাড়াতে পারবি নে! জামাল নাসের তোকে দৈনিক এক হাজার হান্টার মারার আদেশ দিয়েছে····। তা আমরা তোকে প্রতি নড়ার জন্যে দশবার করে হান্টার মারব।

এই অকল্পনীয় ভয়ানক পরিবেশে এসে আমি এতই ব্যাকুল হয়ে পড়ি যে, দুঃখ-যন্ত্রণার অনুভূতি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলি। অবশ্য পানির পরশ পেয়ে ক্ষতস্থান গুলোর ব্যথা

আরো অনেক গুণ তীব্র হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় আল্লাহ্র বিশেষ মেহেরবানী না পেলে আমি এত দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করতে অক্ষম ছিলাম। যন্ত্রণার তীব্রতায় আমি জল্লাদ সাফওয়াত, সা'দ এবং সাম্বর কথাও ভুলে গিয়েছিলাম। এর উপর সাফওয়াত আবার চাবুক মারতে শুরু করে পরিবেশের তিক্ততাকে আরো প্রবল করে দেয়। সাফওয়াত তার চাবুক চালাতে চালাতে বলল–

ঃ শোন হতভাগী! তুই যদি ঘুমোবার চেষ্টা করিস তাহলে এই চাবুক তোকে জাগিয়ে দেবে; ঠিক এইভাবে অবিচলভাবে বসে থাকবে। ····ঐ যে দরজার ছিদ্র পথ দেখতে পাচ্ছিস তা দিয়ে তোর অবস্থা দেখা হবে। তুই যদি একটু দাঁড়াতে, হাত পা ছড়াতে বা এদিক ওদিক দেখতে চেষ্টা করিস, তাহলে চাবুক তোকে সোজা করার জন্যে তৈরী থাকবে····। আমরা তোকে সেলের ঠিক মাঝামাঝিতে রেখেছি। খবরদার দেয়ালের কাছাকাছি হবার চেষ্টা করবিনা যেন! যদি দেয়ালের কাছে যেতে চাস্তো দশ চাবুক। পা ছড়ালে দশ চাবুক, হাত ছড়ালে····দশ চাবুক···· মাথা নাড়লে দশ চাবুক···। মনে রাখিস, এভাবে দৈনিক হাজার চাবুক পুরণ করা হবে। দেখি তোকে হুজায়বী বা সাইয়েদ কুতুব বাঁচাতে পারে কিনা····মনে রাখিস, এটা নাসেরের জাহান্নাম। তুই আল্লাহ্র নাম নিয়ে সারা জীবন চেঁচালেও কেউ তোকে বাঁচাতে আসবে না। আর যদি সৌভাগ্য বশতঃ আবদুন নাসেরের নাম ডাকিস তাহলে তোর জন্যে মুহূর্তেই বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হবে। বুঝেছিস, আবদুন নাসেরের বেহশত····। যদি না বুঝিস, তাহলে আরও অনেক কঠিন শাস্তি তোর অপেক্ষায় রয়েছে। তুই যদি আমার কথা মানিস তাহলে আমি তোর মুক্তির জন্যে পাশার কাছে সুপারিশ করতে প্রস্তুত আছি। তুই তার কাছে গিয়ে তিনি যেভাবে বলেন, সেভাবে কাজ করবি। তারপর আর কোন দুঃখ নেই, দুশ্চিন্তা নেই। বলতো, তুই কি পাগল। আহম্মক। কার জন্যে, কিসের জন্যে নিজের জীবন নষ্ট করছিস? ইখওয়ানের জন্যে? ওরাতো সব বলে দিয়েছে। এখন ফাঁসির রজ্জু তোর মাথার উপর ঝুলছে।

আমি নির্বিকার বসে বক্বক্ শুনছিলাম। সে আহম্মক, নির্বোধ, মুর্খ এবং গোঁয়ার-দাম্ভিক আমার চেহারার ভাষা বুঝতে অক্ষম ছিল। তাই সে বলে চলল–

আমার আদেশ পালন কর, আমার কথাগুলো খুব ভেবে-চিন্তে নিজের মুক্তির ব্যবস্থা কর···· নয়তো আগামীকাল ভোরে তোর মৃত্যু নিশ্চিত, জয়নব।

এরপরও যখন আমি কোন কথা বললাম না। তখন সে ক্ষেপে উঠে বলল।

জবাব দিচ্ছিস না যে, এ্যা!

তবুও আমি চুপ করে থাকলাম আর সে তার বক্তৃতা জারী রাখল–

ঃ দেখ, খুব সহজ পথ দেখাচ্ছি। আমি তোকে পাশার কাছে নিয়ে যাবো। তুই তাঁকে শুধু এটাই বলবি যে, সাইয়েদ কুতুব ও হাজায়বী নাসেরকে হত্যা করার পরিকল্পনা কিভাবে নিয়েছিল।

এর এসব বাজে কথা আর সহ্য করতে না পেরে আমি সমস্ত শক্তিতে জোর গলায় বললাম–

ঃ সব ইখওয়ানই নির্দোষ নিরপরাধ। আল্লাহ্ শিগ্গিরই তোদের জোর-জুলুমের প্রতিবিধান করবেন। পার্থিব স্বার্থ আমাদের কাম্য নয়, আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই আমাদের পরম কাম্য···· ব্যাস, এরপর যা হবার তাই হবে।

আমার কথা শুনে সাফওয়াত ওখানে দাঁড়িয়ে আধ ঘন্টা পর্যন্ত আমাকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে থাকলো। এরপর যেতে যেতে বলল–

ঃ যাক, আমি তো তোমার দৈনিক শাস্তির আদেশ তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি।

সে চলে গেলে আমি ভাবলাম যে, নড়াচড়া করবই বা কেমন করে? পা ছড়াতে গেলে পানিতে নাক-মুখ ডুবে যায়। সুতরাং দাঁড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কি আর করবো, দশ চাবুক না হয় সইতেই হবে। আমি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে পানিতে উঠে দাঁড়ালাম।

ভেবেছিলাম প্রহরী সিপাহী ঘুমুচ্ছে। ফজরের আযান শুনে আমি দেয়ালে হাত মেরে তায়াম্মুম করে ইঙ্গিতে প্রথমে দু'রাকাত সুন্নাত ও পরে দু'রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করছি এমন সময় দরজা খুলে প্রহরী এসে চাবুক বর্ষাতে লাগলো। আমি তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করে আবার চিবুক ডুবা পানিতে বসে পড়ি। এই পানি এতই ময়লা এবং দুর্গন্ধযুক্ত ছিল যে তা দিয়ে ওজু করা যায় না।

আমি বসে পড়লে দরজা আবার বন্ধ করে দেয়া হয়। আমি 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নেয়মাল ওয়াকীল' বারবার পড়ছিলাম। ক্রমে আমি ঝিমুতে শুরু করি। কিন্তু পানিতে চিবুক ডুবার সাথে সাথে ঝিমুনি বন্ধ হয়ে যায়।

এভাবে প্রতি রাতে প্রহরী সান্ত্র আমাকে চাবুক পেটা করার জন্যে পাঁচ-পাঁচ বার সেলে ঢুকতো। আমার নড়াচড়া যেমন স্বাভাবিক ছিল তেমনি চাবুক মারাও ছিল একান্ত জরুরী।

অপরাধ

চাশ্‌তের সময় অর্থাৎ বেলা ন'টার দিকে সাফওয়াত এসে আমাকে পানির সে'ল থেকে বের কর পাশাপাশি অন্য একটি সে'লে বন্ধ করে দেয়। আমি সে'লের একটি দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে পড়ি। আমার কাছে পাথরের এই কঠিন দেয়ালকেও তখন তুলোর নরম বালিশের মতো কোমল মনে হচ্ছিল। ব্যথা-বেদনা এবং ক্ষিধেয় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়, ক্ষিধেয় আমার পেট জ্বলছিল, আঘাতের ব্যথা আমাকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছিল যেন, শরীরের ক্ষত আর হৃদয়ের ক্ষত মিলে এমন এক অচিন্তনীয় অবর্ণনীয় মর্মান্তিক আজাব সৃষ্টি করেছিল, যার-তুলনা করা সম্ভব নয়।

এই দুঃসহ অবস্থায় সাফওয়াত এক কৃষ্ণকায় শয়তানকে নিয়ে চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে উপস্থিত হয়। সাফওয়াত দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকায় শয়তানকে আদেশ দিল–

ঃ এর সাথে সবচেয়ে জঘন্য কাজে লিপ্ত হও। যদি কোন প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করে সে, তাহলে তাকে বাগে আনার জন্যে রলো এই চাবুক।

এই জঘন্য পৈশাচিক আদেশ শুনে আমি আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে বললাম–

ঃ জান ও ইজ্জত-আবরু রক্ষাকারী হে আল্লাহ্‌! আমি তোমারই দাসী এবং তোমার সন্তুষ্টির পথে অবিচল থাকার প্রতিজ্ঞায় অটল রয়েছি···· আমি আমার দুর্বলতার কারণে তো..র কাছে কমপক্ষে এতটুকু সাহায্য ভিক্ষে চাইছি যে, শয়তানের চক্রান্ত এবং পাপিষ্ঠের হাত থেকে আমার ইজ্জত আবরু রক্ষা কর এবং জালিমের মোকাবেলায় আমাকে সাহায্য কর।

সত্যিই আল্লাহ্‌র কি অপার মহিমা যে, যে ব্যক্তি নিয়োগ করা হয়েছে আমার ওপর অমানুষিক অত্যাচারের জন্যে, যাকে দেখে এবং যার কণ্ঠস্বর শুনে আমার চেতনা প্রায় লুপ্ত হচ্ছিল, সেই ব্যক্তি আমাকে 'খালা আম্মা' বলে ডাকলো। আমি বিস্মিত হয়ে তার দিকে দৃষ্টি ফেরাই। তার চেহারার সেই বীভৎসতা আর নেই এখন। অদ্ভুত এক আলোর আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চোখমুখ। সে পরিষ্কার কণ্ঠে বলল–

ঃ খালা আম্মা, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। ওরা যদি আমাকে কেটে টুকুরো টুকরো করে ফেলে, তাও আমি আপনাকে বিন্দু পরিমাণ দুঃখ দেবনা। আমি আনন্দাবেগ আপ্লুত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললাম–

ঃ আমার ছেলে·····বাপ্‌ আমার! আল্লাহ্‌ তোমাকে হেদায়াত দান করুন। ····আল্লাহ্‌ তোমাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

হঠাৎ এক ঝটকায় সেলের দরজা খুলে গেল। সাফওয়াত সেই লোকটির উপর চাবুক মেরে বলে চলল–

ঃ অভিশপ্ত কুত্তার বাচ্চা! তুই আমার হুকুম পালন না করে নিজকে বিপদে ফেলেছিস। আমি এক্ষুণি তোকে 'কোর্ট মার্শালে' পাঠাচ্ছি····· কুত্তার বাচ্চা! তুই জামাল নাসেরের হুকুম অমান্য করেছিস·····যদি প্রাণ বাঁচাতে চাস্‌তো তোকে শামস্‌ পাশার কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে আমার হুকুম পালন কর। আমি তোকে এক ঘন্টা সময় দিচ্ছি, দেখি তুই কাজ করছিস কিনা, যদি জীবনে বেঁচে থাকার সাধ থাকে তাহলে এক্ষণি শুরু কর।

সাফওয়াত দরজার ছিদ্রপথে এসব হুকুম দিয়ে চলে যায়।

সিপাহী সে'লের ভিতর থেকেই সাফওয়াতকে স্যালুট করে বলল–

ঃ হুজুরের হুকুম শিরোধার্য।

আমি ভয়ে ভয়ে আরো বেশী করে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে এই আশু বিপদ থেকে রক্ষার জন্যে তাঁর সাহায্য চাইলাম। ভেবেছিলাম নতুন হুকুম পেয়ে এবং নিজের জানের স্বার্থে এবার সেই সিপাহী আমার উপর অত্যাচার করতে বাধ্য হবে। এবার হয়তো সে ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু না! সে সত্যিই বীরত্বের পরিচয় দিল। সে নিস্পাপ শিশুর মত হেসে আমাকে জিজ্ঞেস করল–

ঃ মা, ওরা তোমার সাথে এ নিষ্ঠুর ব্যবহার করছে কেন?

আমি তাকে বুঝালাম–

ঃ বাবা, আমরা মানুষকে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সত্য ও শান্তির পথে আহ্বান করি এবং দেশের ও জনগণের কল্যাণের জন্যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের দাবী জানাই। আমরা নিজেদের জন্যে কোন ক্ষমতা বা সম্পদ চাইনে। অত্যাচারীদের দৃষ্টিতে এটাই আমাদের অপরাধ।

জোহরের আজান শুনে আমি দেয়ালে হাত মেরে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করি আমি দোয়ার জন্যে হাত উঠালে সে তার জন্যেও দোয়া করার অনুরোধ জানায়। আমি তার সার্বিক মঙ্গলের জন্য দোয়া করি এরপর সুন্নাত নামাজের জন্যে দাঁড়ালে সে আবার বলল–

ঃ খালাজান, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর, যেন আমিও নামাজী হতে পারি·····খালাজান, মনে হয় তোমরা যেন মানুষ নও, তার চেয়ে বড় কোন কিছু তোমাদের এরা নাহক দুঃখ দিচ্ছে····হে নাসেরের অনুসারীরা আল্লাহ্‌ তোমাদের সমূলে ধ্বংস করুন।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম–

ঃ তুমি কি অজু করতে জান?

সে বলল–

ঃ জী হা, জানি। আমি আগে নিয়মিত নামাজ আদায় করতাম। কিন্তু এরা আমাকে নামাজ আদায় করতে দেখলে গ্রেফতার করে জেলে আটক করে।

আমি তাকে বললাম–

ঃ বাপ আমার! তোমাকে তারা জেলে আটক করুক বা অন্য কোন দুঃখ দিক, তুমি নিয়মিত নামাজ আদায় করতে থেকো। আল্লাহ্‌ সব সময় তোমার সহায় হবেন।

আমার কথা শুনে তার চোখে মুখে স্বর্গীয় আলোর দিপ্তি ভেসে উঠল। সে উৎসাহের সাথে বলল–

ঃ হ্যাঁ মা, আমি নামাজ পড়ব।

ঠিক সে মুহূর্তেই দরজার ছিদ্র পথে উঁকি মেরে দরজায় লাথি মারতে মারতে এক সিপাহী তাকে সম্বোধন করে বলল–

ঃ এ-ই কুত্তার বাচ্চা, তুই কি করছিস?

সে জবাবে বলল–

ঃ তিনি যে এখনও নামাজ সেরে উঠেননি····তখন সিপাহীটি হাতে তালি মেরে বলল–

ঃ সাফওয়াত আসছে···· সেই আমাকে পাঠিয়েছে তোকে পরীক্ষা করার জন্যে।

একটু পরে সাফওয়াত পাগলা কুকুরের মত ভিতরে ঢুকে সেই সৈনিক ছেলেটির উপর চাবুকের প্রহার শুরু করলো। সে চাবুকের ভীষণ প্রহারে অতিষ্ট হয়ে বেঁহুশ হয়ে পড়ে। অন্য এক জল্লাদ এসে তাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায় এবং সেলের দরজা আবার বন্ধ হয়। কেবল আমার জন্যেই, আমাকে একটু শান্তি ও আরামের সুযোগ দেয়ার জন্যেই ছেলেটির উপর এমন উৎপীড়ন চলল বলে আমি যারপরনাই দুঃখিত

হলাম। সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে সন্ধান লাভ করে, সত্যদৃষ্টি লাভ করে এবং জালিমের নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানায়। যে জালিমদের অত্যাচারে আমি ধুঁকেধুঁকে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলাম, সে তাঁদের নিন্দা ও সমালোচনা করে। আর তাই তাকে বরণ করতে হলো মর্মান্তিক শাস্তি। এই দুঃসহ দুঃখ বোধের মধ্য দিয়েই আদায় করলাম সেদিনের আসরের নামাজ।

আবার পানির সে'লে

সূর্যাস্তের সাথে সাথেই সামরিক কারাগারের জল্লাদরা কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। তাদের ক্রুর নিষ্ঠুর অট্টহাসিতে কেঁপে ওঠে কারাগারের কঠিন চার-দেয়াল। সর্বনাশা আঁধারের মেঘ হয়ে ওঠে আরো ঘনিভূত আরও শংকাময়।

ওরা আমাকে রাতের অন্ধকারে আবার পানির সে'লের দিকে নিয়ে চলে। ক্ষিধেয় আমার পেট জ্বলছিল, পিপাসায় ছাতি ফাটার উপক্রম আর চাবুকের ঘা আমার সমস্ত অস্তিত্বকে বিষময় করে রেখেছিল। ক্লান্তিভরা এ অবস্থাতেই আমার ঘুম এসে যায়। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখি যে, কুচকুচে কালো রেশমের উপর মনিমুক্তা খচিত পোষাক পরিহিত বেশ কিছুলোক অতি মূল্যবান সোনা-রূপার পাত্রে উৎকৃষ্ট ফল খেতে এবং উত্তম পানীয় পানে ব্যস্ত। অঢেল খাদ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ তাদের দস্তরখানা। স্বপ্ন দেখার সাথে সাথে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং ক্ষুৎপিপাসার কথা একেবারে ভুলে যাই। বিন্দুমাত্র ক্ষিধে বা পিপাসা অনুভব হচ্ছিল না আর। মনে হচ্ছে যেন এক্ষণি খেয়ে উঠেছি। এই অভাবিতপূর্ব অনুভূতির জন্যে আল্লাহ্‌কে অশেষ শুকরিয়া জানাই। আমি পুরো তিনটি দিন এভাবে একাকী কিছু না খেয়ে পানির সে'লে আকণ্ঠ ডুবন্ত অবস্থায় আটক থাকি। এরপর সাফওয়াত এসে পানিতে নেমে আমাকে জোরে ধাক্কা দিতে দিতে বলল–

ঃ নিজের ঔদ্ধত্যের উপর আর কতদিন অটল থাকবি? আমি বলছি, সব কথা আমাদের বলে দিয়ে এ থেকে মুক্তি অর্জন কর। কিভাবে সাইয়েদ কুতুব এবং হুজায়বী নাসেরকে হত্যার পরিকল্পনা নেয় তার পুরো ঘটনা বলে দে। আর তুই আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইলকে নাসেরের হত্যার হুকুম দেয়ার কথা বলেছিলি....ইত্যাদি সব বলে দিচ্ছিসনে কেন?

আমি তাকে বললাম–

ঃ এসব কথা একবারে অবাস্তব। যে ঘটনা আদৌ ঘটেনি, আমি সে ব্যাপারে কি বলব?

আমার জবাব শুনে সে গালি দিতে দিতে ফিরে যায়। এর ঘন্টা খানেক পর

সাফওয়াত ফিরে এসে আমাকে পানির সে'ল থেকে বের করে পাশের অন্য একটি সে'লে আটক করে চলে যায়। এ সে-ই সে'ল, যেখানে সাফওয়াত আমার উপর জঘন্যতর আচরণ করার জন্যে এক সিপাহীকে আদেশ দিয়েছিল। ওকথা ভেবে আমি শংকায় কেঁপে উঠি এবং আল্লাহ্‌র কাছে ইজ্জত-আবরু রক্ষার জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করি।

একটু পরে সাফওয়াত ইব্রাহীম এক সামরিক অফিসারের সাথে আবার এলো, সে বলল–

ঃ অফিসার তোমার সাথে কথা বলবেন।

অফিসার সাফওয়াতকে যেতে বলে আমার উদ্দেশ্যে বলল–

ঃ তুমি নিজের কল্যাণ এবং স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হও; এটা কি তোমার জন্যে উত্তম নয়? জান, যারা জালিম-অত্যাচারী তারা কোন আল্লাহ্ খোদা মানে না। আল্লাহ্‌কে তারা ভয় করে না। তা তুমি জান, সেই সৈনিকের কি পরিণাম ঘটেছে? হ্যাঁ সেদিন সে তোমাকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে হুকুম অমান্য করেছে বলে তাকে গুলি করে মারা হয়েছে। এখন এরা তোমার জন্যে অত্যন্ত অসভ্য এবং অপরাধ প্রবণতায় অভ্যস্ত লোকদের একটি গ্রুফ তৈরী করছে। আমার অনুরোধ, তুমি এদের কথা মেনে নিয়ে এসব অসভ্য বর্বরদের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা কর। হাসান হুজায়বী·····সাইয়েদ কুতুব·····এবং আবদুল ফাত্তাহ্ ইসমাইল সবাই নিজ নিজ ভুলের জন্যে দায়িত্বশীল।

আমি এই অফিসারের সংবেদনশীল কথা শুনেও চুপ করে থাকি। আমি এর কথাকেও উদ্দেশ্যমূলক প্রতারণা এবং আমাকে ব্ল্যাকমেল করার আর এক চক্রান্ত বলে মনে করেছিলাম। সত্যিসত্যিই যে এক ভয়ানক এবং লোমহর্ষক নির্যাতন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, এ সম্পর্কে আমি উদাসীন ছিলাম।

সামরিক অফিসারটি····সম্ভবতঃ মনক্ষুন্ন হয়ে বলল–

ঃ তোমার যা মর্জি কর সাফওয়াত····· এ সত্যিই অনড় দেখছি····।

সাফওয়াত ভিতরে ঢুকে অভ্যাস বশতঃ প্রথমে আমাকে খুব গালি দিল; এরপর বলল–

ঃ আবদুন নাসের শয়তানদের একটি দল পাঠিয়েছে। ওরা তোকে কেটে চিরে খতম করে ছাড়বে। তুই ওদের হাত থেকে কতক্ষণ নিজেকে বাঁচাবি? সময় কেটে যাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে তুই মৃত্যু গহবরের নিকটতর হচ্ছিস।

এরপর সে সে'লের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয়।

আসরের নামাজের পর ওরা আমাকে আবার পানির সে'লে পাঠিয়ে দেয়। তিন দিন সেই ভয়ঙ্কর সে'লে কাটানোর পর চতুর্থ দিন সাফওয়াত এসে আমাকে পানি থেকে বের করে অন্য সে'লে বন্দী করে। সেদিন বিকেলেই আসরের পরে আবার পানির সে'লে পাঠানো হয় এবং পঞ্চম দিন বেলা ন'টা পর্যন্ত ওখানেই পানিতে পড়ে থাকি। এভাবে প্রতিদিন এক সে'ল থেকে অন্য সে'লে পাঠিয়ে আমাকে মানসিক এবং দৈহিক যন্ত্রণা দেয়া হচ্ছিল।

আমার সে'লে পতঙ্গের লাশ

আমার শরীর এবং মন কোন দিক থেকেই অক্ষত ছিল না। অত্যাচার নির্যাতনের এই অব্যাহত ধারাবাহিকতা রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষে কতটুকু সহ্য করা সম্ভব? এই নির্যাতনের কোন নজীর নেই। শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিক থেকে প্রচণ্ড অত্যাচার। চাবুক, হান্টার-গালিগালাজ-প্রবঞ্চনা-শাসানী এ সবই নিত্য দিন রুটিনের; মতো আমার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর যারা আমাকে এই অমানুষিক দুঃখ কষ্টে জর্জরিত করছিল তারাও আমার-ই মতো মানুষ। রক্তমাংস-হৃদয় সবই তাদের আছে। কিন্তু পরিবেশ ও প্রশিক্ষণ তাদেরকে এমন করে দিয়েছে যে, আসলে আজ তাদেরকে মানুষ বলেই মনে হয় না। দেখতে-শুনতে তারা হাত-পা বিশিষ্ট মানুষের মত। কিন্তু আসলে তারা মানুষের রূপে এক আলাদা ভয়ঙ্কর জীব। মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এক জঘন্য ভয়ঙ্কর জীব। মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এক জঘন্য সৃষ্টি। তাদেরকে বানানোর উদ্দেশ্যটাও কি আলাদা?

আমাকে পানির সে'ল থেকে উঠিয়ে আবার পাশের সে'লে পৌঁছানো হয় এবং সেখানে সদ্য তেল মাখানো সাফওয়াতের চাবুক আমাকে অভ্যর্থনা জানায়। সে চাবুকের তালে তালে বলল-

ঃ আজ তোমার সাথে যে আচরণ করা হবে তা কেউ কুকুরের সাথেও করে না।

এই বলে সে দরজা বন্ধ করে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর হামজা বিসিউবি সাফওয়াত এবং দু'জন সিপাহী সে'লে প্রবেশ করে।

হামজা অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে দিতে বলল- হুজায়বি, সাইয়েদ কুতুব, আবুদল ফাত্তাহ ইসমাইল প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ ভুল স্বীকার করেছে এবং

তাদের স্বীকৃতিও দিয়েছে। হুজায়বীর কাছ থেকে এটাও জেনেছি যে, সে আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইলের মাধ্যমে বলে পাঠিয়েছে যে, নাসেরকে খুন বৈধ-কারণ সে কাফের।

একথা শুনে তার রক্ত চোখে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছিল। অগ্নিশর্মা হয়ে বলল–

তোর জানা উচিৎ যে, আমি তোর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নিয়েই ছাড়ব। বল···· বলবি কি-না?

এরপর সাফওয়াতকে নির্দেশ দিলেন–

ঃ সাফওয়াত, এদের কাজ বুঝিয়ে দাও। আর সিপাহীদের দিকে ইঙ্গিত করলেন–

ঃ কোনও কুত্তার বাচ্চা যদি নির্দেশিত কাজে ফাঁকি দেয় বা হুকুম অমান্য করে তাহলে তাকে আমার অফিসে পাঠিয়ে দেবে।

এরপর সাফওয়াত সিপাহীদেরকে অত্যন্ত কদর্য ও কুৎসিৎ ভঙ্গিতে কুকর্মের আদেশ দিতে শুরু করে। তার কথা লজ্জা-শরমের শেষ সীমাকেও ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছিল।

এক সিপাহীকে সে আদেশ দিল–

ঃ দরজা বন্ধ করে নিজের কাজ করে যাবি। বুঝলি কুত্তার বাচ্চা। ·····আর যখন তোর কাজ শেষ হবে তখন তোর সাথীকে পাঠাবি একই কাজ করার জন্যে···· বুঝলিতো।

এই আদেশের পর সে ফিরে যায়।

সিপাহীটি যখন ক্রমে আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন আমি পূর্ণ শক্তিতে চিৎকার করি–

ঃ খবরদার! এক পাও এগুবিনা আর। যদি তুই সামনের দিকে আসার চেষ্টা করিস তো আমি তোকে মেরে ফেলব····মেরে ফেলব····বুঝেছিস। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ক্ষুধার্ত জন্তুর মতো এগিয়ে আসছিল। এরপর আমার এতটুকু মনে আছে যে, আমি লাফিয়ে পড়ে দু'হাতে তার কণ্ঠ চেপে ধরি, আবার পুরো শক্তিতে 'বিসমিল্লাহি-আল্লাহ আকবার' বলে তার কণ্ঠে জোরে দাঁত বসিয়ে দিই। হঠাৎ সে আমার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার মুখ থেকে সাবানের ফেনার মতো ফেনা বেরুচ্ছিল। সে আমার পায়ের কাছে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল।

আমি ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর। প্রতিদিন মার খেয়ে ক্ষতবিক্ষত অসহায় নারী

হওয়া সত্ত্বেও বীরের মতো দাঁড়িয়েছিলাম। শুধু ঈমানের বলে বলীয়ান হয়েই, আমি এত বড় শক্তিমান এক হিংস্র পশুকে যমের মুখে ঠেলে দিতে পেরেছি। সে সময় আল্লাহ্ আমার দুর্বলতা ক্লিষ্ট শরীরে কোত্থেকে যে এত শক্তির সঞ্চার করে দেন তা ভেবে আজও বিস্মিত হই।

সত্য-মিথ্যোর এই যুদ্ধেও মিথ্যের পরাজয় হলো। এটা সত্য ও ঈমানের জয় ছিল। সত্যিকার মুসলমানের জন্যে আল্লাহ্র সাহায্য এভাবেই আসে। মিথ্যের অনুসারীরা যত শক্তিশালী হোক না কেন সত্য পথের নিরস্ত্র এক মুসলমানের সামনে তা টিকতে পারে না। চাই শুধু অটুট মনোবল ও দৃঢ় আত্মবিশ্বাস।

হে খোদা, কতো দয়াময় মেহেরবান তুমি। তোমার অশেষ শোকর।

আল্লাহ্র দ্বীনের বিরুদ্ধে ওরা সব সময় যুদ্ধ করতে এসেছে কিন্তু সাফল্য অর্জন করেছে কেবল ঈমানদাররাই। সত্যিকারের ঈমানদার ব্যক্তি কোন দিন ব্যর্থ হবে না।

কিছুক্ষণ পরে সে'ল খুলে জল্লাদের সর্দার হামজা বিসিউবি সাফওয়াত ও অন্যান্য সিপাহীরা ভিতরে আসতেই তাদের দৃষ্টি ভূলুণ্ঠিত সেই জন্তুর উপর পড়ে। ওর মুখ তখনো ফেনায় ডুবন্ত ছিল।

এ অবস্থা দেখে আল্লাহ্র শত্রুরা থ' হয়ে গেল। তারা বোবার মতো বাকশূন্য; পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এরপর সবাই ভেজা বেড়ালের মতো লেজ গুটিয়ে সরে পড়লো। যেতে যেতে আমাকে আবার পানির সে'লে বন্ধ করে গেল।

ইঁদুরের পাশ থেকে পানির দিকে

একধারে পাঁচ দিন পর্যন্ত আমি পানির সে'লে আবদ্ধ থাকি। ষষ্ঠ দিন আমাকে পানির সেল থেকে বের করে পাশের সে'লে পৌঁছানো হয়।

অনাগত ঘটনাবলীর অপেক্ষায় আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গার উপক্রম হচ্ছিল। এই সে'লেও আমার উপর নানারকম জুলুম অত্যাচারের পাহাড় ভাঙছিল। আমি সব জুলুম থেকে উদাসীন হয়ে আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন থাকি। সে'লের দেয়ালে ঠেস দিয়ে আমি সারাক্ষণ বসে থাকি।

হঠাৎ আমি অনুভব করলাম, মাথার উপর কিসের যেন খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। উপরে চোখ তুলে দেখি, ভেন্টিলেটারের পথ দিয়ে থলের মুখ খুলে শত-সহস্র ইঁদুর

আমার সে'লে পাঠানো হচ্ছে। কি এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। আমার রক্ত যেন হিম হয়ে আসছিল। আমি এই দোয়া পড়তে শুরু করলাম,

আউজু বিল্লাহি মিনাল খুব্‌ছে অল খাবায়েছে, আল্লাহুম্মা আসরিফ আন্‌নী আস্‌সূ বিমা শি-ইতা ও কাইফা শি-ইতা-

"আমি প্রতারণাকারী নারী ও পুরুষের প্রতারণা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্‌, আমার নিকট থেকে সকল বিপদ- সে বিপদ কোথায় এবং কেমন তা তুমিই জান-দূর করে দাও।"

এই দোয়া পড়তে পড়তে জোহরের নামাজের আযান হল। তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করে আবার আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল হয়ে পড়ি। এভাবে আসরের আযান হয় এবং আসরের নামাজও আদায় করি।

এ সময় সাফওয়াত এল। সে সে'লে প্রবেশ করার আগেই সব ইঁদুর ভেন্টেলেটারে পথে পালিয়ে গেছে। সে অবাক হয়ে কক্ষময় দৃষ্টি বুলাতে লাগল। সে বুঝেই উঠতে পারছিলনা যে, এতো সব ইঁদুর গেল কোথায়? সে কিছু ভেবে কুলকিনারা না পেয়ে আমাকে অস্পষ্টভাবে গালি দিতে দিতে পানির সে'লে বন্ধ করে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে রিয়াজকে নিয়ে সে আবার ফিরে আসে। রিয়াজ পদস্থ অফিসার। সে সে'লের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছিল। সে বলল-

ঃ ইখওয়ানের সংগঠন নাসেরের হত্যা, ক্ষমতা দখল এবং সরকার পরিবর্তনের চেষ্টা করছিল।

আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে প্রতিবাদ করলাম-

ঃ সবই বাজে কথা, মিথ্যে। কুরআন ও সুন্নাহ্‌ মোতাবেক যুবকদের গড়ে তোলার জন্যে আমরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলাম। ইসলামকে বুঝে শুঝে তারপর আমরা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের চেষ্টা চালাতাম।

ঃ এখনো তুমি সে কথাই বার বার বলছ····? এবার তাহলে বুঝবে যে···· শাস্তি কাকে বলে। যা এতদিন ভুগেছো তাতো শুধু প্রাথমিক পর্যায়ের শাস্তি ছিল। এরপর সে চলে গেল আমি পানিতেই পড়ে রলাম। এভাবে আট দিন পড়ে রলাম সেই বদ্ধ পানির সে'লে। কি দুঃখ দুর্দশা আর অস্থিরতার মধ্যে কাটছিল সেসব দিন, তা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। তখন আমাকে দেখে যে কেউ শোকগাথা রচনা করতে পারতো।

নবম দিনে রিয়াজ, সাফওয়াত এবং উর্দি পরিহিত একজন অফিসার এসে আমাকে সেই ময়লা দুর্গন্ধময় পানি থেকে বের করে। রিয়াজ আমাকে ধমক দিয়ে বলল–

ঃ এটা তোমার মুক্তির শেষ সুযোগ। হয় সব স্বীকার কর না হয় মৃত্যু বরণ কর। তোমার আল্লাহ্র কাছে জাহান্নাম আছে তা ঠিক···· কিন্তু এখানে আবদুন নাসেরের কাছেও জাহান্নাম আছে এবং জান্নাতও আছে। জামাল নাসেরের জান্নাত ও জাহান্নাম তোমার আল্লাহ্র জান্নাত-জাহান্নামের মত কল্পিত বিষয় নয় বরং এটা সাক্ষাৎ বাস্তব।

ওরা আমাকে পানির সে'ল থেকে বের করে পার্শ্ববর্তী অন্য একটি সে'লে বন্ধ করে চলে যায়। আমি আল্লাহ্র কাছে এসব লোকের অনিষ্ট থেকে মুক্তি কামনা করি।

আমি মোনাজাতে ব্যস্ত থাকা কালেই সাফওয়াত ও হামজা বিসিউবি দশজন সিপাহী এবং একজন অফিসারসহ সে'লে প্রবেশ করে। সাফওয়াত হামজাকে জিজ্ঞেস করলো–

ঃ পাশা! এই মেয়ের ব্যাপারে আপনার হুকুম কি? জবাবে হামজা সিপাহীদের শুনাল-তোমরা কি খাবে?

ঃ সিপাহীগণ জানাল, চা খাবো।

হামজা রেগে বলল–

ঃ আরে ধ্যাৎ! চা' খাবি; কুত্তার বাচ্চারা; চা নয়, হে সাফওয়াত, এদেরকে মদ, চরস, হাসীস এনে দাও–এছাড়া যা চায়, এনে দাও এবং ওকে এদের হাতে ছেড়ে দাও। এরা ওর সাথে যা চায় তা করুক, আমি আমার পক্ষ থেকে পুরোপুরি সমর্থন জানালাম।

এরপর তারা সে'ল বন্ধ করে চলে যায়। আমি সে'লে আসরের নামাজ আদায় করছিলাম। সিজদাতে থাকতেই হঠাৎ সাফওয়াত এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে বের করে পানির সে'লে নিয়ে বন্ধ করে দেয়।

রিয়াজ ফিরে এসে বলল–

ঃ তুমি পাক-পবিত্র থাকতে চাইছো? তোমাকে শায়েস্তা করার জন্যে ওসব সিপাহীকে বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছে। ওরা সব হোষ্টেলে গেছে। আগামী কালই আসবে এবং তারা তোমার গোশত্ ছিঁড়ে খাবে। হাসপাতালে ওদেরকে বিশেষ

ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে। ওরা এখন উম্মাদ কুকুরের মতো হয়ে আছে। এ সবকিছু প্রেসিডেন্ট নাসেরের আদেশে করা হয়েছে। নাসের তোমাকে জিন্দা ছাড়বেনা। আমরা সবাই তোমাকে বুঝাবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। কত কষ্ট করে তোমাকে বুঝাতে চেয়েছি, কিন্তু তুমি নিজের জিদ ছাড়নি। এখন তুমি পাক-পবিত্র থাকবে কেমন করে বলতো? বল, জবাব দাও! তোমার হান্টার কোথায় সাফওয়াত? সাফওয়াত আমাকে মারতে শুরু করে এবং রিয়াজ তাকে আরো মারার জন্য উস্কানি দিতে থাকে।

ঃ সত্যাগ্রহী মেয়ে! তুমি বুঝি মনে কর, তোমার মৃত্যুর ৩০ বছর পরে তোমার স্মৃতিতে লোকেরা মসজিদ-মাজার তৈরী করে কারাগারে তোমার মহৎ কীর্তির স্বীকৃতি দেবে এবং বলবে যে, এ-ই সেই জয়নব আল-গাজালীর স্মৃতি সৌধ, যিনি কারা নির্যাতনের শেষ সীমায় পৌঁছেও নিজের ঈমানী নীতিতে অটল ছিলেন....? কিন্তু তোমার জেনে রাখা উচিৎ আমরা তোমার সাথে কি আচরণ করছি এবং আরো করবো তা মানুষ তো দূরের কথা শয়তানও টের পাবে না।

ব্যথা-যন্ত্রণায় কাতর সত্ত্বেও ওর কথা শুনে আমার মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল। আমি তার মিথ্যে দর্প ও গর্বকে চূর্ণ চূর্ণ করার জন্যে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললাম–

ঃ তুমি যা বলছ তা সত্য হতো তাহলে আল্লাহ্পাক আমাদেরকে তোমাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন না; তোমাদের কথামত আবদুন নাসেরের তথাকথিত জাহান্নামে বসেও হাসতে পারতাম না, আল্লাহ্ আমাকে এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করার শক্তি দিতেন না....। বস্তুতঃ আমরা সত্যসন্ধানী। আমরা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করি। ইনশাআল্লাহ্ আমরা সাফল্যমন্ডিত হবো এবং যাদেরকে তোমরা আমার গায়ের গোশত্ কামড়ে খাওয়ার জন্যে তৈরী করেছো তাদের বিষ দাঁত ভেঙ্গে পড়বে।

আমার স্পষ্ট কথা শুনে রিয়াজ শংকিত চোখে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। সাফওয়াত তখন একটু দূরে কোথাও ছিল। সে সাহায্যের জন্যে তাকে ডাকতে লাগল–

ঃ জলদি এস সাফওয়াত.... এই মেয়ে তো বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছে। ....আর চাই কি, সাফওয়াত বিজলির মতো তেড়ে এসে আমার ক্ষত-বিক্ষত শরীরের উপর শপাং শপাং চাবুক চালাতে চালাতে রিয়াজকে বলল–

ঃ জনাব একে আমার জন্যেই ছেড়ে দিন। কালই দেখে নেবেন যে এর কি অবস্থা হয়েছে।

এরপর তাঁরা প্রতিদিনকার মতো আবার পানির সে'লে বন্ধ করে চলে গেল। দুঃখ যন্ত্রণায় আমার শরীর ও মনের তখন কি শোচনীয় অবস্থা তা কেবল আল্লাহ্ই জানেন। এমন অবস্থায় কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু কেবল ঈমানের জোরেই আমি বেঁচে রয়েছি।

দেশের দুরাবস্থার জন্যে ভীষণ দুঃখ হলো আমার। অত্যাচারী শাসকের অধীনে দেশের সঠিক পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অসন্তুষ্ট অশান্ত জনগণ, ক্ষমতা-মদ-মত্ত নিষ্ঠুর শাসকদের সামনে অসহায়; আইন-কানুন বলতে কিছু নেই। ক্ষমতাসীন দল যা মর্জি তা করে বেড়াচ্ছে। দারুন অরাজকতা চলছে দেশময়।

দেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে দেশের দুরাবস্থা দেখে তার তুলনায় নিজের দুঃখ যন্ত্রণাকে বড্ড তুচ্ছ মনে হলো, কিন্তু মানসিকভাবে আমার দুঃখ আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেলো যেন। সমগ্র দেশটাকেই মনে হচ্ছিল বন্দী শিবিরের মতো আর হামজা সাফওয়াত ও রিয়াজরা সারা দেশের নিরীহ জনতার উপর অত্যাচারের ষ্টিমরোলার চালাচ্ছিল। ভয় আতঙ্ক আর সন্ত্রাসের এক অদ্ভুত রাজত্ব চলছে। এসব লোক একই গোষ্ঠীর পৃথক পৃথক নাম মাত্র। জাতে-স্বভাবে এরা প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে জল্লাদ পর্যন্ত একই প্রকৃতির। এরাই দেশকে, দেশের জনগণকে লুণ্ঠন করছে; শোষণ করছে এবং বিদেশী শক্তিবর্গের সাথে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের বিকিকিনি করছে।

হায় দেশ! আমার হতভাগ্য দেশ····না-না বলছি, হতভাগ্য হবি কেন তুই! কারণ তোর সন্তাদের কাছে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহর অমূল্য সম্পদ। তাওহীদ রিসালাতের নীতিকে সামনে রেখে তারা পুনর্জাগরণে বদ্ধপরিকর। আমার মতো বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা শেষ হয়ে গেলেও····এগিয়ে আসছে নবীন তরুণের দল। তাদের বিজয় পতাকা তোর বুকে আল্লাহ্র দ্বীন কায়েমের প্রতিশ্রুতিতে সমুন্নত। আজ না হয় শয়তানের রাজত্ব চলছে, কিন্তু অদুর ভবিষ্যতে তোর বুকে কায়েম হবে আল্লাহ্র শাসন, আজকের অন্ধকার কেটে গিয়ে কাল উদয় হবে নতুন যুগের সোনালী সূর্য্য···· মানুষ আবার তার প্রকৃত প্রভুর দরবারে হবে সিজদাবনত।

পানি থেকে এটর্নির দিকে

বারবার একই ধরনের ঘটনাবলী উল্লেখ করছি বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু যা যেভাবে ঘটেছে তা যথাযথ তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় না। এজন্যে সব ঘটনা অনেকটা একই ধরণের হলেও তুলে ধরছি।

আমরা যখন কারাগারে এসব অত্যাচার সহ্য করছি তখন আমার দেশ মিশরের কি অবস্থা? বলতে পারেন, দারুন দুরাবস্থা। জনগণ সদা সন্ত্রস্ত; কারো জীবনে কোন নিরাপত্তা নেই। সর্বত্র জোর-জুলুম আর অত্যাচারের জয় জয়কার। যারা সে'লের বাইরে ছিল, তারা আরো বেশী শংকিত। লুট-তরাজ, হত্যা, রাহাজানী, ছিনতাই চলছিল সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়। ভাড়াটে গুন্ডা এবং অসৎ দৃষ্কৃতকারীদেরকে সর্বত্র মোতায়েন করা হয়েছিল জনগণকে শায়েস্তা করার জন্যে। তাদের লাগামহীন উপদ্রবে জনসাধারণের জান-মাল ইজ্জত-আবরু হয়ে পড়েছিল মূল্যহীন। সততা-সভ্যতার কোন অর্থ তারা বুঝতোনা। মান-মর্যাদা বা শিক্ষা-দীক্ষার কোন দাম ছিল না তাদের কাছে। চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিকসহ, সাংবাদিক, কবি, আলেম, শিক্ষক, জননেতা এমনকি সৎপ্রকৃতির সামরিক অফিসাররা পর্যন্ত ওসব দুর্বত্তদের হাতে লাঞ্ছিত অপদস্ত হচ্ছিল। কিন্তু কারো মুখে টু-শব্দ বের করার উপায় ছিল না। কারণ প্রেসিডেন্ট নাসের নিজেই এসব দুর্বৃত্ত ও সমাজবিরোধী চক্রের নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

কিশোর, নবীন, বুড়ো, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের শান্তিকামী প্রতিটি নাগরিকই এভাবে নাজেহাল হচ্ছিল। সম্ভ্রান্ত লোকদের পিছনেও এরা লেলিয়ে দিত। আর কোন ব্যক্তি যদি এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলতো তাকে কোন না কোন অভিযোগে গ্রেফতার করে চাবুক-হান্টার মারা হত, কুকুরের ভিড়ে ছেড়ে দেয়া হতো এবং শেষ পর্যন্ত ফাঁসীর কুঠরী পর্যন্ত বেড়িয়ে আসতে হতো। এই ছিল নাসেরের শাসনামলে মিশরের সাধারণ অবস্থা।

যাই হোক নবম দিন খুব ভোরে সাফওয়াত এসে আমাকে পানির সে'ল থেকে বের করে বলল–

ঃ তোমাকে এ্যাডভোকেট অন্নায়াবাতার কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তোমার সাজা হয়ে গেছে। অবশ্য এখনো চাইলে নিজেকে বাঁচাতে পার। এরপর এই বলে ধমক দিল–

ঃ নিশ্চয়ই তুমি আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত রয়েছ। এখন আমরা

দেখবো যে, এ্যাডভোকেটের সামনে তুমি কি বলছ। এসব বলতে বলতে সে আমাকে পশুর মতো টানতে লাগল। আমি তাকে বললাম–

ঃ দেখ আমার পরণের কাপড় একেবারে ছিঁড়ে গেছে। এসব আর পরনের উপযুক্ত নেই। .....আমার অন্য কাপড় এনে দাও আমাকে।

সে আমার কথার বিশেষ কোন গুরুত্ব না দিয়ে বলল–

ঃ তা দেখা যাবে, তবে তুমি যদি হাসান হুজায়বী এবং সাইয়েদ কুতুবের ব্যাপারে বল যে, তারা আবদুন নাসেরকে হত্যা করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছে....তাহলে তোমাকে একখানা চাদর এনে দেব।

আমি বললাম–

ঃ না-না, ওসব মিথ্যে কথা।

তখন সে বলল–

ঃ তাহলে উলঙ্গই থাকগে। দেখি তোমার ইসলাম তোমার লাজ ঢাকতে পারে কিনা! আর ইখওয়ানরাও তোমাকে এ-ই অবস্থাতেই দেখুক।

আমি অসভ্য বর্বরের মুখে এসব কথা শুনে বললাম–

ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অসহায়ের সহায় এবং অত্যন্ত দয়ালু সর্বজ্ঞ এবং সুবিচারক।

আমাকে সামরিক কারাগার থেকে বের করে আলাদা এক বিল্ডিংয়ের প্রশস্ত কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। কক্ষের মাঝামাঝিতে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। পরে জেনেছি তিনি ছিলেন জালাল আদীব। তিনি আমার দিকে এক নজর দেখে বললেন–

ঃ বসুন।

আমি টেবিলের বিপরীত দিকে চেয়ারে গিয়ে বসি। তিনি আলোচনা শুরু করতে গিয়ে বললেন–

ঃ আপনি ইসলামী আন্দোলনের প্রখ্যাত নেত্রী জয়নব আল-গাজালী। আপনি নিজে এমন অভিমত গ্রহণ করলেন কেন? যে অবস্থায় আপনি আছেন তাতে কি আপনি সুখী? দেখুন, আমি মুসলমান এবং আপনার শুভাকাঙ্খী, আপনাকে এই অবস্থা থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই আমি এসেছি। আমার নাম ফকরুদ্দিন আন্‌নায়াবাতা। আমি ভাবতেও পারছিনে যে, জয়নব আল-গাজালীর মতো প্রখ্যাত নেত্রী আমার সামনে এমন অবস্থায় বসে আছেন। আমি যথার্থই আশা করব যে, নিজেকে এথেকে মুক্ত করানোর প্রচেষ্টায় আপনি আমার সহযোগিতা করবেন।

আমি তার জবাবে বললাম–

ঃ দেখুন, যা সত্য এবং যাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট, তা আমি অবশ্যই বলব। আল্লাহ্‌র শপথ করেই আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।

আমার কথা শুনে তাঁর কপালের রেখা কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। তিনি কিছুটা বিরক্তির সাথেই জিজ্ঞেস করলেন–

ঃ বর্তমানে আপনার বয়স কত?

ঃ ১৯১৭ সালের ২রা জানুয়ারী আমি জন্মগ্রহণ করি।

আমার বয়স জেনে তিনি স্তম্ভিত হয়ে বললেন–

ঃ আমি তো আপনাকে দেখে মনে করছি আপনার বয়স নব্বই বছরের কম নয়। উহ্, বলুনতো কেন এই দুরাবস্থায় পড়তে এলেন? এর উত্তরে আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম–

ঃ আল্লাহ্ আমাদের কিসমতে যা রেখেছেন তাতো হবারই কথা। আল্লাহ্ই আমাদের পরম বন্ধু এবং তিনিই প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানের শেষ ভরসা।

তিনি সমবেদনার সাথে বললেন–

ঃ আমার মনে হচ্ছে কথা বলতেও আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমি চুপ করে থাকলাম। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন–

ঃ আপনি এবং আবদুল ফাত্তাহ্ ইসমাইল কোন্ বিষয়ে একমত হয়েছিলেন?

ঃ আমরা যুবকদের ইসলামী প্রশিক্ষণ দান এবং কুরআন ও সুন্নাহ্ শিক্ষা দানের ব্যাপারে একমত হয়েছিলাম। বর্তমান সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের জন্যে তা অপরিহার্য ছিল।

তিনি আমার কথা কেড়ে নিয়ে বললেন–

ঃ দেখুন আমি বক্তৃতা শুনতে আসিনি বরং শুধু বাস্তব ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা চাচ্ছি। জনাব হুজায়বী আপনাকে আবদুল ফাত্তাহ্‌র কাছে একটি পয়গাম পৌঁছাতে বলেন এবং অন্য একটি পয়গাম সৈয়দ কুতুবের কাছে পৌঁছাতে বলেন; ওসব পয়গাম কি ছিল? আমি মনে করি আমার প্রশ্ন খুবই স্পষ্ট। কি বলেন?

আমি এবার বললাম–

ঃ আমি মুর্শিদে আ'ম্ ইমাম হুজায়বীর কাছে যুবকদের সামষ্টিক পাঠ সমাবেশে বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্‌র ভিত্তিতে কয়েকটি গ্রন্থ, যেমন ইবনে হাজম এর মুহাল্লা ইবনে আবদুল ওহাব ও ইবনে

তাইমিয়ার কিতাবুত তাওহীদ এবং সাইয়েদ কুতুবের রচনাবলী পাঠ্যসূচীতে শামিল করার অনুমতি চাই। যুবকদের মধ্যে ভাই আব্দুল ফাত্তাহও শামিল ছিলেন।

এ্যাডভোকেট সাহেব ম্লান হেসে বললেন–

ঃ না জয়নব, এসব কথা নয়, আসল কথা বলুন। নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন। প্রকৃত ঘটনা আমার কাছে খুলে বলুন।

আমি বললাম–

আসল কথা এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী বংশধর তথা মুসলিম মিল্লাতের পূর্নগঠন ও পুনর্জাগরণ।

তিনি এবার জোর দিয়ে বললেন–

ঃ ওরা সবাই ভুল স্বীকার করে আপনাকে বিপদে ফেলে দিয়েছেন। আমি স্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে বললাম–

ঃ আল্লাহ্ আমাকে এবং তাঁদেরকে নিরাপদ রাখবেন। আমরা মিথ্যের দিকে ফিরে যাবো না।

এর জবাবে তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন।

ঃ আমার মনে হচ্ছে আপনি কেবল আপনার বাগ্মিতার শক্তি প্রদর্শনই করে যেতে চাচ্ছেন। আপনি আত্ম প্রবঞ্চনায় ভুগছেন, এমনকি উচ্চতর আদালতও আপনার সাথে কোন মতৈক্যে পৌঁছুতে পারছে না।

আমার তখন সত্যি কথা বলার শক্তি ছিল না। বড্ড কষ্ট হচ্ছিল; কিন্তু তাঁর উচ্চতর আদালতের বয়ান শুনে আমি বলতে বাধ্য হলাম।

ঃ উচ্চতর আদালত যদি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকতো তাহলে·····

তিনি আমাকে বাধা দিয়ে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন–

ঃ আপনি থামুন! এখন দেখছি মিশরের উচ্চতর আদালত সম্পর্কেও আপনি যা তা বলতে যাচ্ছেন·····

এরপর তিনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সাফওয়াতকে ডেকে বললেন–

ঃ কোন লাভ নেই সাফওয়াত! তিনি তো আদালতকেও অপমানিত করলেন।

সাফওয়াত যেন অপেক্ষায় ছিল। সে আমাকে টেনে-হিঁচড়ে এটর্নির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল–

ঃ কোথায় হুজুর?

এটর্নি বদ্দল পানির দিকে। তারপর আবার পানি এবং সাফওয়াতের বিরামহীন অব্যাহত চাবুকের শিকারক্ষেত্রে ফিরে গেলাম। সে এবার নতুনভাবে আরো নিষ্ঠুর নির্দয়ভাবে এবং নির্লজ্জভাবে আমার উপর জুলুম শুরু করল। কিন্তু তার বর্বরতা যত তীব্রতর হচ্ছিল, আল্লাহ্‌র সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়ছিল তার চেয়ে বেশী।

আল্লাহ্ এমন হীন-নিষ্ঠুর-মুর্খ জালিমদের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করুন।

খাদ্য এবং চাবুক

দশম দিন আসরের পর সে'লের দরজা খুলে আমাকে পানি থেকে বের করে অন্য দু'জন জল্লাদের কাছে হস্তান্তর করে বলা হল–

ঃ তিন নম্বর সে'লে রেখে এস।

তিন নম্বর সে'লে গিয়ে আমি নিষ্প্রাণ লাশের মত মাটিতে পড়ে রলাম। আঘাতে আঘাতে ফুলে-ফেঁপে আমার শরীর ফুটবলের মত গোল হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, যেন প্রাণ এই বুঝি দেহের সম্পর্ক ছেড়ে যাচ্ছে। আহ্ উহ্ করার মত শক্তিও তখন আমার নেই। আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র কাছে আমার জান-প্রাণ সমর্পণ করলাম। যাঁর হাতে সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি, সেই মহান আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করে পড়ে রলাম।

এই অচেতন অর্ধচেতন অবস্থায় কতক্ষণ পড়েছিলাম, জানি না। হঠাৎ সে'লের বাইরে ভীষণ হৈ-হল্লা শুনে কোন রকমে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে ছিদ্রপথে বাইরে তাকিয়ে দেখি, ইখওয়ান ভাইদের এক বিরাট জমায়েত লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে পেয়ালা। লাইনের মাথায় এক সিপাহী এক জাতের তরল খাদ্য ওদের পেয়ালায় তুলে দিচ্ছে। ওরা যখন খাদ্য-দ্রব্য নিতে সামনে আসে তখন অন্য এক জল্লাদ প্রত্যেকের পিঠে চাবুক মারে। খাদ্য ও চাবুক একই সাথে প্রদানের এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য এর আগে কেউ কোন দিন হয়তো কল্পনাও করেনি। হায়রে জুলুম।

শুধু তাই নয়। ইখওয়ানদের লাইনের উভয় পাশে সিপাহীদের দু'টি কাতারও চাবুক হাতে দাঁড়িয়েছিল। ইখওয়ানরা পেয়ালায় খাদ্য নিয়ে ফেরার পথে এসব সিপাহীর চাবুকের তীব্র আঘাতও হজম করছিল। এভাবে এক মুঠো অন্নের বিনিময়ে তাদেরকে খেসারত হিসেবে অজস্র চাবুকের আঘাতও সইতে বাধ্য করা হচ্ছিল।

আমি যে লুকিয়ে এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখছিলাম তা এক জল্লাদ টের পায়। আর তৎক্ষণাৎ সে উন্মত্ত জানোয়ারের মতো তেড়ে এসে আমাকে এমন প্রচণ্ড ঘুঁষি এবং লাথি মারতে থাকে যে, আমি আবার অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি।

দুরাচার সাফওয়াত এবং তার এক সহকারী অনেক চেষ্টা করে আমার হুঁস ফিরিয়ে আনে। তার হাতে একটি পাত্রে কালো বর্ণের একটুখানি ডাল দেখা গেল। তা থেকে ভীষণ রকমের দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল। সাফওয়াত আমাকে বলল–

ঃ এসব খেয়ে নাও। না খেলে দশ চাবুক–

আমি বললাম–

রেখে দাও। আমি খেয়ে নেব।

সাফওয়াত তার সহকারীকে বলল–

ঃ দশ মিনিটের মধ্যে যদি সে এসব না খায় তাহলে তাকে দশ চাবুক লাগিয়ে আমাকে খবর দিও।

অত্যন্ত দুঃখ-যন্ত্রণা এবং অস্থিরতার মধ্যে সেই রাতটিও কাটিয়ে দিই।

হাসপাতালে

একাদশ দিনে সাফওয়াত সে'লের দরজা খুলে ভিতর থেকে কাউকে ডেকে বলল–

ঃ ডাক্তার মাজেদ, ভিতরে আসুন।

ডাক্তার মাজেদ সামরিক উর্দিতে তার কম্পাউন্ডার সিপাহী আবদুল মাবুদের সাথে ভিতরে এলেন। তখন আমার পা থেকে রক্ত এবং পুঁজ বেরুচ্ছিল। এছাড়াও সারা শরীরের অবস্থাও ছিল তথৈবচঃ! ঘা-ক্ষত আর তার আনুসঙ্গিক অসহ্য যন্ত্রণা।

ডাক্তার মাজেদ তার সহকারীকে বললেন, এঁর উভয় পা'কে খুব ভাল করে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে এবং পায়ের ভিতর থেকে সব দুষিত রক্ত ও পুঁজ বের করে শিগগির হাসপাতালে পৌঁছাও।

এরপর দু'জন জল্লাদ আমাকে হাসপাতালে রেখে আসে।

আবার শামসের কবলে

মাত্র একদিন আমাকে হাসপাতালে থাকতে দেয়া হয়। আমাকে দৈহিক ও মানসিক আঘাত না দিয়ে তাদের স্বস্তি ছিল না। সুতরাং আবার শাস্তির তীব্রতা শুরু

করা হয়। অবশ্য এবার আমাকে জায়গা বদলে হাসপাতালেরই কারাগারে রাখা হয়। অবশ্য অত্যাচার অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালের কারাগারে আমি অপেক্ষাকৃত শান্তি অনুভব করছিলাম। এজন্যে আমি আল্লাহ্র শোকর আদায় করি। হাসপাতালের কারাগারে থাকার সময় দীর্ঘ হোক, আমি মনে মনে তা কামনা করছিলাম। এতে করে আমার ক্ষত শুকোবে এবং হাড়ের ব্যথা কমতে পারে বলে ভাবছিলাম। কিন্তু হায়! জল্লাদরা আমার সেই সামান্য আশাটুকুও পুরণ হতে দিল না। তারা আমাকে আবার সেই তিক্ত-বিষাক্ত জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিল।

জল্লাদ আমাকে শামস বাদরানের অফিসে নিয়ে চলল। আমি অতি কষ্টে পথ চলছিলাম। নিজের ওজন বইবার ক্ষমতাও আমার ছিল না। কিন্তু ওরা এই অবস্থাতেই আমাকে বেত্রাঘাত করতে দ্বিধাবোধ করেনি। পথ চলায় সামান্যতম শিথিলতা দেখলেই তাদের চাবুক আর হান্টার আমার খবর নিতো। আমি হাসপাতাল থেকে শামস্ বাদরানের অফিস পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতে পারিনি। দুর্বলতার কারণে মাটিতে ঢলে পড়ি। কিন্তু জল্লাদরা আমাকে পড়ে থাকতে দেয়নি। তারা মাটিতে টেনে টেনে আমাকে শামস্ বাদরানের অফিসে পৌছায়।

খুনি জালিম শামস বাদরানের দৃষ্টি আমার উপর পড়া মাত্রই সে সাফওয়াতকে ডেকে রাগের বশে অদ্ভুত সব নর্তনকুর্দন শুরু করে। মনে হচ্ছিল যে ক্যামেরার সামনে অভিনয় করছে। রাগে তার চেহারা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল তার চোখ দুটো দেখাচ্ছিল জ্বলন্ত কয়লার মত লাল। সে সাফওয়াতকে ডেকে বিপরীত দিক থেকে আঙ্গুলের ইশারায় বলল−

একে এক্ষুণি উল্টো করে লটকিয়ে দাও এবং পাঁচশো চাবুক লাগাও।

বর্বরতার উপর চরম বর্বরতা। এমন হিংস্রতা আর নৃশংসতার নজীর কেবল শামস বাদরানরাই দেখাতে পারে।

সাফওয়াত তার প্রভূর নির্দেশ মতো আমাকে লটকিয়ে এক দুই করে পাঁচশো চাবুকের মার পূরণ করতে শুরু করে। আমি অসহ্য যন্ত্রণায় আল্লাহ্ আল্লাহ্ ডাকছিলাম। শামস বাদরান ভেংচি কেটে বলছিল কোথায় তোর আল্লাহ্ যাকে তুই ডাকছিস? আল্লাহ্ যদি বাস্তবিকই থাকতো, তাহলে অবশ্যই তোকে সাহায্য করতো। দেখ তুই আবদুন-নাসেরকে ডাক, এক্ষুণিই সে তোকে সাহায্য করবে। এবার সে আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন সব ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করে যে, কোন মুসলমানই তা সহ্য করতে পারবে না।

পাঁচশো চাবুক পুরো হলে আমাকে নামিয়ে দাঁড় করানো হয়। আমার আহত পা বেয়ে তখন দরদর করে রক্ত গড়াচ্ছে। তা দেখে শামস বাদরান বলল–

একে আরও কঠিন শাস্তি দাও এবং তাই হবে এর পায়ের চিকিৎসা।

একটু পরে আমি দেয়ালে ঠেস দিই এবং অসহ্য শাস্তি ক্লান্তিতে বসে পড়ি। এ দেখে সাফওয়াত পূর্ণ শক্তিতে আমাকে টেনে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সম্ভব হয়নি।

ঠিক তক্ষুণি সামরিক কারাগারের জঘণ্যতম পশু হামজা এসে বলল–

ঃ এসব অভিনয় করা হচ্ছে।

এরপর আর কি হয়েছে, জানিনা। কারণ আমি অচেতন হয়ে পড়ি। আবার যখন জ্ঞান ফিরে পাই, তখন আমি ডাক্তারের পাশে। ডাক্তার আমার বাহুতে ইনজেকশন দিচ্ছিলেন। ইনজেকশন দেয়া হলে ডাক্তার আমাকে এক পেয়ালা কমলার রস খাওয়ানোর জন্যে ওদের নির্দেশ দেন। কিন্তু কে শোনে ডাক্তারের হুকুম। শামস্ বাদরান আমাকে বলে–

ঃ এভাবে জেদ ধরে থেকে কোন লাভ হবে না। আমরা যা চাই, তা কর; নয়তো একবার, দু'বার, তিনবার নয়, বরং শত-শতবার তোমাকে উল্টো লটকিয়ে পিটানো হবে। এটা মনে করো না যে, আমরা তোমার কাছ থেকে কথা বের করতে অক্ষম। আসলে আমরা তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি মাত্র বুঝছো? তোমাকে যদি আমরা জীবিত অবস্থাতেই মাটিতে পুঁতে দিই, তাহলেও কেউ জিজ্ঞাসা করতে আসবে না যে, এমন করলে কেন? কে আমাদের বাধা দেবে?

আমি বললাম–

ঃ আল্লাহ্ যা চান তাই হয়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তাঁরই শোকর আদায় করি।

একথা শুনে সে জ্বলে উঠে বলে–

ঃ এ ধরণের কথা আমার সামনে বলবে না।

হাসান খলীলও আমাকে উপদেশ দিয়ে বলল–

ঃ জ্ঞান-বুদ্ধি খরচ কর মেয়ে। তোকে এখানে বাঁচানোর জন্যে কোন ইখওয়ান কাজে আসবে না। ওরা নিজেরা নিজেদের বিপদে বেসামাল। ওরা তো কোন রকমে মুক্তি পেতে চায়। এরপর সে কাগজ-কলম বের করে পরামর্শের সুরে বলল–

ঃ সাফওয়াত! একে হাসপাতালে নিয়ে যাও এবং সেখানে স্বাধীনভাবে ইখওয়ান সম্পর্কে লিখতে দাও, কেমন করে কিভাবে সে ইখওয়ানদের সংস্পর্শে আসে, তা সে বিস্তারিত লিখবে। আর আবদুন নাসেরকে হত্যার ব্যাপারে কিভাবে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়, তা এবং ইখওয়ানের মধ্যে যাদের নাম জান, সব লেখ।

হাসপাতালে যাওয়ার পথে সাফওয়াত আমাকে জোরে পা চালাতে হুকুম করে। কিন্তু আমার অবস্থা ছিল সদ্য হাটি হাটি পা-পা করছে এমন শিশুর মতো। এজন্যে সাফওয়াত আমাকে চলার পথেই থেমে থেমে চাবুক লাগাতে লাগাতে বলে-

ঃ এ হচ্ছে তোর পায়ের চিকিৎসা।

হাসপাতালের কক্ষ পর্যন্ত আমি কিভাবে যে পৌঁছেছি, তা কেবল আল্লাহ্ই জানেন। সাফওয়াত আমাকে কাগজ কলম ধরিয়ে দিতে গিয়ে বলে-

ঃ রে ক্ষুধে ইখওয়ানী! স্বাভাবিক ভাবেই তুই আমাদের উদ্দেশ্য জানিস। তাই বলছি, কোন দার্শনিকতার দরকার নেই। যা জানিস, তা ঠিক ঠিক লিখে দে। কিভাবে জামাল নাসেরকে খুন করতে চেয়েছিলি এসব লেখ····· বলতে বলতে সে দরজা বন্ধ করে চলে যায়।

আমার উভয় হাতে ফোস্কা পড়েছিল বলে আমার পক্ষে কলম ধরা মুশকিল ছিল। প্রথম দিন এভাবেই কেটে গেল। আমি একটি অক্ষরও লিখিনি। সাফওয়াত লিখিত বক্তব্য নিতে এসে সাদা কাগজ পড়ে থাকতে দেখে বলল-

ঃ তোমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আমি আবার কাগজ রেখে যাচ্ছি। সে যেমন এসেছিল, তেমনই চলে গেল।

আমি শেষ পর্যন্ত ব্যথাগ্রস্ত হাত নিয়েই লিখতে শুরু করি। তৃতীয় দিন হামজা বিসিউবি এসে সব কাগজ একত্রিত করে নিয়ে যায়। আমি সারাটি দিন অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে কাটাই। পায়ের ব্যথার জন্যে বসে থাকা, দাঁড়ানো বা ঘুমানো কোনটাই সম্ভব হচ্ছিল না। প্রতিটি হাড়ে ব্যথা করছিল। একেবারে অসহ্য অবস্থা।

সাফওয়াত আগের পথেই আমাকে শামস বাদরানের অফিসে নেয়ার জন্যে আরো দু'জন সিপাহীকে নিয়ে এলো। আমি শামস বাদরানের কক্ষে ঢোকা মাত্রই সে আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিকটভাবে চেঁচাতে লাগলো এবং আমার লিখিত কাগজগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়ে বলল-

ঃ হায়রে মেয়ে, তোর জন্যে এতসব শাস্তিও কি যথেষ্ট হলোনা? ·····এসব কি লিখেছিস তুই? সব বাজে কথা ·····। তারপর হামজাকে ডেকে বললো-

ঃ একে চাবুক লাগাও।

হামজা ও খলীল সমস্বরে বললঃ

ঃ না পাশা; তার চেয়ে একে কুকুরের সে'লে হিংস্র কুত্তাদের মধ্যে পাঠানো উচিৎ। শামস বাদরান উত্তেজিত কণ্ঠে বলল-

ঃ কুকুর গুলো এখানে নিয়ে এসো তাহলে-

সাফওয়াত ও তার সহযোগী সামরিক কারাগারে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া সবচেয়ে হিংস্র দুটি কুকুর এনে উপস্থিত করল। শামস বাদরান কুকুর দু'টিকে আমার উপর ছাড়তে হুকুম করলো।

উভয় কুকুর তাদের বিষদাঁত এবং থাবা দিয়ে আমাকে আক্রমণ করলো। দাঁত এবং নখ সম্পূর্ণ আমার শরীরে বসে যায়। আমি অনন্যোপায় হয়ে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করলাম- হাসবুনাল্লাহু ওয়া-নেয়মাল ওয়াকীল -হে আল্লাহ্ আমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা কর।

একদিকে কুকুরের দংশন ও নখের আঘাত; অন্যদিকে শামস বাদরানের মুখের অশ্লীল গালি-গালাজ সমানভাবে আমার দেহ প্রাণকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলো। এর মধ্যে আবার হুকুম চলছিল-

ঃ তুই যে জামাল নাসেরকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলি, তা লিখে দে, তোরা তাকে কিভাবে খুন করতে চেয়েছিলি?

এবার আরো একটি কুকুর ছাড়া হলো। ৩টি ভয়ঙ্কর কুকুরের হামলা বিষাক্ত কামড় আর থাবার আঘাত। আর আমি খুৎপিপাসায় কাতর চাবুকের পীড়ন-যন্ত্রণায় অস্থির এক অসহায়া নারী। কিন্তু আল্লাহর রহমতে সবকিছু সহ্য করার ক্ষমতা পাই।

শামস বাদরান এবং তার সাথীরা দেখল যে, কুকুর দিয়েও তাদের কাজ উদ্ধার হবে না, তখন শামস বাদরান বিকট চিৎকার করে সাফওয়াতকে বলল-

ঃ ওকে নিয়ে গিয়ে চাবুক লাগাতে থাক।

রাগে তার শরীর কাঁপছিল। একটু পরে ডাক্তার এলো। পরীক্ষা করে ডাক্তার অন্ততঃ সেদিনের জন্য আর চাবুক লাগাতে নিষেধ করে বলল-

ঃ আর আঘাত সইবার ক্ষমতা এর নেই।

শামস বাদরান হামজাকে বলল-

ঃ একে চব্বিশ নম্বর সে'লে রেখে এস। এরপর আমি তার লাশ দেখতে চাই।

আমাকে চব্বিশ নম্বর সে'লে পাঠানো হলো। এখানে এর আগে আসিনি আমি। আমি সে'লে ঢুকে আঁৎকে উঠি। সে'লের ঠিক মাঝামাঝিতে একটি গোলকে আগুন জ্বলছিল। তার চার পাশে চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে জল্লাদের দল। আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দেখছিলাম এই নারকীয় দৃশ্য।

হঠাৎ এক জল্লাদ আমার উপর চাবুকের আঘাত করে মাঝখানের গোলকে প্রবেশ করতে বলে। আমি আগুনের কাছাকাছি গেলে অন্য এক জল্লাদ চাবুক মেরে আমাকে দুরে সরিয়ে দেয়। এভাবে সবাই মিলে আমাকে একবার আগুনের কাছে এবং একবার দেয়ালের দিকে ছুটোছুটি করতে বাধ্য করে। আমার উপর তখন চাবুকের বর্ষণ হচ্ছিল যেন। চাবুকের ঘা আর আগুনের তাপে সে এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণাময় অবস্থার সৃষ্টি হলো, পুরো দু'ঘন্টা ধরে আমি আগুনের এই সেলে জ্বলতে পুড়তে এবং চাবুক খেতে থাকি।

এরপর হামজা বিসিউবি এসে আমার দিকে রক্তচক্ষু নিক্ষেপ করে বলল–

ঃ তোরা আবদুন নাসেরকে খুন করতে চেয়েছিলি বলে লেখ্। .... নয়তো তোকে এই আগুনে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারা হবে।

আমি কোন কথার জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে চিৎকার করে বিনা অশ্রুতে কেঁদে আপন নীতিতে অটল থাকি। শেষ পর্যন্ত আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ি। হাসপাতালে গিয়ে আবার জ্ঞান ফিরে পাই।

অত্যাচারের নাটকীয় দৃশ্য

একদিন সকালবেলা আমাকে হাসপাতালের কক্ষ থেকে বের করলে সামনেই কয়েকজন ফটোগ্রাফারকে ক্যামেরা নিয়ে তৈরী দেখে আমি অবাক হই। আমাকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে পায়ের উপর পা রেখে মুখে সিগারেট নিতে হুকুম করা হয়। এই ভাবে নাকি আমার ছবি নেয়া খুব জরুরী হয়ে পড়েছে।

আমি বললাম–

ঃ অসম্ভব, মুখে নেয়া তো দূরের কথা, আমি সিগারেট স্পর্শও করবো না।

এর জবাবে ওরা আমার মাথা এবং পিঠে পিস্তল রেখে বলল–

ঃ সিগারেট মুখে না নিলে শেষ করে দেয়া হবে। আমি ওদের পিস্তলের পরওয়া না করে পুনরায় সিগারেট নিতে অস্বীকার করি এবং কালেমায়ে শাহাদাত পড়তে থাকি। আমি বললাম–

ঃ তোমাদের যা মর্জি তা কর, আমি কোন অবস্থাতেই সিগারেট স্পর্শ করবো না।

এবার তারা আমার উপর খুব করে চাবুক বর্ষালো। তারপর আবার ঠিক কণ্ঠনালীর উপর পিস্তল ঠেকিয়ে বলল–

ঃ তোমাকে সিগারেট মুখে নিতেই হবে।

কিন্তু আমি বারংবার অস্বীকার করতে থাকি।

শেষ পর্যন্ত তারা যখন বুঝলো যে, আমাকে সিগারেট স্পর্শ করানো সম্ভব নয় তখন তারা এমনিতেই ছবি নিয়ে চলে গেল।

পরদিন তারা এসে বলল–

ঃ আমরা তোমাকে যা শিখিয়ে দেবো, তা টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে বলতে হবে তোমাকে। এই বলে তারা ইখওয়ান সম্পর্কে যতসব মিথ্যে অভিযোগ আমাকে মুখস্ত করতে বলল। আমি তাদেরকে বললাম–

ঃ আমাকে যদি টেলিভিশনের মাধ্যমে কিছু বলতে হয় তাহলে আমি যা বলব তা হচ্ছে–

"জামাল নাসের অবিশ্বাসী কাফের এবং সে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এ জন্যে আমরা তার বিরোধিতা করছি। কারণ, সে কুরআনের আলোকে শাসন পরিচালনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং ইসলামকে প্রতিক্রিয়াশীলতা বলেছে। সে অনগ্রসরতা এবং দারিদ্রের জন্যে ধর্মকে দায়ী করেছে। সে তার আইন প্রণয়ন এবং প্রশাসন চালানোর জন্যে সব বিধি-বিধান গ্রহণ করেছে কম্যুনিজম ও নাস্তিক্যবাদ থেকে। তার মতে খোদাদ্রোহিতা এবং বস্তুবাদী বিলাসীতার নামই জীবন। এজন্যেই আমরা তার সাথে ন্যায় ও সত্যের স্বার্থে প্রতিরক্ষামূলক লড়াই করছি।

আমার কথা শুনে তারা বলল–

ঃ তোমার কাঁধে ও পিঠে পিস্তলের নল লেগে রয়েছে, তা দেখেও এমন নির্ভীক উক্তি করার সাহস হয় কেমন করে তোমার? তা যাই বলনা কেন আমরা যা বলছি, তা তোমাকে টেলিভিশনের সামনে বলতেই হবে।

আমি বললাম–

ঃ গতকাল তোমরা সাংবাদিক এবং প্রেস ফটোগ্রাফারদের সামনে শত চেষ্টা করেও তোমাদের সিগারেট স্পর্শ করাতে পারোনি। তবে আজ যে আমি তোমাদের পিস্তলের ভয়ে অবাস্তব মিথ্যে কথা বলব, তা কিভাবে ধারণা করলে? না, খোদার শপথ করে বলছি, মিথ্যের সামনে আমরা নত হব না। আমরা এক আদর্শের অনুসারী। আমরা মুসলিম উম্মতের খাদেম এবং কুরআনের ওয়ারিস।

উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থ হয়ে তারা আমাকে চাবুক লাগাতে লাগল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চাবুক চালিয়ে আবার কক্ষে রেখে দিয়ে এল।

বত্রিশ নম্বর সে'লে

আমি একটি কথা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে ভাবি যে, এরা যদি সত্যি সত্যিই আমাকে কোন বিশেষ অপরাধে আটক করে থাকে, তাহলে আমার কাছ থেকে এতসব স্বীকারোক্তি গ্রহণের চেষ্টা করা হচ্ছে কেন? আম্বি নাসেরকে খুন করার ব্যাপারে একমত হয়েছি বা পরিকল্পনাও আমি করেছি বলে তারা আমার কাছে স্বীকারোক্তি দাবী করছে কেন? যদি আমার অপরাধের দলীল-প্রমাণ তাদের কাছে থাকবে, তাহলে অনর্থক এতো হয়রানী আর জোর জুলুম কেন? ওরা আমার কাছে এমন সব অবাস্তব অপরাধের স্বীকারোক্তি চাচ্ছে, যার অস্তিত্ব তাদের কল্পনায় ছাড়া আর কোথাও নেই। আসলে এসব গ্রেফতারী এবং অমানুষিক জুলুম উৎপীড়নের উদ্দেশ্য শুধু এটাই নয় কি যে, এভাবে ইসলামের আন্দোলন এবং তার প্রভাবকে বিপর্যস্ত করা হবে? আমাকে দেখা মাত্রই কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে বলল–

ঃ আরে, তুই এখনো বেঁচে রয়েছিস? হামজা, আমি তোমাকে বলেছিলাম না যে, আমি এর লাশ দেখতে চাই!

হামজা অনুরোধের স্বরে বলল–

ঃ মাফ করবেন পাশা! এবার আপনি একে যে হুকুম দেবেন, তা মানার জন্য তৈরী।

শামস বাদরান আমাকে লক্ষ্য করে বলল–

ঃ লেখ তাহলে.....

আমি বললাম–

ঃ বাস্তব ঘটনা ছাড়া আমি আর কিছুই লিখব না। তা তোমরা আমাকে খুনই করে দাও না কেন! সম্ভবতঃ তা খোদার মর্জিতে আমার শহিদী মৃত্যু হবে।

হাসান খলীল বলল–

ঃ আমরা তোমাকে কখনো শহীদ হতে দেবো না।

আমি বললাম–

ঃ শাহাদাত তো খোদার পক্ষ থেকে উপহার হয়ে আসে। তিনি যার জন্যে নির্ধারিত করেন, তাকে তা' অবশ্যই দান করেন।

শামস্ বাদরান বিরক্ত হয়ে বলল–

ঃ সাফওয়াত, একে লটকিয়ে দিয়ে পাঁচশো চাবুক লাগাও···· দেখা যাক, তার আল্লাহ কে?

আদেশ পাওয়া মাত্রই জল্লাদরা আমাকে উল্টো লটকিয়ে পাঁচশত চাবুক লাগানোর আজ্ঞা পালন করলো। তাদের এতটুকু ভেবে দেখার অবকাশও নেই যে, মামুলি আঘাত সহ্য করার যোগ্যতাও এই বেচারীর নেই। চাবুক লাগান শেষ হলে আমাকে কক্ষে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সে আমাকে একটি চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করে বলল–

ঃ তুই আমাদেরকে খুব নিষ্ঠুর এবং নিস্প্রাণ মনে করিস। অথচ, আমরা তোর অবস্থা দেখে খুবই মর্মাহত। জানিস, আমার পিতা আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক.....

আমি কোন কথা না বলে নীরবে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকলাম।

সে তৎক্ষণাৎ তার আসল প্রকৃতিতে ফিরে এসে ধমক দিয়ে বলল।

ঃ হামজা, একে বত্রিশ নম্বর সে'লে রেখে এস।

আমি নতুন সে'লে প্রবেশ করে দেখলাম, কাঠের দু'টো উঁচু থামের উপর সমান্তরালে কাঠের ফ্রেম বসিয়ে তাতে লোহার দুটি বড় রিং লাগানো হয়েছে। জল্লাদরা আমাকে চেয়ারের উপর দাঁড় করিয়ে সেই রিং দু'টো দু'হাতে ধরতে বলল। হান্টারের ঘা খেয়ে আমি রিং দু'টো ধরা মাত্রই তারা পায়ের নীচ থেকে চেয়ার হটিয়ে নেয়। আমি রিং ধরে শূন্যে লটকে থাকি। আমি মিনিট দশেক কোন রকমে লটকে থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ে যাই। মাটিতে পড়া মাত্র জল্লাদরা হান্টার নিয়ে তেড়ে এসে আবার ওভাবে লটকিয়ে দেয়। আমি আবার পড়ে যাই এভাবে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত এই নিষ্ঠুর মহড়া চলতে থাকে।

ঈমানের মান ও মিথ্যের অপমান

আমাকে আবার শামস্ বাদরানের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। শামস্ অভিনেতা সুলভ ইঙ্গিত করে আমাকে পাশের চেয়ারে বসতে বলে। বসার পর জালাল এবং হাসান খলীল আমাকে পাশা'র মর্জি মোতাবেক লিখিত বিবৃতি দেয়ার জন্যে সম্মত করার চেষ্টা শুরু করে। কারণ এতে নাকি আমার উপকার হবে।

আমি উভয়কেই বললাম–

ঃ আমি যা জানিনে সে সম্পর্কে কোন কথাই লিখতে পারবো না। তারা বলল–

ঃ আমরা সব কিছু জানি। ইখওয়ানরা সব বলে দিয়েছে।

এরপর জালালকে ফাইল খুলে মজিদ শাদলী এবং ইখওয়ানদের কথিত বিবৃতি পড়ে শুনাতে বলল। জালাল তাদের কথা মত প্রথমে আলী উসমাবীর বিবৃতি পড়ে শুনালো। শুনে তো আমি হতভম্ব! সব বিবৃতি পড়ে শুনানো হলে শামস্ মাথা দুলিয়ে জিজ্ঞেস করলঃ

এসব বিবৃতি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি?

আমি সাথে সাথেই বললাম-

ঃ সব মিথ্যে বানোয়াট অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

শামস্ বাদরান বলল-

ঃ তুমি ইখওয়ানকে পুনর্গঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলে- তাকি অস্বীকার করতে চাও? অথচ তোমাদের লোকের কথায় স্পষ্টভাবে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, তুমিই এই সংগঠনের পূণঃপ্রতিষ্ঠার বুনিয়াদ রেখেছ·····। জালাল, তাহলে হুজায়বীর বিবৃতিটা পড়ে শুনাওতো! ·····কিন্তু সাথে সাথেই বলল-

ঃ আচ্ছা থামো থামো, ওটা থাক। আপাততঃ আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইলের বিবৃতিই শুনিয়ে দাও।

পড়া হলে শামস্ আমাকে জিজ্ঞেস করল, এবার তোমার মত কি·····?

এরপর জালাল একের পর এক ফাইল খুলে এক একটি স্বীকারোক্তি পড়ে শোনাতে লাগলো। সব পড়া হলে শামস্ আমাকে বলল-

ঃ যা কিছু শুনলে সে ব্যাপারে তোমার মতামত কি·····? এখন বল আমরা যা চাই তাই লিখবে কিনা?

আমি দৃঢ়তার সাথে বললাম-

সব কিছুই বানোয়াট একেবারে বাজে কথা।

সে বিজ্ঞের হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল-

ঃ তাহলে সত্যটা কি?

আমি বললাম-

ঃ আলী উসমাবীর যে স্বীকারোক্তি রেকর্ডে রাখা হয়েছে, তা আমার মতে ভুল। অবশিষ্ট ইখওয়ানদের ব্যাপারে আমি বলব, তারা সত্যপন্থী এবং সত্যবাদী। আর তাদের নামে রচিত এসব বিবৃতি ও স্বীকারোক্তি তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অপবাদেরই নামান্তর।

শামস্ হামজাকে ডেকে বলল-

ঃ একে এবার উল্টো লটকিয়ে দাও এবং আলী উসমাবীকে নিয়ে এস। উজ্জ্বল ধোব দুরস্ত পোষাক পরে আলী উসমাবী এলো। সুন্দরভাবে আচঁড়ানো তার চুল; শাস্তি বা দুঃখ ভোগের কোন চিহ্নই তার শরীর বা চেহারায় নেই। আমি তাকে আমার এবং অন্যান্য বন্দীদের তুলনায় বিবেচনা করে দেখে এটা বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় রলো না যে, এ ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং ইখওয়ানদের বিরুদ্ধে মিথ্যে স্বাক্ষ্য দিয়ে ওসব মিথ্যুক অসভ্যদের চক্রান্তে পড়ে গেছে। ওরা নীতি বা ধর্ম কিছুই মানে না। আর এও শামস্ বাদরানের শিকারে পরিণত হয়ে নাসেরের দলে গিয়ে শামিল হয়েছে।

শামস্ বাদরান তাকে জিজ্ঞেস করলো–

ঃ আচ্ছা আলী! শেষ দিন যখন তুমি জয়নব আল-গাজ্জালীর কাছে গিয়েছিলে, তখন তার নিকট থেকে তুমি কি নিয়েছিলে এবং সে তোমাকে কি বলেছিল?

উসমাবী বলল–

ঃ তিনি আমাকে এক হাজার জিনিহ (মিশরীয় পাউন্ড) দিয়ে বলেছেন, এ টাকা হুজায়বী অথবা সাইয়েদ কুতুবের ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে গা'দা আম্মারের কাছে নিয়ে যাবে·····। আমি যদি গ্রেফতার হয়ে পড়ি তাহলে টাকার দরকার হলে গা'দা আম্মার অথবা হামীদার সাথে যোগাযোগ করবে। টাকা কোথায় আছে তা তাঁরা জানেন।

শামস্ বাদরান আমাকে জিজ্ঞেস করল–

ঃ কত টাকা ছিল জয়নব? আর তা নিয়ে তুমি এতো সন্ত্রস্ত ছিলে কেন?

আমি বললাম–

ঃ সুদান এবং সউদী আরবে অবস্থানরত ইখওয়ানের সাথীরা বন্দী ভাইদের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে ৪হাজার জিনিহ্ চাঁদা পাঠান। এছাড়া স্কুল কলেজে অধ্যয়নরত দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য এবং ঘর ভাড়া ইত্যাদি বাবদ এক হাজার জিনিহ্ ব্যয় হয়·····তোমার সামনে দাঁড়িয়ে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিচ্ছে, তার হাতেই এক হাজার জিনিহ্ পাঠানো হয়। ভাই আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইলের পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্যে·····

এবার শামস্ তাকে জিজ্ঞেস করলো–

ঃ আলী! তুমি শেষবার জয়নব আল-গাজ্জালীর ওখানে কি খেয়েছিলে? আলী উসমাবী বলল–

ঃ তিনি কলিজি দিয়ে রান্না করা প্লেট ভর্তি ভাত দিয়ে বলেছিলেন, খাও আলী! আল্লাহ্ তোমায় সাহায্য করবেন।

শামস্ বলল–

আচ্ছা যথেষ্ট! তুমি এবার যাও আলী। আলী শামস্ বাদরানের সন্তোষভাজন হয়ে বেরিয়ে গেল।

শামস্ এবার হামজাকে বলল–

ঃ আবদুল ফাত্তাহ্ ইসমাইলকে আন।

মুহূর্ত খানেক পরেই হামজা আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইলকে নিয়ে উপস্থিত হল। আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইলের চোখে ছিল গম্ভীর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণীয় দীপ্তি। তিনি কারাগারে শতছিন্ন কাপড় পরেছিলেন। তাঁর উপর যে অমানুষিক উৎপীড়ন চালানো হয়েছে তার স্বাক্ষর সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তিনি এসে আমাকে দেখে স্বাভাবিক নম্রতার সাথে সালাম জানালেন। আমিও তাঁর সালামের জবাব দিই।

শামস্ তাকে জিজ্ঞেস করলঃ

"আব্দুল ফাত্তাহ! তুমি জয়নব আল-গাজালীর ওখানে কি ক'রতে এবং তুমি তার কাছে কেন যেতে? আব্দুল ফাত্তাহ বীরদৃপ্ত কণ্ঠে বললেন।"

তিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে আমার ইসলামী বোন। আমরা মুসলিম যুবকদের মধ্যে কোরআন ও সুন্নাহ্র শিক্ষা প্রচারের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করি। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের লক্ষ্য ছিল সরকার পরিবর্তন করে বাতিলপন্থী সরকারের জায়গায় ইসলামী সরকার কায়েম করা।

তাঁর কথা শুনে শামস্ বাদরান ক্ষেপে গিয়ে বললঃ

তুমি বক্তৃতা শুরু করলে বুঝি? জান তুমি মিম্বরে দাঁড়িয়ে নও······ বরিয়ে যাও······ বেরিয়ে যাও।

আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইল যেভাবে এসেছিলেন ওভাবেই বেরিয়ে গেলেন। যেতে যেতে তিনি আমাকে সালাম জানালে আমিও জবাবে বললামঃ

"ওয়া আলাই কুমুস্সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।"

শামস্ বাদরান পাগলের মত বিশ্রী গালি দিতে থাকল······। অবশ্য আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইলের স্পষ্ট মহত্ত্বপূর্ণ এবং মহান ব্যক্তিত্ব সুলভ কথা শুনে আমি আন্তরিকভাবে স্বস্তি ও শান্তি অনুভব করি। বীর মুজাহিদই বটে। শত বিপদেও সত্যের

নীতিতে অটল অবিচল রয়েছেন তিনি। আল্লাহ্‌র অশেষ শুকরিয়া যে আজকের এই আধুনিক অজ্ঞতার যুগেও এমন সত্যনিষ্ঠ লোক বর্তমান রয়েছেন।

আমি আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর জন্যে দোয়া করলাম। আলী উসমাবীর মত লোক বিশ্বাসঘাতকতা করলে কি হবে, হাজার হাজার সত্য -সেনা আল্লাহ্‌র পথের জিহাদী কাফেলায় এখনো ধৈর্য্য ও সাহসিকতার সাথে এগিয়ে চলছে।

শামস্ বাদরানের চিৎকার শুনে আমি সচকিত হলাম। সে চেঁচিয়ে বলছে-

ঃ এই মেয়েকে নিয়ে যাও। লিখিত কাগজসহ সকালে আবার আমার কাছে আনবে।

হাসান খলীল সাফওয়াতকে কাগজ কলম দিল এবং আমাকে হাসপাতালের কক্ষে পাঠানো হল।

কাগজ কলম হাতে নিয়ে আমি ভাবছিলাম যে কি লিখব? ওরা কি চায়? ওরা কি এটাই চায় যে, আমার আল্লাহ্ এবং তাঁর দ্বীনের বিরুদ্ধে লিখি? না, খোদার শপথ, তা কোন দিনই হবে না।

আমি লিখলাম-

ঃ আমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথেই চলছি আল-কুরআনের পতাকাতলে একতাবদ্ধ, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র শেষ রাসূল। আমরা কোন সময় কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করব না। শুধু তাঁরই ইবাদাত, তাঁরই উপাসনা করব। হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদেরকে সাহস ও ধৈর্য্য দান কর এবং ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যু দান কর।

আর তোমরা যুগের ফেরাউনরা! -পার্থিব জীবনের এই সংক্ষিপ্ত সময় পুরো করে নাও। মৃত্যু অবশ্যই একদিন নির্ধারিত রয়েছে। অতি শীঘ্রই তোমরা তোমাদের পরিণামের সম্মুখীন হবে।

পরদিন হামজা বিসিউবি, রিয়াজ, সাফওয়াত এসে লিখিত কাগজ নিয়ে চলে গেল। আবার ঘন্টা খানেক পরে এসে আমাকে গাড়ীতে উঠিয়ে শামস্ বাদরানের অফিসে নিয়ে যায়। আমার পক্ষে তখন পায়ে হাঁটার উপায় ছিল না।

শামস্ আমাকে দেখিয়ে কিছু কাগজ ছিঁড়ে ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়ে বলল-

ঃ এসব তোমার লিখিত কাগজ……আমি তোমার শরীর থেকে এক পেয়ালা রক্ত বের করে না নেয়া পর্যন্ত তুমি আমার মর্জিমতো লিখবে না দেখছি।

এরপর গালি-গালাজ এবং চাবুকের আঘাতের সাথে আমাকে আবার হাসপাতালে রেখে আসা হয়।

আমার ফাঁসির হুকুম

আমি প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি ছিলাম বলে আমাকে কিছুদিনের জন্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রাখা হয়। একদিন সূর্যাস্তের একটু আগে আমাকে শামস্ বাদরানের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আমাকে অফিসে না ঢুকিয়ে একটি প্রকান্ড মেশিনের সামনে দাঁড় করানো হয়। এই বৈদ্যুতিক মেশিন থেকে বিকট শব্দ এবং অত্যন্ত গরম বাতাস বেরুচ্ছিল। আমাকে পুরো রাত সেই বিভীষিকাময় মেশিনের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। সকালে আবার হাসপাতালে পাঠানো হয়। ডাক্তার মাজেদ আমার চেহারার অবস্থা দেখে আবদুল মাবুদকে জিজ্ঞেস করলেন-

ঃ এর মুখমন্ডল তো একেবারে হলদে হয়ে গেছে। ····তাঁকে রাতে আবার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নাকি?

আবদুল মাবুদ বলল‍ঃ জী হ্যাঁ!

আধঘন্টা পরে আবদুল মাবুদ আমাকে পাউরুটি এবং কিছু মোরব্বা দিয়ে বলল, ডাক্তার সাহেব পাঠিয়েছেন এবং এসব খেতে বলেছেন। সূর্যাস্তের সময় আমাকে আবার শামস্ বাদরানের অফিসের কাছে একটি সে'লে নিয়ে রাখা হয়। একটু পরে হামজা, সাফওয়াত, রিয়াজ এসে পৌঁছলো। ওরা চাপাস্বরে পরস্পর কি সব কথা বার্তা বলল। প্রথম দু'জন চলে যায় এবং তৃতীয় জন সেখানেই থাকে। হঠাৎ সে নিজেই নিজের মুখে চড়-ঘুঁষি মেরে, নিজের চুল নিজে ছিঁড়ে মত্ত পাগলের মত এক আজব কান্ড শুরু করে দেয়। সে আমাকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বলতে লাগল-

ঃ পাগলি কোথাকার! আজ যদি তুই শামসের কথা না মানিস তো আজই তোর জীবনের শেষ দিন। জানিস রিফায়াত, ইসমাইল এবং আলকিউমীরা কোথায়?

সে বলল-

ঃ এখানে এই কারাগারে নাসেরের হুকুমে প্রতি দিন দশ জন ইখওয়ানী কুত্তাকে দাফন করা হয়।

আমি যখন তাকে বললাম যে, ওরাতো আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়ে জান্নাতবাসী হয়েছেন।

একথা শুনে আরো জোরে জোরে নিজের মুখে নিজে চড় মারতে শুরু করলো এবং বলল-

ঃ এ পর্যন্ত কুকুর, পানি, আগুন, চাবুক, হান্টার কোন কিছুই তোকে টলাতে

পারেনি। আজ পাশা তোকে জবাই করে ছাড়বে। সে নাসেরের অনুমতি নিয়ে নিয়েছে। কি করবি তুই?

আমি শান্তভাবে বললাম-

: যা করার আল্লাহ্ই করেন।

সে এবার বলতে শুরু করল-

: তুই চাস্, আমরাও তোর মতো কাজ করে ব্যর্থ হই? যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আধা পৃথিবীর উপর শাসন করছে তুই চাস আমরা তাকে ছেড়ে দেই? আর আমরা হুজায়বী, সাইয়েদ কুতুব এবং হাসানুল বান্নার মতো লোকদের কথা মেনে চলি? -তোরা পাগল ....আমরা তোদের মতো পাগল নয় বুঝলি ....?

আমি জবাবে কুরআনের আয়াত পড়ে বললাম-

: এসব লোকদের যখন বলা হয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তখন তারা অহংকার বলে বলে- "আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের এতসব উপাস্য ছেড়ে দেব?" আর এসব উপাস্য হচ্ছে মূর্তি প্রতিবাদী। আর শাসকরা এসব মূর্তিরই হেফাজতে নিযুক্ত রয়েছে। এরাই সেসব লোক, যারা মানবতার নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে পাগল বলতে ইতস্ততঃ করেনি। আজ আবার ইতিহাসের পুণরাবৃত্তি হচ্ছে। আজ তোমরাও আল্লাহ্র পথের মুজাহিদদের পাগল বলছ, আর মিথ্যে বাতিলের অনুসারী শাসকবর্গ তোমাদের প্রভু হয়ে বসেছে, সব হীন কাজে তোমাদের ব্যবহার করছে। আর তোমরা কয়টি মাত্র টাকার বিনিময়ে নিজেদের মানবতাবোধকে বিসর্জন দিয়ে অসৎ জীবন যাপন করছ। বল তোমরা কি জালিম-অত্যাচারীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে আল্লাহ্র গজবের সম্মুখীন হতে চাচ্ছ?

এবার প্রশ্ন করলো-

: তোমরা কি আমাদেরকে সেই স্থবির অনগ্রসরতার দিকে ফিরিয়ে নিতে চাও?

এমন সময় দরজা খুলে জল্লাদরা বেপরোয়াভাবে আমার উপর চাবুক ও হান্টার চালাতে লাগলো। আর তা দেখে রিয়াজ হেসে হেসে বলছে-

: খোদার শপথ জয়নব; আমি তোমাকে স্নেহ করি এবং তোমার ব্যাপারে শংকাও পোষণ করি।

আমি চাবুক খাওয়ার মাঝেই তাকে ব্যঙ্গ করে প্রশ্ন করলাম-

: স্নেহ এবং শংকা? সে আবার কেমন কথা হল? তুমি কি ভীরু কাপুরুষ? ব্যাপারতো খুবই স্পষ্ট। তোমরা শুধু আমার স্বীকারোক্তি নেয়ার জন্যে এতো

উৎসাহী কেন? তোমাদের সব মিথ্যে জালিয়াতি, অপবাদ, বিনাদোষে শাস্তি, বিশেষ উদ্দেশ্যে মামলার প্রহসন এবং নিরপরাধ লোকদের উপর ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপের মূল উদ্দেশ্য তো খুব স্পষ্ট হয়ে গেছে।

রিয়াজ তার ছাতি ছাপিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে, চুল ছিঁড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল–

ঃ আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি সব তোর কাছে ব্যর্থ-বেকার প্রমাণিত হয়ে গেছে? আমরা খেয়ে পরে সুস্থ থেকেও অসুস্থ হয়ে পড়েছি ....আর তুই? তুই এখনো বেঁচে আছিস কিসের জোরে? ....ডাক্তার বলছেন তোকে এখন খাবার না দিলে তুই মরে যাবি।

হামজা ও সাফওয়াত এসে রিয়াজকে জিজ্ঞেস করলো–

ঃ কি করেছিস ভাই; আশা করি ওর বুদ্ধি ফিরে এসেছে।

আমি স্মিত হেসে হামজার দিকে তাকিয়ে বললাম–

ঃ তোমাদের মধ্যে পাগল কে তা বুঝতে পারছিনে।

হামজা কোন কথা না বলে নীরব দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে সাফওয়াতকে বলল–

ঃ একে পাশের অফিসে নিয়ে চল।

পাশার দফতরে

শামস্ আমাকে পাশের চেয়ারে বসতে দিয়ে বলল–

ঃ দেখ, আমার মতে, অব্যাহত শত্রুতা পোষণ করে কোন লাভ নেই।

তুমি আমার ইচ্ছেমত সব লিখে দাও।

আমি স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে বললাম–

ঃ তুমি কি এটাই লিখাতে চাও যে, আমরা নাসেরকে খুন করতে চেয়েছি? ....এটা অসম্ভব। খোদার শপথ আমরা শুধু কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার জন্য একত্রিত হয়েছিলাম। আমরা লোকদের জানাতে চেয়েছিলাম যে, অত্যাচারী মানুষের অনুসরণ না করে আল্লাহ্র দ্বীনের অনুসরণ করা উচিৎ এবং কিভাবে তারা আল্লাহ্র ইবাদাত করবে এবং কেমন করে এই পৃথিবীতে আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে আমরা লোকদের সেসব বিষয়ে অবহিত করি। আমরা কুরআন সুন্নাহ্ মোতাবেক কাজ করি, আল্লাহ্র কোন হুকুম অমান্য করিনে। যদি ভুল-ভ্রান্তিতে আল্লাহ্র হুকুম অমান্য হয়ে যায়, তাহলে তার জন্যে অনুশোচনা করে

তাওবা করি। আমাদের মতে বর্তমান সরকার অযোগ্য এবং এজেন্য এর অবসান দরকার। কিন্তু তা জোর-জবরদস্তিভাবে নয়। আমরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে জনসাধারণকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল করে পরিবর্তন করতে চাই···· আমরা চাই সত্যিকারের ইসলামী শাসন ব্যবস্থা···।

হঠাৎ আমার উপর হান্টার চালানো শুরু হলে আমি চিৎকার করে বলি–

ঃ না, না, আমি মিথ্যে লিখবো না; আমাকে মেরে ফেললেও লিখবো না, আমার কাছে পৃথিবীর কোন মূল্য নেই····।

শামস্ বাদরান আমাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলো–

ঃ যেসব কাগজ আমি ছিঁড়ে ফেলেছি, তাতে তুমি আবদুল আজীজ আলীর নাম লেখনি কেন?

আমি জানতে চাইলামঃ

কোন আবদুল আজীজ আলী?

ঃ সেই আবদুল আজীজ পাশা। যাকে নাসের তার মন্ত্রীসভার সদস্য নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সে নাসেরের সাথে নিমকহারামী করে, যে হাত তাকে সাহায্য করেছিল সে হাতকেই কেটে দেয় এবং নাসেরের বিরোধিতা শুরু করে।

এবার আমি চিনতে পারলাম এবং বললাম–

ঃ আবদুল আজীজ আলী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণগুপ্ত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি জাতীয় দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা। আবদুন নাসের এবং তার সঙ্গীরা এঁরই কাছে জাতীয়তাবাদের দীক্ষা গ্রহণ করে। আমার মতে তিনি এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি আমার স্বামীর বন্ধু। আর এখন তিনি আল্লাহ্‌র পথে আমার ইসলামী ভাই। তাঁর পত্নী আমাদের সংস্থার কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্যা, আমার বান্ধবী এবং ইসলামী বোন····।

শামস্ কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো–

ঃ তাহলে তুমি তাকে ইখয়ানের শামিল করনি কেন?

আমি বললাম–

ঃ তা আমার বিবেচনায় ছিল···· কিন্তু যেমন প্রবাদ আছে যে, কারো মাথা মগজের পরিবর্তে আগুনে ভর্তি থাকে····।

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে শামস্ বিকট চিৎকার করে বলে–

ঃ এসব বাজে কথা, বন্ধ কর। এরপর চাবুক লাগানোর আদেশ দিল। কিছুক্ষণ

পর্যন্ত তারা পরস্পর ফিস্‌ফাস করলো, তারপর হাসান খলিল আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ তুমি আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইলের সাথে আবদুল আজীজকে কেন পরিচয় করিয়েছিলে এবং কোথায় এই পরিচয় করানো হয়?

আমি জবাবে বললাম-

ঃ তোমাদের গোয়েন্দা বাহিনীর আক্রমণের ফলে যখন আমার পা ভেঙে যায় তখন তিনি এবং তাঁর পত্নী হাসপাতালে এসে আমার সাথে দেখা করতেন। এভাবে আমি হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ী ফিরে গেলেও তাঁরা মাঝে মধ্যে আসতেন। একদিন আবদুল আজীজের উপস্থিতিতেই ভাই আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইলও এসে পৌছান। এভাবেই তাঁরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হন। এ ব্যাপারে আমি শুধু এইটুকুই জানি।

হাসান খলীল বলল-

ঃ তা স্বীকার করলাম যে, আবদুল আজীজ ও আবদুল ফাত্তাহর সাক্ষাৎ আকস্মিক হয়েছিল। কিন্তু আবদুল আজীজ তোমার বাড়ীতে তোমার মাধ্যমে ফরিদ আবদুল খালেকের সাথে কিভাবে পরিচয় লাভ করে।

আমি জবাবে বললাম-

ঃ আমার বাড়ীতে নার্স আমার পায়ের ভাঙ্গা হাড়ের উপর ব্যান্ডেজ বাঁধতে এলে ভাই আবদুল আজীজ ড্রইং রুমে গিয়ে বসেন। এ সময় ভাই ফরিদ আবদুল খালেকও ওখানে এসে বসেন। তাঁরা তখনো পরস্পর অপরিচিত ছিলেন। আমার পায়ে ব্যান্ডেজের কাজ শেষ হলে নার্স চলে গেলে ভাই ফরিদ, আবদুল খালেক আমাকে দেখার জন্যে ভেতরে আসেন। এ সময় ভাই আবদুল আজীজও বিদায় নেবার জন্যে ভিতরে যান। এই উপলক্ষে আমি এদের উভয়কে পরস্পরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই।

আমার কথা শুনে শামস্ অগ্নিশর্মা হয়ে সাফওয়াতকে ডাকলো। হাসপাতালে আমার জ্ঞান ফিরে এলে দেখি আমার উভয় পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়েছে। দু'পায়ে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছিলাম আমি। আর এই যন্ত্রণা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। মনে হচ্ছিল, আস্ত শরীর যেন গরম তেলে ভাজা হচ্ছে।

সংশয়ের আবর্তে

হাসপাতালে কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর আমাকে আবার শামস্ বাদরানের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সে তার পুরানো কথা ও সন্দেহের পুণরাবৃত্তি করতে থাকে। আমার মনে হয় একটি সন্দেহকে বারবার উচ্চারণ করে একের পর এক পুণরাবৃত্তি

করার ফলে তার সংশয়টি তার মনে বাস্তবতার রূপ ধারণ করে নিয়েছে। সে এখন তার নিছক সন্দেহকে বাস্তব ঘটনার মতো বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। তার সেই একই কথা ইখওয়ানুল মুসলিমুন আবদুন নাসেরকে খুন করার ষড়যন্ত্র এঁটেছিল। শামস্ বাদরান আমার দিকে লক্ষ্য করে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল–

ঃ তুমি এখনো জীবিত রয়েছ? অথচ সব রকমের শাস্তিই তোমাকে দেয়া হয়েছে।

আমি জবাবে তাকে আসহাবুল উখদুদের ঘটনা বললাম–

ঃ আল্লাহ্ বলছেন– 'আসহাবুল উখদুদকে' হত্যা করা হয়; যারা এদেরকে হত্যা করে, তারা তাদের মিথ্যেবাদিতা এবং অপবাদ আরোপের কারণে বদ্ধপাগলে পরিণত হয়। আর নিজেদেরই জাতির লোকদের হাতে শহীদ হওয়া এসব লোকেরা ছিলেন সকলের বিশ্বাসভাজন ও সম্ভ্রান্ত। তাঁরা লোকদেরকে খোদার পয়গাম পৌঁছানো এবং ঈমানদারীর সাথে দায়িত্ব পালনের শিক্ষাদানে সক্রীয় ছিলেন।

শামস্ বাদরান বলল–

ঃ আমরা ওসব নীতি কথা বুঝিনে। তা তুমি কি এখনো আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস কর? অথচ ১৯৪৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তোমরা বরাবর ব্যর্থ হয়ে আসছ। তোমরা বাদশাহ ফারুকের মোকাবেলায় ১৯৫৪ সালের বিপ্লব বিরোধিতায় এবং ১৯৬৫ সালে বিপ্লবের পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখতে গিয়ে দারুণভাবে পর্যুদস্ত হয়েছ····। বলি, তোমাদের সে তথাকথিত খোদা আছেন কোথায়?

আমি তাকে বললাম–

ঃ ১৯৪৮ সালে আমরা সফল হয়েছি, ১৯৫৪ সালেও আমরাই বিজয়ী থাকি এবং ১৯৬৫ সালেও আমরা ময়দান জয় করি।

সে বলল–

ঃ আমরা তোমাকে মুরগীর মতো উল্টো লটকিয়ে রেখেছি, পানিতে আকণ্ঠ ডুবিয়ে রেখেছি, আগুনের হল্কার মধ্যে ছুটাছুটি করতে বাধ্য করেছি, হিংস্র কুকুর দিয়ে দংশন করিয়েছি····যদি সত্যিই তোমাদের কোন খোদা বা পালনকর্তা থেকে থাকতো সেকি তোমাকে রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে আসতো না? বল রে হতভাগী মেয়ে····।

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললাম–

ঃ আমাদের উপর চাবুক বর্ষিয়ে এবং বিভিন্ন রকমের নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়ে তোমরা বুঝি এই আত্মতৃপ্তিতে আছ যে, তোমরা বিজয়ী হয়েছ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমরা সব সময় আমাদের ভয়েই সন্ত্রস্ত রয়েছ।

সে ক্রোধের সাথে হুঙ্কার করলো–

ঃ চুপ কর মেয়ে! তোরা সব অপরাধী।

ঃ কক্ষণো না। আমি তেমনি দৃঢ়তার সাথে বললাম।

আমি আরো বললাম-আমরা অপরাধী হবো কেন? ....আমরা তো সত্যের পথে, সত্য ও শান্তি প্রচারের দায়িত্বে নিয়োজিত আছি। আমরা সত্যের কান্ডারী এবং অনির্বাণ আলোর দিশারী।

সে জিজ্ঞেস করলো–

ঃ তোমরা আমাদের উপর বিজয়ী কেমন করে হলে?

আমি বললাম–

ঃ কারণ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আমরা, সমৃদ্ধ ও শক্তিমান। তাঁর উপরই আমাদের অটল ভক্তি ও অবিচল বিশ্বাস; তাঁরই পথে আমরা জিহাদ ও আন্দোলন করি। যখন আমরা ইসলামের মর্যাদা ও তাওহীদের পতাকাকে সমুন্নত রাখার দায়িত্ব পালনে গড়িমশি করবো, কেবল তখনই আমাদের পরাজয় প্রমাণিত হবে। বস্তুতঃ ইসলাম হচ্ছে একটি সর্বকালীন ও সার্বজনীন জীবনাদর্শ। ধর্ম, সরকার, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা তথা ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের সব দিক ও বিভাগের পন্থা নির্দেশক জীবনাদর্শ হচ্ছে এ-ই ইসলাম। শান্তি-সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব সহনশীলতা এবং ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ইসলামের উদ্দেশ্য। এটা সর্বমানবতা শ্বাশত স্বাভাবিক জীবনাদর্শ।

ইসলাম মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে এক আল্লাহ্‌র ইবাদাতে উদ্বুদ্ধ করে। খোদাদ্রোহীতার জন্যে কোন মানুষের অনুসরণ করতে নেই। যারা সত্য ও সরল মনে এবং পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা সত্যিকারের সাফল্য সোনালী মঞ্জিলে পৌঁছবেই। তারা আল্লাহ্‌র সিপাহীতে পরিণত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র পথের সিপাহী তারা অন্য কোন ব্যক্তি বা শক্তিকে ভয় করবে কেন? যারা সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়, দুনিয়ার স্বার্থ তাদের কাছে একান্ত সংকীর্ণ ও তুচ্ছ বলে মনে হয়। জীবন ও পৃথিবীর বাস্তবতা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়ে। তাই তারা, এই নশ্বর সংক্ষিপ্ত পার্থীব জীবনের ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিবর্তে পরকালের অশেষ সমৃদ্ধ ও শান্তিময় বেহেশতী জীবনের প্রত্যাশায় আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলে।

আর তোমরা বিভ্রান্ত কাপুরুষরা! তোমরা কি করতে পার? আমাদের উপর অত্যাচার চালাতে পার; মারতে কাটতে পার, খুন করতে পার, শত রকমের

পৈশাচিক নির্যাতন চালাতে পার, পানিতে বা কুকুরের ভিড়ে ঠেলে দিয়ে তামাশা দেখতে পার, চাবুক মেরে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পার। কারণ তোমাদের হাতে চাবুক আর হান্টার আছে, আছে অনেক রকমের অস্ত্র। কিন্তু আমাদের কাছে তোমাদের এসব জুলুম-নির্যাতন একেবারে অর্থহীন। তোমাদের কোন অত্যাচারই আমাদেরকে সত্যের পথ থেকে টলাতে পারবে না। তোমরা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তোমরা ভীত হয়ে আমাদেরকে আলাদা আলাদা তাবে বন্দী করে রেখেছ কেন? কেন এত ভয়? তা এই জন্যেই যে, আমরা আল্লাহ্র পথের মুজাহিদ আর তোমরা হচ্ছ শয়তানের চেলা। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তাদের পরাজয় এবং অপমান অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃ এরাই হীন, ইতর লোক। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দ্বীন বিজয়ী থাকবে। নিঃসন্দেহে সমস্ত শক্তির উৎস একমাত্র আল্লাহ্।

আমার এসব কথা সহ্য করা শামস্ বাদরানের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে মাথায় হাত চেপে আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তির মতো বললো–

ঃ সাফওয়াত-সাফওয়াত। একে উল্টো লটকিয়ে পাঁচশো চাবুক লাগাও। চাবুক লাগানো হলে আমাকে নামিয়ে সেই সব বাসি প্রশ্নের জবাব দিতে বলল। আমিও আমার জবাব দিতে থাকি। এতে বিরক্ত হয়ে শামস্ বাদরান আমাকে আবার লটকিয়ে আড়াইশো চাবুক লাগার হুকুম দিল। তার হুকুম যখন পালন করা হয় তখন আমি অজ্ঞান। হাসপাতালে আমার জ্ঞান ফিরে এলে দেখি, আমার চারপাশে ডাক্তারদের ভিড় এবং আমার শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যান্ডেজ এবং ঔষধ লাগানো হচ্ছে।

হাসপাতালে কয়েক দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর আমাকে ষ্টেচারে করে আবার শামস্ বাদরানের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়।

জীবনের শেষ লগ্নে মৃত্যুপথ যাত্রীর মতো দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। এটর্নি। ···· তুমি কে?

সে বললঃ আমরা তোমাকে আদালতে পেশ করার জন্যে তৈরী করছি। আমি প্রশ্ন করলাম–

ঃ তোমরা আমার কাছ থেকে আর কি চাও?

এটর্নি ধমক দিয়ে বলল–

ঃ সাবধানে কথা বল। তোমার গায়ে এখন মার খাওয়ার মতো শক্তি নেই····। আমরা····পুরোপুরী তৈরী····।

ঃ আমি বললাম– আল্লাহ্ই সাফল্যদাতা এবং সাহায্যকারী।

এটর্নি জিজ্ঞেস করলো–

ঃ মোহাম্মদ কুতুব এবং ইখওয়ানের যুবকরা তোমার বাড়ীতে একত্রিত হতো কেন?

আমি বললাম–

ঃ অধ্যাপক মোহাম্মদ কুতুব এবং তাঁর উভয় বোন প্রায়ই আমার সাথে দেখা করতে আসতেন। শামস্ রেগে গিয়ে গালি উচ্চারণ করে পুণরায় প্রশ্ন করলো–

মোহাম্মদ কুতুব এবং ইখওয়ানের যুবকরা তোমার বাড়ীতে একত্রিত হত কেন? তাই বল।

আমি তার গালি-গালাজের তীব্র প্রতিবাদ করে বলি–

ঃ ছাত্র এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা আমার কাছে দেখা সাক্ষাতের জন্যে আসতো এবং ঘটনাক্রমে অধ্যাপক মোহাম্মদ কুতুবের সাথেও তাদের দেখা হয়ে যেতো।

ঃ সে গর্জন করে বলল– আমি বলছি, যুবকেরা মোহাম্মদ কুতুবের সাথে সাক্ষাৎ করানোর জন্যে তোমার কাছে দাবী তুললে তুমি ওসব যুবক এবং মোহাম্মদ কুতুবকে দুপুরের ভোজে আমন্ত্রিত কর। খাবার পর তারা বৈঠকে মিলিত হয়,···· কেন?

আমি শান্তকণ্ঠে বললাম–

ঃ যখন অধ্যাপক মোহাম্মদ কুতুবের দু'টি গ্রন্থ 'আত্-তাতাউউরু ওয়াস সোবাত ফিল ছায়াতিল বাশারিয়্যাহ' মানব জীবনে স্থিতি ও বিকাশ এবং জাহেলিয়্যাতিল কুরনিল এশরীন' বিংশ শতাব্দীর মুর্খতা প্রকাশিত হল তখন আমার এবং ইসলামী আন্দোলনের কোন কর্মী এই গ্রন্থ দু'টির বিভিন্ন বিষয়াবলী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে অধ্যাপক মোহাম্মদ কুতুবের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছে প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে অধ্যাপক কুতুব বেশ কয়েকবার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন।

এবার সে জিজ্ঞেস করলো–

ঃ আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইল এসব সমাবেশে উপস্থিত থাকতো কেন? আমি বললাম–

ঃ যেহেতু তিনিও ইখওয়ানুল মুসলিমুনের চরিত্রবান যুবকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন····।

সে চরিত্রবান শব্দটির প্রতি বিদ্রুপ করে বলল–

ঃ আল্লাহ্ এসব চরিত্রবানদের মুখাপেক্ষী নন। তা এসব সমাবেশের মধ্যে কোন্ সমাবেশে মোহাম্মদ কুতুব নাসেরকে খুন করার ব্যাপারে একমত হয়?

আমি বললাম– আবদুন নাসেরের খুনের কল্পিত কাহিনী তোমাদের রচিত কৃত্রিম গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

শামস্ প্রশ্ন করলো– তুমি আইনজীবি হওনি কেন?

ঃ আমি বললাম আল্লাহ্র শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে উত্তম অবস্থাতেই রেখেছেন। আমি আল্লাহ্র পথে নিবেদিত প্রাণ, কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথের দায়িত্বই পালন করতে থাকব।

হঠাৎ শামস্ বাদরান উঠে আমাকে বেদম লাথি মারতে শুরু করে। সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলতে থাকে, আজ আর তোর রক্ষা নেই। আমার হাতে তোকে মরতে হবে।

সে অবস্থাতেই সে জিজ্ঞেস করল–

ঃ তুই মোহাম্মদ কুতুবের সাথে মিলে যে সংগঠন কায়েম করেছিলি, তার নাম **কি?** ····আবদুন নাসেরকে খুন করার জন্যে কাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, আবদুল **ফাত্তাহ নাকি আল ফাইউমিকে?**

আমি বললাম–

ঃ আল-ফাইউমিকে তো তোমরা খুন করেছ ···· তার আবার নাম নেওয়ার অর্থ কি?

সে উচ্চস্বরে বীভৎস হাসি হেসে বলল–

ঃ তুমি তাকে জান? সেকি খুবই সুদর্শন ছিল? সাফওয়াত ····সাফওয়াত, ফাইউমিকে এ ভালবাসতো।

সাফওয়াত এসে হান্টার নিয়ে আবার বন্য হায়েনার মতো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি আঘাত সইতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তারা আমাকে কিছুটা সুস্থ করে আরো অত্যাচার-উৎপীড়নের জন্যে তৈরী করার উদ্দেশ্যে আবার হাসপাতালে পাঠায়।

শামস্ তার বিভ্রান্তিতে অটল

আমাকে আবার শামস্ বাদরানের অফিসে পাঠানো হয়। যেহেতু আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে তাই নির্যাতন সইবার জন্যে ওখানে যাওয়া দরকার। অবশ্য ষ্টেচারে করেই আমাকে তার অফিসে পৌছানো হয়। শামস্ তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের সাথে বসেছিল। আমাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল–

ঃ তোমার গায়ে নির্যাতন সইবার ক্ষমতা আর বিন্দুমাত্র নেই। এখন নিজের উপর

নিজে দয়া কর। নয়তো আবদুন নাসেরের শপথ করে বলছি, তোমাকেও ফতোহীর সাথে দাফন করে দেব।

ওর এক পান্ডাও তার সাথে যোগ করে বলল–

ঃ শুন জয়নব, পাশাকে সঠিক জবাব দাও এবং নিজের আখের গুছাও। আমরা তোমার সাথে কোন একটা মীমাংসায় পৌছুতে চাই।

শামস্ বাদরান আরেকটু ঝাঁঝিয়ে বলল– স্মরণ কর, তোমার কাছে ফুয়াদ সিরাজ উদ্দিনের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি এসে নাসেরের সরকার উৎখাতের জন্যে ইখওয়ানের সাথে সহযোগীতা দানের অনুরোধ করে। সেই ব্যক্তি তোমাকে আরো বলেছিল যে, উপদেষ্টা আমেরের অফিসে এমন লোক আছে, যারা তোমার সাথে এবং 'ওয়াফাদ পাঁটির' সাথে সহযোগিতা করবে।

আমি এই শয়তানের মিথ্যে বচন ও সত্য বিকৃত করার পটুতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে এক একটি শব্দের উপর জোর দিয়ে বলি–

ঃ এটা নিছক মিথ্যে কথা। ফুয়াদ সিরাজুদ্দিন এ ব্যাপারে সে ব্যাপারে কোন ব্যাপারে কোন সমস্যা নিয়ে কোন ব্যক্তিকেই আমার কাছে পাঠাননি। বস্তুতঃ গত ১২ বছর ধরে তাঁর সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। ঘটনাচক্রে একবার এক গণপ্রদর্শনীতে ফুয়াদ পাশার সাথে আমার স্বামী মোহাম্মদ সালেম সালেহের দেখা হয়। তিনি আমার স্বামীর কাছে আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন এবং আমার জন্যে সালাম-দোয়া পাঠান।

একথা বলার সাথে সাথে আমার উপর আবার হান্টারের বর্ষণ শুরু হয়। আমার ক্ষত-বিক্ষত দেহের উপর হান্টারের ঘা পড়ছিল আগুনের হল্কার মত। অথচ আমার পায়ে তখন ব্যান্ডেজ বাঁধা। আগের ক্ষত শুকোতে না শুকোতে আবার অজস্র আঘাত আমার দেহ বিদীর্ণ করছিল। জল্লাদ আমার হাতে ও পায়ে হান্টারের আঘাত করতে করতে জিজ্ঞেস করল–

ঃ বল, ফুয়াদ সিরাজুদ্দিন তোকে কোন পয়গাম পাঠিয়েছিল কিনা। আমি বললাম– না।

তখন শামস্ বাদরান আমাকে আরো কঠিন শাস্তি দেয়ার আদেশ দেয়। এরপর প্রচন্ড আক্রমণ শুরু হতেই আমি অচেতন হয়ে পড়ি। অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু একটু পরে আবার তার অফিসে ফিরিয়ে আনা হয়।

ঃ শামস্ বাদরান অত্যন্ত ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল–

ঃ শুনে রাখ, আমাদেরকে বাধা দেয়ার কেউই নেই। তোমার মত কুড়িজন কুকুরকে আমি রোজ দাফন করি। আর এই সামরিক কারাগারের মাঠ এমন হাজার হাজার কুকুরকে গিলে খাওয়ার জন্যে হা করে আছে। আবদুন নাসেরের শপথ! আমার মর্জি মোতাবেক কাজ না করলে তোকেও অন্যান্যদের মত এখানে পুঁতে রাখবো।

আমি এই আহম্মকের প্রলাপের জবাব দেয়ার কোন প্রয়োজন বোধ না করে চুপ রলাম।

সে বেসামাল হয়ে বলল, জবাব দাও। নয়তো উল্টো লটকিয়ে হান্টার দিয়ে পিটাতে পিটাতে শেষ করে দেব।

আমি বললামঃ আল্লাহ্ই উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী। তিনিই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি উত্তম সাহায্যকারী। "হে খোদা, তুমি আমাদেরকে সাহস ও ধৈর্য্যশক্তি দান কর এবং ইসলামের উপর মৃত্যু দান কর।"

এসব ভাল কথা শামসের অসহ্য। সে ক্ষিপ্ত হয়ে সাফওয়াতকে বলল–

সাফাওয়াত, কুকুর নিয়ে এস।

ঃ সাফওয়াত, মুহূর্তেই হিংস্র কুকুর নিয়ে উপস্থিত হলো এবং আমার উপর কুকুরগুলো ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কুকুরের কামড়ের অসহ্য যন্ত্রণায় আমি মুক্তির জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলাম– "হে আল্লাহ্, আমি তোমার সন্তুষ্টিতে তোমার আজাব থেকে রেহাই চাই। হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে এই বিপদ-মুসীবত থেকে উদ্ধার কর।" হামজা চেঁচিয়ে বলল, পাশা এর চেহারা ফিকে হয়ে গেছে। ওর মৃত্যু নিকটবর্তী।

শামস্ এসে আমার অবস্থা দেখে বলল–

ঃ কুকুরদের বের কর আর একে মরার জন্যে হাসপাতালে রেখে এস।

সুতরাং আমাকে ষ্ট্রেচারে করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু সেদিন মধ্যরাতে আমাকে চতুর্থবারের মতো আবার শামসের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের এ এক ন্যাক্কারজনক দৃষ্টান্ত। তাদের হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা ইসলামের সাথে। আর যেহেতু আমি ইসলামের সেবিকা, তাই আমার উপর অত্যাচার চালিয়ে তারা ইসলামের প্রতি তাদের বৈরীতার প্রমাণ পেশ করছে। তারা মনে করেছে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে খুন করে এবং মেরে-পিটে হয়রানি

করে ইসলামের পুণর্জাগরণ ও জয়যাত্রাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। তারা ইসলামকে স্তব্ধ করে দিয়ে বাতিল নাস্তিক্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখছে। যাই হোক, আমাকে ষ্ট্রেচার থেকে নামিয়ে তার অফিসের চেয়ারে বসানো মাত্রই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তারা আমাকে লেবুর শরবত এবং ইঞ্জেকশন্ দিয়ে আবার সচেতন করে।

এবার শামস্ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল–

ঃ দেখ, ভালো করে শোন। তুমি আমাদেরকে বিরাট বিপদে ফেলে রেখেছ। আমরা বন্য বস্তু নই–যেমনটা তুমি আমাদেরকে মনে করছ····আর প্রেসিডেন্ট নাসেরের মন অনেক বড় ····তুমি সব কথা বলে দিলে তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে····। এখন তুমি কমপক্ষে নিজের স্বার্থে আসল কথা বলে দাও।

আমি বললাম–

ঃ সত্যি সত্যিই আসল কথা বলবো? ····শোন তাহলে সত্য কথা এবং আসল কথা হচ্ছে– তোমরা আবদুন নাসেরকে গিয়ে বলে এস যে, তুমি অত্যাচারী এবং জবরদখলকারী– তুমি খোদাদ্রোহী– তুমি অনুতপ্ত হয়ে তাওবা কর-মিথ্যে-বাতিলের পথ ত্যাগ করে সত্য ও সুবিচারের পথে এস-অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এস····।

"যারা মিথ্যের পথে তোমাদের সমর্থন করে এবং যাদেরকে তোমরা তোমাদের জোর-জুলুমের কাজে ব্যবহার কর, তাদের বিবেক মরে গেছে এবং তোমরা সবাই নৈতিক ও মানসিক রোগী।"

ওরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

ঃ তোমার একথা কি আমরা নাসেরের কাছে পৌছাবো?

আমি বললাম–

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে বলার জন্যেই তো তোমাদেরকে এসব বলেছি। ওরা বললো–

ঃ ভীষণ দুঃসাহস করেছো তুমি। এরপর তারা সমস্বরে আমাকে পাগল, পাগল বলে চেঁচিয়ে বললো।

ঃ একে বৈদ্যুতিক শক্ লাগানো দরকার। এমন সময় শামস্ বাদরান হুঙ্কার ছেড়ে বলল–

ঃ গতকাল থেকে যেসব কুকুরকে অভুক্ত রাখা হয়েছে, ওসব কোথায় হামজা? মাঝখানে হাসান অভিনয় করে বলল–

ঃ জয়নব, এখনো প্রাণ বাঁচা! মৃত্যু একদম সম্মুখে। সব ইখওয়ান নিজেদের স্বার্থ চিন্তা করে বেঁচে যাচ্ছে। আমি আশা করি পাশা, আলী উসমাবীকে উপস্থিত করার অনুমতি দেবেন। হতে পারে যে ফুয়াদ সিরাজুদ্দিনের পাঠানো লোক সম্পর্কে জয়নবকে স্মরণ করাতে পারবে।

শামস্ বাদরান বললো—

ঃ এই মেয়ে তুই স্মরণ কর। নয়তো আলী উসমাবীকে ডেকে তোর মোকাবেলায় দাঁড় করাবো।

আমি বললাম, আলী উসমাবী তো সংকীর্ণ-স্বার্থের বিনিময়ে তোমাদের মতো অসভ্য জালিমদের কাছে নিজের বিবেক বিক্রি করে দিয়েছে এবং তা করে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতি বরণ করে নিয়েছে । আর সিরাজুদ্দিনের গল্পও তোমাদের মনগড়া। মহৎ ও ব্যক্তিত্ববান লোকদের অপমান করাই হচ্ছে এসব বানোয়াট কাহিনীর উদ্দেশ্য।

জিজ্ঞাসাবাদের এই কক্ষে সাঈদ আবদুল করীম নামক পদস্থ কর্মকর্তা এসে আলোচনায় শামিল হয়ে বলল—

ঃ জয়নব! সিরাজুদ্দিন সম্পর্কিত ব্যাপারে তোমাকে কয়েকটা সহায়ক তথ্য দিচ্ছি। এতে করে তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারবে! তুমিতো ইখওয়ানুল মুসলিমুনের হুসায়নী আবদুল গাফফারকে জেনে থাকবে। পরে সে সাইয়েদেনা মুহাম্মদের সাথে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তুমি তার সাথে বেশ কয়েকবার মত বিনিময় করেছ। তাকে ইখওয়ানের কাতারে ফিরিয়ে আনাই তোমার উদ্দেশ্য। তুমি তাকে ইখওয়ানের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সক্রীয় তৎপরতা চালানোর জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিলে।

আমি বললাম—

ঃ হাসবুনাল্লাহু ওয়া নেয়'মাল ওয়াকীল। হুসায়নী আব্দুল গাফফার আমার দ্বীনি ভাই! ····আমি তাঁর সাথে পুণরায় ইখওয়ানে সক্রীয়ভাবে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে আলোচনা করি কিন্তু তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তাঁর সাথে সিরাজুদ্দিন বা ওয়াফাদ পার্টির সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। সে সময় তিনি যেহেতু আহ্‌বার যুবদলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এজন্য ওয়াফাদ সংস্পর্শ থেকে দূরত্ব বজায় রাখেন এবং ওয়াফাদকে তিনি সমর্থন করতেন না।

হাসান খলীল বলল—

ঠিক আছে। কিন্তু কোন ব্যাপারে যখন আহ্‌বার, ওয়াফাদ এবং ইখওয়ানের

মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা যে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে।

আমি বললাম-

ঃ মোটেই নয়। ইখওয়ান এবং ওদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। যারা যথার্থভাবে ইসলামী জীবনাদর্শ সম্পর্কে পড়াশুনা করেনি ....শামস্-এর ইঙ্গিতে এসময় আমার উপর চাবুক চালানো শুরু হয়।

আব্দুল করীম শামস্‌কে বললো-

ঃ আরেকটু সময় দিন। সে তার বক্তব্য শেষ করুক।

হ্যাঁ জয়নব, যা বলতে চাচ্ছিলে বল-

আমি বললাম-

ঃ ইখওয়ানুল মুসলিমুন তাদের আদর্শের উৎস, নীতি, উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে দুরদর্শিতার সাথে বিস্তারিত চিন্তা-ভাবনা করে যে নিয়ম ও গঠনতন্ত্র তৈরী করেছে, তা সম্পূর্ণরূপে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উপর ভিত্তিশীল। তারা জীবনের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি মুহূর্ত কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক সম্পন্ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইখওয়ানের কাছে কেবল সেই দেশ বা মাটিই প্রিয়, যেখানে ইসলাম কায়েম থাকবে এবং ইসলামের স্বার্থে তারা শাহাদাত কবুল করে। ইখওয়ান সব মানুষকে স্বাধীন এবং মানুষের এই পৃথিবীকেও স্বাধীন দেখতে চায়। আর তা সম্ভব কেবল আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে।

ইখওয়ান মানুষ ও মাটি উভয়কেই আল্লাহ্‌র নিকটতর করতে চায়। কারণ এতেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত মুক্তি, শান্তি ও সমৃদ্ধি। এভাবে ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়িত হলে কোন শোষণ, কোন অত্যাচার এবং কোন অবিচারের অস্তিত্ব থাকবে না আর। তখন মাটির এই পৃথিবী হয়ে উঠবে বেহেস্তের মতো সুন্দর-শান্তিময়।

প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আংশিকভাবে নয় বরং পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি প্রথমে কোন স্বাধীন দেশ গঠন করে ইসলামের প্রচার করেননি। সামাজিক সংস্কারের দোহাই দিয়ে ইসলাম প্রচার করেননি, গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে বা সম্পদের সমবন্টনের কথা বলেই শুধু ইসলাম প্রচার করেননি- তিনি পরের কাজ আগে বা আগের কাজ পরে করেননি। বরং স্বাভাবিকভাবে একের পর এক করে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে কায়েম করেছেন। প্রিয়নবী সর্বপ্রথম তাওহীদের শিক্ষায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং সব বাতিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এক আল্লাহ্‌র দাসত্বে সংঘবদ্ধ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন

মাবুদ নেই এবং রাসূল (সঃ) হচ্ছেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাসনকর্তা এবং সর্বময় ক্ষমতার মালিক ও সকল মানুষের নেতা।

আল্লাহ্‌ই শ্রষ্টা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা এবং লাভ-ক্ষতির চাবিকাঠিও তাঁরই হাতে। তিনি জীবন-মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি আইন ও বিধানদাতা এবং তিনিই পথ নির্দেশক।

প্রিয়নবী আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক মদীনায় প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন এবং সময়ে অবতীর্ণ কুরআনের পয়গাম মোতাবেক ব্যক্তি সমাজ-রাষ্ট্র তথা দুনিয়ার মানুষের স্বার্থে সত্য, সুবিচার ও সমান অধিকার ভিত্তিক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেন।

শামস্‌ বাদরান বলল–

এসব বুঝি তোমার সিরাজুদ্দিনের ঘটনা বলা হল?

আমি বললাম–

ঃ সিরাজুদ্দিনের ঘটনাতো তোমাদের মনগড়া কাহিনী। যারা এই কাহিনী রচনা করেছে, তারা পয়সার বিনিময়ে মিথ্যে কাহিনী রচনা করেছে। ····আমি সিরাজ সম্পর্কে শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, তিনি একজন দেশপ্রেমিক জাতীয় নেতা। আমার মনে হয় আজকাল তিনি সব রকমের তৎপরতা ছেড়ে দিয়ে অবসর নিয়েছেন।

শামস্‌ বলল–

ঃ সাফওয়াত কুকুর নিয়ে এস।

সাথে সাথে কুকুর এবং মানুষ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কুকুরের কামড় এবং মানুষের হাতে চাবুকের আঘাত আমার সারা শরীরকে রক্তাক্ত করে দেয়।

পাশেই কোথায় ডাক্তার দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তেড়ে এসে কুকুর জল্লাদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেন। ঠিক তক্ষুণি দূর মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসছিল ফজরের আজানধ্বনি। আজান শুনে আমি এতো দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও এক অপূর্ব অস্বাভাবিক প্রশান্তি লাভ করি। আমার মনে পড়লো নমরুদের আগুন থেকে হযরত ইব্রাহীমকে রক্ষার জন্য আগুনের প্রতি আল্লাহ্‌র সেই নির্দেশ–

"হে আগুন! ইব্রাহীমের উপর শীতল ও শান্ত হয়ে যাও।" আমি মুনাজাত করে বললাম, "হে ফরওয়ারদিগার, আমিও তোমার হাবীব মুহাম্মদ (সাঃ) এবং নবী হযরত ইব্রাহীমের অনুসারী। আমাকে শয়তানী চক্রের মোকাবেলা করার জন্যে

সাহস ও শক্তি দাও। তুমি ছাড়া আর কোন খোদা নেই। অবিশ্বাসী পথভ্রষ্ট লোকেরা যাদের উপাসনা করে, আমি তাদের উপাসনা করিনা। তোমার সন্তুষ্টি চাই খোদা! আমিন।" কখন যে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি, তা মনে নেই। পুনরায় যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন আমি হাসপাতালে। এভাবে কতবার যে হাসপাতালে গেছি আর বেরিয়েছি এবং অজ্ঞান-অচেতন হয়ে পুনরায় জ্ঞান-চেতনা ফিরে পেয়েছি, তার সঠিক হিসাব তুলে ধরা কঠিন।

প্রবৃত্তির শাসন ও নীচ লোকদের প্রভুত্ব

অদূরদর্শী উগ্র লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতা; এবং প্রশাসন যখন অযোগ্য লোকদের আয়ত্বে চলে যায় তখন স্বৈরাচারের সবচেয়ে জঘণ্য রূপ সামনে এসে পড়ে। এধরনের স্বৈরাচারী শাসন জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে এবং দেশের অগ্রগতির চাকা উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করে। স্বৈরাচারী গোষ্ঠী নিজেদেরকে সম্পদ ও ক্ষমতার সর্বময় মালিক মনে করে বসে, যা তাদের মর্জি তাই করে চলে। এভাবে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থ তাদের ব্যক্তি স্বার্থের সামনে খর্ব হয়ে যায়। তাদের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে ব্যাপক হারে দূর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে এবং গোটা দেশ ও জাতিকে তারা তাদের মর্জি মতো ব্যবহারের প্রয়াস পায়।

স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের ভিত্তিতে মজবুত করার উদ্দেশ্যে দেশের সচেতন ও দেশপ্রেমিক লোকদের লোভ-লালসা বা ভয়ভীতি দেখিয়ে, হয় নিষ্ক্রিয় করে রাখে অথবা লৌহ-কারাগারের অন্তরালে পাঠিয়ে দেয়। এরপর তারা তাদের মর্জি মোতাবেক আইন তৈরী করে নিরীহ জনগণকে কঠোর শাসনের অক্টোপাশে আবদ্ধ করে রাখে।

শাসন ক্ষমতায় অসীন হয়ে লোক, নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করে মানুষের মান-মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করে এবং জ্ঞান ও বিবেকের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা চালায়। সেই আমলে মিশরের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীও এসব ঘৃণ্যতম উপায় অবলম্বন করে দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রাখে। ফলে দেশের সামগ্রিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। আদালতের স্বাধীনতা খর্ব করা হয় বলে সুবিচারের সব পথ বন্ধ। সরকারী চাটুকারদের উৎপাত উপদ্রবে মানবতা অপমানিত এবং দেশের উপর থেকে আল্লাহ্ও যেন তাঁর দয়া ও রহমতের ছায়া তুলে নেন।

যাই হোক, আমাকে আবার সেই বিভীষিকাময় অফিসে নিয়ে গেলে শামস্ এবং তার সহকারীরা জিজ্ঞেস করলো– আবদুল গাফফার ফুয়াদ সিরাজুদ্দিনের

পক্ষ থেকে যে পয়গাম পৌছিয়েছিল-তা কি? উপদেষ্টা আমেরের অফিসে ফুয়াদ সিরাজুদ্দিনকে সহযোগিতা দানকারী লোক কারা ছিল? আর অভ্যুত্থানের জন্যে ইখওয়ানের কাছে কি কি দাবী করা হয়েছিল?

আমি জবাব দিলাম-

ঃ হুসাইন আবদুল গাফফার আমার দ্বীনি ভাই। আর তাঁর সম্পর্কে তোমাদের মুখে যে সব মিথ্যে ও ভিত্তিহীন অভিযোগ শুনছি- সে ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনা।

সায়াদ ও হাসান খলীল জানতে চাইলো-

ঃ শোন জয়নব, হুসায়নি কি তোমার বাড়ীতে আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইলের সাথে সাক্ষাৎ করেনি? আর তুমি ইখওয়ানুল মুসলিমুনে শামিল হবার ব্যাপারে হুসায়নির সাথে আলোচনা করনি?

আমি জানালাম-

ঃ আমি আন্দোলনে ফিরে আসার ব্যাপারে হুসায়নির সাথে আলোচনা করেছি এবং এটা কোন অপরাধ নয়। হুসায়নি আমাদের আন্দোলনে আস্থাশীল। অবশ্য, হুসাইনি ইখওয়ানে শামিল না হলেও, তিনি ইখওয়ানের সাফল্য কামনা করেন এবং জনগণকে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি ইখওয়ানের অভিমতকে সমর্থন করেন। হুসায়নি এবং আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইল আমার বাড়ীতে ইসলাম ও মুসলমানদের বর্তমান উদ্বেগজনক অবস্থা, মুসলমানদের দারিদ্র, অশিক্ষা ইত্যাদি সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন, এরপর হুসায়নী সেদিন চলে যান।

ঃ এরপর আর একদিন আকস্মিকভাবেই ওঁরা উভয়ে আমার বাড়ীতে এলে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। পরে আবদুল ফাত্তাহ হুসায়নী সম্পর্কে আমাকে বলেন যে-

ঃ হুসায়নী অত্যন্ত ভদ্র, চরিত্রবান, বিজ্ঞ এবং সরলপ্রাণ আলেম। আধ্যাত্মিকতাবাদী সুফীদের সাথে তাঁর গভীর যোগাযোগ রয়েছে-

আমার এতটুকু বলা হলে ওদের মধ্যে একজন বলল-

ঃ হুসায়নী গোটা ব্যাপারটাই আমাদের জানিয়েছে....তুমি অনর্থক ইখওয়ানদের জন্যে বিনিময়ে নিজেকে বলি দিতে চাচ্ছো। এখন দেখছি হুসায়নী এবং ফুয়াদ সিরাজুদ্দিনের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাচ্ছো.... । আমরা কিন্তু তোমাকে শেষ সুযোগ দিচ্ছি। তুমি নিজের ব্যাপারে, বিশেষ করে ওয়াফাদ পার্টির ওসব লোক সম্পর্কে, যারা উপদেষ্টা আমেরের অফিসে কাজ করছে এবং হুসায়নী ও ফুয়াদ সিরাজুদ্দিন সম্পর্কে তোমার অভিমতসহ সবকথা স্পষ্ট ভাবে বলে দাও। ....তোমার

দু'চোখ বের করে তোমাকে অন্ধে পরিণত করে পরে তোমার সামনে হুসায়নি এবং ফুয়াদ সিরাজুদ্দিনকেও আনা হবে।

আমি বললাম-

ঃ আল্লাহ্কে অশেষ ধন্যবাদ যে, আমরা অন্তরের দৃষ্টিতে দেখতে সক্ষম, এবং অন্তরের দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। সুতরাং দু'চোখ উপড়ে ফেললেও আমরা অন্ধে পরিণত হবো না।

আমার স্পষ্ট কথাবার্তা শুনে শামস্ বাদরান এমনভাবে চিৎকার করে উঠলো যেন তাকে সাপে কেটেছে। সে হুঙ্কার দিয়ে বলল-

ঃ সাফওয়াত, কুকুর নিয়ে এস।

ওর এক চাটুকার তাকে বাধা দিয়ে বলল- না পাশা। এই মেয়ে নিজের জীবন সম্পর্কে উদাসীন। সে এখনো তার মৃত্যু সম্পর্কে সংশয়ে ভুগছে।

আমি তার জবাবে বললাম-

ঃ মৃত্যুটা কি আল্লাহ্র হাতে না তোমাদের হাতে? ····জীবন-মৃত্যুর নিয়ন্ত্রক তো একমাত্র আল্লাহ্। তিনিই সব করেন এবং তিনিই সর্বশক্তিমান। শামস্ বাদরানের চারপাশে বসা অফিসারদের মধ্যে একজন বলল-

ঃ পাশা! হুসায়নীকে উপস্থিত করার হুকুম দিন। এরপর সবাই সমস্বরে হুসায়নীকে আনার জন্যে সাফওয়াতকে বলল। কিন্তু শামস্ অত্যন্ত দাম্ভিকতার সাথে তাদের কথা অগ্রাহ্য করে বলল-

ঃ এই মেয়েকে আপাততঃ হাসপাতালে রেখে এস। উল্লুক নাকি রাত না হলে কিছু দেখতে বা করতে পারে না। এদের স্বভাবও অনেকটা উল্লুকের মতো দিনের আলোর চেয়ে রাতের অন্ধকারই এদের কাছে অধিক আকর্ষণীয়। বলাবাহুল্য, আমাকে রাতের অন্ধকারে আবার শামসের অফিসে পৌছিয়ে এক জায়গায় বসিয়ে দেয়া হয়। কয়েক-মুহূর্ত পরে হুসায়নীকে উপস্থিত করা হয়। হুসায়নীর এক হাত ভাঙ্গা এবং ব্যান্ডেজ বাঁধা। ভাঙ্গা হাতটি এখনো তার বুকের উপর ঝুলে রয়েছে। ওর পায়েও আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট। সমগ্র শরীরে অত্যাচারের ইঙ্গিত। অনেক ক্ষত তখনও দগ্দগ্ করছে। হুসায়নী কক্ষে ঢুকেই আমাকে দেখে সালাম জানালো আমিও তার সালামের জবাব দিই।

শামস্ আমাদের সালাম-কালাম দেখে কৃত্রিম রসিকতার সুরে প্রশ্ন করল-

ঃ হ্যাঁ, হুসায়নী সা'ব! জয়নবের সাথে তোমার কি সম্পর্ক ছিল?

জবাবে হুসায়নী বললেন-

ঃ কাগজে সব কিছুই লেখা রয়েছে।

শামস্ কাগজগুলো হুসায়নীর হাতে দিয়ে তা পড়ে শুনাতে বলল-

হুসায়নীকে গিয়ে কাগজে কি লিখানো হয়েছে, তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা ছিল না। আমি বরং ভাবছিলাম যে, এমন কোন কথা বলব যাতে করে হুসায়নী এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। আমার এতে কোন সন্দেহ্ নেই যে হুসায়নীকে অমানুষিক দুঃখ-কষ্ট দিয়ে এরা এদের মর্জি মতো কথা লিখিয়ে নিয়েছে।

হুসায়নী শামস্ বাদরানের দেয়া কাগজ পড়তে শুরু করলো। তাকে এমন কিছু লিখিত ছিল, যা হুসায়নী লিখতে পারে বা এসব কথা ভাবতে পারে বলেও আমার মনে হয়নি। বস্তুতঃ যা তিনি পড়লেন, বাস্তবতার সাথে তার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। একদম মিথ্যে মনগড়া। হুসায়নীর পড়া শেষ হলে শামস্ আমাকে বিজ্ঞের মতো প্রশ্ন করলো-

ঃ যা শুনলে সে সম্পর্কে তোমার মতামত কি?

আমি বললাম-

ঃ ইখয়ানদের উপর তোমাদের জোর-জুলুম অত্যাচার আর অমানুষিক নির্যাতনের ফলেই তিনি তোমাদের কথা মতো এসব ভিত্তিহীন কথা লিখতে বাধ্য হয়েছেন।

শামস্ জিজ্ঞেস করলো-

ঃ যা তুমি শুনলে. তা কি সত্য নয়?

আমি বললাম- হুসায়নী মিথ্যে বলার মতো ব্যক্তি নন। তবে আমার স্থির বিশ্বাস যে, নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে তাকে এসব লিখতে বাধ্য করা হয়েছে।

শামস্ রাগে চিৎকার করে বলল-

ঃ হুসায়নী যা লিখেছে ···· তুমি তাকে এসব বলোনি?

হাসান খলিল বলল-

ঃ আমরা তোমার কাছ থেকে এটা জানতে চাই যে, হুসায়নী যা শুনিয়েছে, তা **ঘটেছিল** কিনা? আরেক জন বলল-

ঃ হুসায়নীকে বাচাঁনোর জন্যে তুমি কি নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে? যেমন তুমি অন্যান্য ইখওয়ানদেরকে বাচাঁনোর জন্যও করেছ?

আমি বললাম, না; আমি আমাকে ধ্বংস করছি না বরং সত্যের পক্ষ অবলম্বন করছি মাত্র।

শামস্ হুসায়নীকে জিজ্ঞেস করল—

ঃ হুসায়নী, তুমি কি জয়নবকে ফুয়াদ সিরাজুদ্দিনের চিঠি পৌঁছিয়েছিলে? আমিও হুসায়নীকে জিজ্ঞেস করলাম—

হুসায়নী, আপনি আমাকে ফুয়াদ পাশা সিরাজুদ্দিনের চিঠি পৌঁছিয়েছিলেন না?

হুসায়নী পাল্টা প্রশ্ন করলেন—

ফুয়াদ সিরাজুদ্দিন সগীর, নাকি মালী পাশা?

আমি বললাম—

ঃ আমি তো কেবল ফুয়াদ পাশা সিরাজুদ্দিনকেই জানি। ফুয়াদ সগীরকে, হুসায়নি?

হুসায়নী বললেন, ফুয়াদ পাশার চাচাতো ভাই।

তখন আমি হুসায়নীকে প্রশ্ন করলাম, তা সেই সমস্যাটা কি ছিল হুসায়নী?

তিনি বললেন—

ঃ যেমন আমি আগেই বলেছি, ওটা খুবই মামুলি একটা প্রসঙ্গ ছিল। ....আলী সোলাইমান তা আমাকে শুনিয়েছিল....আর আমি তা জয়নবের কাছে উল্লেখ করেছি।

শামস্ এবার ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, হুসায়নী, বেরিয়ে যাও।

এরপর আমি শামস্‌কে বললাম—

ঃ বেশ তো, তুমি এই সামান্য একটা কথাকে ষড়যন্ত্র বানিয়ে নিয়েছ? আক্ষেপ, ফুয়াদ পাশার মতো ব্যক্তিত্ব ও তোমাদের জুলুমের হাত থেকে রক্ষা পাননি।

শামস্ সাফওয়াতকে ডাক দিল। আর আমার উপর চাবুকের আঘাত পড়তে লাগল শ্রাবণের বৃষ্টির মতো। চাবুক লাগানো শেষ হলে শামস্ হামজাকে বললো— হামজা, একে হাসপাতালে রেখে এস।

হাসপাতালেও জোর-জুলুম

দ্বিতীয় দিন হামজা একজন সামরিক অফিসার নিয়ে হাসপাতালের ওয়ার্ডে উপস্থিত হয়। হামজা আবদুল মাবুদকে একখানা চেয়ার ও ছোট টেবিল আনতে বলল। চেয়ার, টেবিল এলে হামজা আব্দুল মাবুদকে বলল—

ঃ এই নাও কাগজ। আমার পাশে বস এবং এই মেয়ে যা যা বলবে লিখে যেতে থাক।

সাফওয়াত একটি মোটা ফাইল নিয়ে কক্ষে ঢোকে। হামজা সেই ফাইল থেকে

একটি লিখিত কাগজ বের করে আমাকে বললো, এতে যা লেখা আছে সব কথা তুমি তোমার বিবৃতি হিসেবে লিপিবদ্ধ করাবে। এতে হুজায়বী, সাইয়েদ কুতুব, আবদুল ফাত্তাহ, হাওয়াশ, আবদুল মজিদ প্রমুখের নাম উল্লেখ রয়েছে।

আমি তাকে বললাম–

ঃ আমি যা কিছু জানি, শুধু তাই লিখবো। অন্য কোন কথার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ....আমি এসবকে ইখওয়ানের বক্তব্য বলে স্বীকার করিনে এবং এসব ইখওয়ানদের পক্ষ থেকে লেখা বা বলা হয়েছে বলেও আমি মনে করিনা। যদিও তোমরা তা দাবী করছ।

হামজা বলল– তুমি যা চাও তাই লেখ। আমরা তোমাকে শামসের অফিসে পাঠিয়ে দেব। সেখানে নানা রকমের শাস্তি ভোগ করতে তোমার খুব ভাল লাগবে।

যে কথায় আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন এবং আমাদের সাহায্য করবেন, আমি আবদুল মাবুদকে সে সব কথা লিখতে বলি। এর পরের দিন সকালে আমাকে শামস্ বাদরানের অফিসে নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়। শামস্ কয়েকটি কাগজ নিয়ে তা ছিঁড়ে ডাষ্টবিনে ফেলে অত্যন্ত নোংরা-অশ্লীল ভাষায় গালি দিতে দিতে বলল–

ঃ এ-ই মেয়ে! তুমি কি সব বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে চাও? ইখওয়ানদের সব কথাকেও তুমি ভুল বলতে চাও? অথচ ইখওয়ানরা যা বলেছে, তা যেমন প্রামাণ্য ও যুক্তিসংগত তেমনি বিশ্বাস করারও যোগ্য। এর আগে তুমিও ইখওয়ানদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে নিজেই অনেক কথা বলেছ....তোমাকে ইখওয়ানদের কথা মানতেই হবে।

আমি বললাম–

আমি যা সত্য মনে করি, তার উপর অটল রয়েছি। আমি আমার বিশ্বাস মোতাবেক যা বলার দরকার মনে করি, শুধু তাই বলবো। অবশ্য ইখওয়ানদের কথাবার্তা এবং জবাবের সত্যতা যাঁচাইয়ের অবকাশ আমার নেই। ....তোমরা চাবুকের মুখে তাদেরকে যে সব কথা বলতে ও লিখতে বাধ্য করেছ, তা আমি সব শুনেছি। এখানে সত্য কথা বলার স্বাধীনতা ও অধিকার নেই।

আমার কথা শুনে শামস্ ক্রুদ্ধস্বরে বলল–

ঃ হামজা, একে নিয়ে যাও। আমি এর লাশ চাই। ....এর দাফনের কাগজে আমি নিজেই স্বাক্ষর করবো।

এরপর ওরা আমাকে নিয়ে একটি কক্ষে বন্ধ করে রাখে। এক ঘন্টা পরে

আমাকে বের করে হান্টার চালাতে চালাতে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের পাশে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে বললো। আমি ছয় ঘন্টা পর্যন্ত ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকি। আমার মনে হচ্ছিল, যেন তপ্ত লৌহ-শলাকার উপর দাঁড়িয়ে আছি।

ব্যথা-বেদনা দুঃখ-যন্ত্রণার কথা কতইবা আর বলবো····

মধ্যরাতে আমাকে আবার শামস্-এর অফিসে নিয়ে যাওয়া হলে সে বলল–

ঃ জয়নব, চল আমাদের সাথে চল। প্রেসিডেন্ট নাসের তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন। ····অধিকাংশ ইখওয়ানই তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তুমি যদি আমাদের কথা মেনে নাও তাহলে কাল সকালেই প্রেসিডেন্টের সাথে তোমার দেখা হবে এবং এরপর সোজা বাড়ী চলে যেতে পারবে। তাছাড়া ইসলামী মহিলা সংস্থার সদরদপ্তর, সংস্থার বাজেয়াপ্তকৃত পুঁজি ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং নয়ামিশরস্থ সংস্থার জমিনের উপর ইমারত তোলার জন্যে প্রথম পর্যায়ে ৫০ হাজার জিনিহ্ সাহায্য দেয়া হবে। আর তোমার পত্রিকার পুণঃপ্রকাশনার জন্যে দেয়া হবে দশ হাজার জিনিহ্।

অফিসে অপেক্ষমান অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো–

ঃ নয়ামিশরে কি ইসলামী মহিলা সংস্থার জমিন আছে?

আমি বললাম– হ্যাঁ আছে ···· ৬ হাজার বর্গমিটার।

পরে জানতে পেরেছি এ ব্যক্তির নাম– 'সালেহ নসর'।

সে অবাক হয়ে জানতে চাইলো, এতবড় জমিনের উপর সংস্থা কি করবে? আমি বললাম–সংস্থা, মুসলিম মহিলাদের জন্যে একটি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, মহিলাদের জন্যে একটি মিলানায়তন, একটি অতিথিশালা, একটি কেন্দ্রীয় দফতর, একটি মস্‌জিদ, একটি হেফজ খানা, একটি কুরআন শিক্ষাগার, একটি করে প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং একটি বক্তৃতা প্রশিক্ষণাগার ও একাডেমী কায়েমের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

সে জিজ্ঞেস করলো–

ঃ কোথায় পাবে তোমরা এত টাকা?

আমি বললাম, সার্বজনীন চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে। ····তাছাড়া ক্রমপর্যায়ে কাজ হাতে নেয়া হবে।

সে এবার উৎসাহিত হয়ে বলল–

তবেতো এটাই সুবর্ণ সুযোগ; প্রেসিডেন্ট নাসের তোমাকে এই সুযোগ করে দিয়েছেন। তুমি মুক্তি পেয়ে নিজের বাড়ী যেতে পারবে। তোমার সংস্থা

পুণঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং প্রেসিডেন্টের আস্থাবশতঃ আরো অনেক উদ্দেশ্যই সাধিত হবে।

আমি বললাম-

ঃ আমরা কেবল মহান আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপরই আস্থা পোষণ করি। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও ভালবাসা আমাদের কাছে জান-মাল, টাকা-কড়ি এবং শাসন-ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। আর তোমরাতো মানুষের অধিকার এবং মান-মর্যাদা নিয়ে চিনিমিনি খেলছো। তোমাদের কাছে আমরা কিছুই চাই না। আবদুন নাসেরের সাথে দেখা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আমার নেই। ইসমাইল ফউহী, বাফায়াত বকর এবং আবদুল কাদের আওদার মতো শহীদের রক্তে যার হাত রঞ্জিত····আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে মোটেই প্রস্তুত নই। নিঃসন্দেহে, ওসব শহীদানের রক্ত অনাগত দিন পর্যন্ত তার তাওহীদ বাদীদেরকে সত্য পথের দিশা দিতে থাকবে। ভবিষ্যত বংশধরেরা অতীতের এসব মহান শহীদের আত্মত্যাগের জন্য গর্ব করবে এবং দায়িত্ব পালনে সদা সক্রীয় থাকবে····।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই শক্ত বুটের লাথি আর কঠিন মুষ্ঠাঘাত আমার পিঠে পড়তে লাগলো। শেষ পর্যন্ত সইতে না পেরে আমি অর্ধচেতন হয়ে মাটিতে পড়ি! এরপর শাসম্ বাদরান হুকুম করলো-

ঃ হামজা, একে চৌত্রিশ নম্বর সে'লে রেখে এস। চৌত্রিশ নম্বর সে'ল সে'লই বটে। বলতে পারেন একটি কবর। ঠিক কবরের মতোই সংকীর্ণ এবং অন্ধকার। ভীষণ ভয়ানক। এতে আবার দুটো কুকুরও ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আমি সে'লে ঢোকা মাত্রই তায়াম্মুম করে নামাজ শুরু করে দিলাম। এক নামাজ শেষ হতে অন্য নামাজ। জালিমদের এসব জুলুম ভুলে থাকার জন্যে এবং অন্তরের প্রশান্তির জন্যে নামাজের চেয়ে উত্তম উপায় বা বিকল্প আর কিছুই নেই। জলিমদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্যে আমি আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করি। ····পা, পিঠে এবং সারা শরীরের হাড়ে হাড়ে অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও নামাজ আদায় করে আমি শান্তি পাচ্ছিলাম।

এক ঘন্টা পরে দরজা খুলে সে'ল থেকে কুকুর দু'টিকে বের করে নেয়া হয় এবং আমাকে হাসপাতালে পৌছানো হয়। কিন্তু রাতে এশার নামাজের পরে আমাকে আবার শামসের অফিসে হাজির করা হয়।

সে অফিসে ঢুকতেই বললো- জয়নব, তোমার বাড়ীতে একদিন এক সমাবেশ হয়। তাতে মিশরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ইখওয়ানের পঞ্চাশ জন শামিল হয়।

তিন বছর আগে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশ কেন হয়েছিল?

আমি বললাম–

ঃ আমরা মাগরীব, এশা এবং তারাবীর নামাজ জামায়াতে পড়েছি।

ঃ আমি জানতে চাচ্ছি সমাবেশের উদ্দেশ্য কি ছিল?

আমি বললাম, তা আমার মনে পড়ছে না।

ঃ ওরা তোমার ওখানে নাস্তা করেছিল?

ঃ হ্যাঁ, ওদের মধ্যে কিছু লোক নাস্তা করেছিল।

ঃ সমাবেশ কেন হয়েছিল?

আমি বললাম–

ঃ বাতিল শক্তিবর্গ আমাদের দেশ ও সমাজে নাস্তিক্যবাদী ধ্যান-ধারণা প্রচারের জন্যে যেভাবে আদা-জল খেয়ে উঠে পড়ে লেগেছিল, তার মুকাবেলা করার উদ্দেশ্যে আমরা ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে লেখা-পড়া এবং মত বিনিময় করি।

সে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু তা তোমার বাড়ীতেই কেন?

ঃ যেহেতু আল্লাহ্‌র ফজলে আমিও মুসলমান, তাই।

সে জানতে চাইলো, বাতিল কি? ইসলাম কি? এবং নাস্তিক্যবাদ কি?

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম–

ঃ তুমি যাতায়াতের পথে অবশ্যই দেখে থাকবে যে দোকানে দোকানে এমনকি ফুটপাতেও নাম মাত্র মুল্যে অশ্লীল পত্র-পত্রিকা এবং কম্যুনিজমের প্রচার সম্পর্কীয় বই-পত্তুক এবং সাময়িকী বিক্রি ও বন্টন করা হচ্ছে।

আর....

সে আমাকে আর বলতে না দিয়ে বলল–

ঃ ব্যাস, ব্যাস, যতসব বাজে কথা। এখন তোমার কাছে সমবেত লোকদের নাম বল।

আমি বললাম, প্রত্যেকের নামতো আমার স্মরণ নেই।

সে জিজ্ঞেস করলো–

ঃ সমাবেশ থেকে এক ব্যক্তি উঠে হুজায়বীর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং পরে আবার হুজায়বীর বাড়ীতে টেলিফোনে যোগাযোগ করে। এরপর সে চলে যায়। কে সে ব্যক্তি?

আমি বললাম–

ঃ আমার মনে নেই। তবে যতটুকু আমার মনে পড়ে, সে ব্যক্তি হুজায়বী সাহেবের সাক্ষাতের জন্যে আমার অনুমতি চেয়েছিল। তা, তাতে কি হয়েছে

সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো–

ঃ তোমরা একত্রিত হতে কেন? ....আর হ্যাঁ, আমি তোমার জবাব সহজ করে দিচ্ছি। ....ঐ সেই ব্যক্তি, যে হুজায়বীর কাছে গিয়েছিল, তার কি আবদুল ফাত্তাহ শরীফ নয়? ....তুমি যদি ঠিক জবাব না দাও তাহলে তোমাকে লটকিয়ে দেয়া হবে। ....তোমরা সরকার পরিবর্তনের এবং নাসেরকে খুন করার ব্যাপারে একমত হয়েছিলে।

আমি বললাম–

ঃ আমরা মুর্খতা, নাস্তিক্যবাদ, অশ্লীলতা, কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে এবং কুরআনের শিক্ষা প্রচার করে মুসলমানদের কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুসরণে জীবন যাপনে প্রস্তুত করার ব্যাপারে একমত হয়েছিলাম।

সে মুখ ভেংচিয়ে বললে:–

ঃ তাহলে আল-আজাহারের কি কাজ? বলতো, আল-আজাহার বিশ্ববিদ্যায়ের দায়িত্ব কি? তারপর সে সাফওয়াতকে ডেকে বলল–

ঃ সাফওয়াত, একে উল্টো লটকিয়ে চাবুক লাগাও।

চাবুকের প্রহার শুরু হয়ে গেল আর আমি আল্লাহ্-আল্লাহ্ বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া পর্যন্ত চাবুকের তীব্র-তীক্ষ্ণ আঘাত সইতে থাকলাম।



পঞ্চম অধ্যায়

নাসেরের উপস্থিতিতে নির্যাতন

জ্ঞান ফিরে এলে দেখতে পেলাম, অনেকগুলো লোক আমাকে ঘিরে রয়েছে। আমি হিম-শীতল অবস্থায় মেঝেতে লুটিয়ে আছি। আমাকে ওষুধপত্র খাওয়ানোর পর কোন রকমে উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখি, এক পাশে প্রেসিডেন্ট নাসের, আব্দুল হাকিম আমেরের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে তার হাতে ছিল কালো গগলস্। প্রেসিডেন্ট নাসের এবং আব্দুল হাকিমকে দেখে আমার ব্যথা-বেদনার কথা ভুলে গিয়ে দেহ এবং মনে এক নতুন সচেতনতার প্রবাহ অনুভব করি। আমি মনে মনে পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্যে তৈরী হই।

আমাকে এক পেয়ালা রস দেওয়া হয়, আমি তা পান করি। এরপর কয়েকজন আমাকে মাটি থেকে তুলে একখানা চেয়ারে বসিয়ে দেয়। তারা আমাকে কফি ভরা একটি ফ্লাক্সও দেয়। কিন্তু সেদিকে আমার তেমন কোন আগ্রহ ছিল না।

পরিবেশ দেখে স্বাভাবিক ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে বলে আমার ধারণা হল।

শামস্ বাদরান কথার শুরুতেই বললো–

ঃ দেখ জয়নব; আমি আমার প্রত্যেক প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব চাই। নইলে····। জয়নব, মনে কর ইখওয়ানুল মুসলিমুন দেশে সরকার পরিচালনা করছে আর আমরা তোমাদের সামনে মামলার আসামী হিসেবে উপস্থিত, তখন তোমরা আমাদের সাথে কি ব্যবহার করবে?

আমি সম্পূর্ণ শক্তি ও সাহসিকতার সাথে বললাম–

ঃ যারা নিজেরা নিজেদের উপর জুলুম করে আমরা তাদের অন্তর্ভূক্ত নই। আমরা আমাদের হাতকে কোন মন্দ কাজে ব্যবহার করতে রাজী নই, যেমন অত্যাচারীরা তাদের হাতকে মন্দকাজে তৎপর রেখেছে। আমরা আমাদের হাতকে রক্তরঞ্জিত করতে চাইনা। অত্যাচারীদের আসনে বসার কোন আকাঙ্খাও আমরা পোষণ করি না।

সে ধমক দিয়ে বলল–

ঃ থামো, আমি, জিজ্ঞেস করছি, তুমি যদি আমার স্থলে এই চেয়ারের মালিক হও তাহলে আমার সাথে কি ব্যবহার করবে?

আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম–

ঃ আমরা সত্যাকাঙ্ক্ষী লোক এবং সত্যের পথই অনুসন্ধান ও অনুসরণ করছি। সরকারী ক্ষমতা অর্জন আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং আমরা হচ্ছি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর' পতাকাবাহী এবং এই কালেমা ও পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য নিবেদিত প্রাণ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিন ব্যক্তিদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।

শামস্ বাদরান দাঁতে দাঁত কষে বলল–

ঃ চুপ, এই মেয়ে! আমি আবার প্রশ্ন করছি; যদি তোমাদের হাতে ক্ষমতা আসে তাহলে তোমরা আমাদের সাথে কি ব্যবহার করবে?

আমি ধীর শান্ত কণ্ঠে বললাম–

ঃ আমরা ক্ষমতার অভিলাষী নই। উচ্চতর দায়িত্বও আমাদের কাম্য নয় বরং শরীরে বিশেষ রক্তবিন্দু অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত মহান ইসলামী আদর্শের শিক্ষা ও পয়গামকে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছানোর কর্তব্য পালনে সক্রীয় থাকবো। ....আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করতে এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে তাঁর দুনিয়াতে বাস্তবায়নের কাজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা ইসলামী জাগরণ সৃষ্টির জন্যে এবং ইসলামের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার মহান ব্রতে দৃঢ় সংকল্প।

শামস্ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল–

ঃ চুপ.... চুপ....থামো! আমি একটি প্রশ্নের জবাব চাই, মনে কর, যে চেয়ারে আমি বসে আছি তুমি তাতে বসে আছ এবং তোমার সামনে আমি আসামী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছি; তখন তুমি আমার সাথে কি ব্যবহার করবে?

আমি তেমনি স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললাম–

ঃ কোন কোন সময় ইসলামী শাসন কায়েমের কাজে যুগ যুগ কেটে যেতে পারে। আমরা তড়িঘড়ি কোন পদক্ষেপ নিতে চাই না। ....যেদিন ইসলামী শাসক প্রতিষ্ঠিত হবে– মুসলিম মহিলারা তাদের স্বাভাবিক স্থান থেকে জাতি গঠনের বৃহত্তর দায়িত্ব পালন করবে।

শামস্ মরুপ্রান্তরে দিকহারা মুসাফিরের মতো চেঁচিয়ে বলল–

ঃ এ-ই মেয়ে.... মনে কর, তুমি যদি আমার স্থানে এসে বস তাহলে আমার সাথে কি ব্যবহার করবে?

আমি বললাম–

ঃ ইসলাম-সুবিচার, ন্যায়-নীতি, দয়া, মহানুভবতা ও সার্বজনীন সাম্যের আদর্শ। এখানে চাবুক আর হান্টার, কারানির্যাতন, দেশত্যাগ, জীবন্ত দাফন, জোর-জুলুম, ইয়াতীম ও বিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি জঘন্য শাস্তির কোন অবকাশ নেই। ইসলামের বিচার-ব্যবস্থা সত্য ও যুক্তির উপর ভিত্তিশীল। এখানে অবিচার বা জোর-জুলুমের কোন স্থান নেই। সত্যভিত্তিক যুক্তি-প্রমাণই ইসলামী বিচার ব্যবস্থার মোদ্দা কথা। শামস্ এবার ভূলুণ্ঠিত কুস্তিগীরের মতো বললো-

ঃ থামো থামো! সাফওয়াত; একে লটকিয়ে দাও এবং চাবুক লাগাও।

সাফওয়াত আমাকে লটকিয়ে দিয়ে ব্যান্ডেজ মোড়া সারা শরীরের উপর চাবুক চালাতে লাগল। রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। আর আমি অচেতন হয়ে পড়ছিলাম। ডাক্তার আমাকে ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিয়ে বললেন-

ঃ এ তো সাংঘাতিক অবস্থা! এতে করে তিনি মরেই যাবেন।

শামস্ চেচাঁলো-

ঃ মন্দবুদ্ধি; ধোকাবাজ....। অন্য একজন অফিসার বলল-

ঃ আদালতে দাঁড় করানোর জন্যে আমরা ওকে জিন্দা রাখতে চাই।

শামস্ বলল-

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরাও চাই সে জীবিত থেকে আদালতে উপস্থিত হোক এবং জাতি -এর নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করুক।

ডাক্তার বললেন-

ঃ কয়েকটি ওষুধের খুবই প্রয়োজন, ওসব আমাদের কাছে নেই।

শামস্ বলল-

ঃ উপদেষ্টা আমেরের মেডিক্যাল ষ্টোর থেকে আনিয়ে নাও।

এরপর আমাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সে রাতের অন্যান্য ঘটনাবলী আমার স্মরণ নেই। তবে প্রেসিডেন্ট নাসের ও আবদুল হাকীমের উপস্থিতিতে, শামস্ বাদরানের সাথে প্রশ্নোত্তর জবাবকালে আমার যা বলার প্রয়োজন ছিল, তা বলে দিয়েছি।

আসল চক্রান্তঃ গুজব

তাদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে আমাকে আরো কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখা দরকার তাই আমার চিকিৎসা করানো হচ্ছিলো। আমি এমন লোকদের সামনে আসামী হিসেবে উপস্থিত ছিলাম-যাদের পেশা এবং নেশা হচ্ছে মিথ্যে মামলা তৈরী করে

নির্দোষীকে দোষী এবং দোষীকে নির্দোষ ঘোষণা করে বীরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠা করা। এরা তাদের জীবন স্বার্থ হাসিলের জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারে। অভিনয়, জোর-জুলুম-লালসা-প্রবঞ্চনা এবং বিশ্বাসঘাতকতায় এরা বিশেষভাবে অভ্যস্ত। আদালতে উপস্থিত হতে সক্ষম করে তোলার জন্যে আমাকে যে ওষুধ-পত্র দেয়া হচ্ছে- এটা কোন তাজ্জবের ব্যাপার নয়।

তিন দিন পর্যন্ত অজ্ঞান অবস্থায় থাকার পর চতুর্থ দিন বিকেলে জ্ঞান ফিরে এলে পার্শ্ববর্তী ভাই আহমদের সে'ল থেকে মুরাদ ও সাফওয়াতের কণ্ঠস্বর শুনলাম। তারা ওর কাছে সাইফুল ইসলাম আল-বান্নার ঠিকানা জিজ্ঞেস করছিল। তিনি তাদেরকে ঠিকানা জানাতে বাধ্য হলেন। এরপর প্রায় তিন ঘন্টা পরে ওরা আবার ভাই আহমদ কামালের কাছে ফিরে এসে সাইফুল ইসলাম আল বান্নার অফিসের ঠিকানা চাইলো।

সাইফুল ইসলাম বান্না হচ্ছেন শহীদ ইমাম হাসানুল বান্নার ছেলে। ....আমি তাঁদের পরিবারের প্রত্যেকের নিরাপত্তার জন্যে আল্লাহ্র কাছে মোনাজাত করলাম। কারণ তাঁর মা ছিলেন হৃদরোগে আক্রান্ত এবং সাইফুল ইসলাম একাই সারা পরিবারের দেখাশোনা করছিলেন। এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যবর্গের বিরুদ্ধে এসব জালিমদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হয় যেন, আল্লাহ্র কাছে এই দোয়া করলাম।

পরে আমাকে ষ্ট্রেচারে করে শামস্ বাদরানের অফিসে নেয়া হলে তার এক প্রশ্ন শুনে বিশ্বাস না করে আর উপায় রলো না যে তারা সাইফুল ইসলামকেও গ্রেফতার করে এই সামরিক কারাগারেই বন্দী করে রেখেছে। এতে করে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়লাম আমি।

এ সময় শামস্ হামজাকে ডেকে বলল-

ঃ আমি তোমাকে বলেছিলাম এই মেয়েকে যেন জীবিতাবস্থায় আমার অফিসে না আনা হয়। ....এই দেখ এখনো ওর শ্বাস চলাচল করছে।

এরপর আমার দিকে চেয়ে বলল-

ঃ তুমি এখনো বেঁচে আছ? কিন্তু কেন? ....

আমি তাকে বললাম-

ঃ জীবন মৃত্যু তোমার বা আমার ইচ্ছাধীনে নয়। বরং আল্লাহ্ই জীবন মৃত্যুর ফয়সালা করেন।

সে গর্জে উঠে বলল- ব্যাস-ব্যাস, চুপ কর। আমি শুধু আমার প্রশ্নের জবাব চাই। ....বল, সামরিক বাহিনীর কোন কোন ব্যক্তি আলেকজান্দ্রিয়ার পথে নাসেরকে খুন করতে চেয়েছিল?

হাসান খলীল শামস্‌কে বলল-

ঃ আমাকে কথাটা বুঝিয়ে বলার অনুমতি দিন পাশা। শামস্‌ মাথা নেড়ে অনুমতি দিলে হাসান বললো-

ঃ একব্যক্তি তোমাকে এসে বলেছিল যে, মোটরযোগে আলেকজান্দ্রিয়া যাওয়ার পথে নাসেরকে হত্যা করার জন্যে সৈন্যদের একটি দল মরুভূমিতে ওৎ পেতে বসেছিল। এই ঘটনা তোমাকে কে শুনিয়েছিল এবং নাসেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কারা কারা জীপে বসেছিল?

শামস্‌ বাদরান বললো- এবার জলদি জবাব দাও।

আমি বললাম-

ঃ কতো তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়ে নিছক সন্দেহের বসে তোমরা লোকদের উপর অত্যাচারের পাহাড় ভাঙ্গাচ্ছো। আল্লাহ্‌ তোমাদের নিপাত করুন। .....তোমরা ধ্বংস হও এবং গোটা জাতির পক্ষ থেকে তোমাদের উপর অভিশাপ.... ।

এসব কথার জবাব সেই একই; হান্টার চাবুকের ভীষণ মার। আমাকে এমন বেদম প্রহার করা হলো যে ব্যান্ডেজ ফেটে রক্ত গড়াতে লাগলো।

হাড়-গোড় ভেঙ্গে চুরচুর অবস্থা।

শামস্‌ বললো-

ঃ আমরা তোমাকে লটকিয়ে দিলে তুমি মরেই যাবে.....অবশ্য তুমি ঘটনাটা খুলে বললে আমরা তোমাকে ক্ষমা করবো। .....বল, শুরু থেকে ঘটনা খুলে বল। সাইফ তোমাকে যা বলেছিল, তা বলে যাও।

আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম- ওহ, সাইফের বর্ণিত সেই গুজব?

শামস্‌ তেড়ে এসে লাথি মেরে দাঁত খিঁচিয়ে বলল- হ্যাঁ, সেই গুজব।

আমি বললাম-

ঃ আমি যখন শহীদ হাসানুল বান্নার বাড়ীতে ছিলাম তখন সাইফ এসে বললো যে, লোকেরা একটি গুজব নিয়ে বলাবলি করছে.....তাহলো নাসের মোটরযোগে আলেকজান্দ্রিয়া যাওয়ার পথে তাকে হত্যা করার জন্যে সামরিক বাহিনীর কয়েকজন লোক জীপ নিয়ে লুকিয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নাসেরের যাত্রাপথ পরিবর্তন করা হয় এবং নাসের ট্রেনযোগে যাত্রা করে। মজার কথা হলো জীপটি পালিয়ে যায় এবং ওসব লোককে সনাক্ত করা যায়নি।

আমি সাইফকে বললাম-

ঃ আসলে এটা গুজব; কোন জীপ এভাবে ওৎ পেতে ছিল বলে আমি মনে করি না। বরং ঘটনাটা গোয়েন্দা বিভাগেরই তৈরী গল্প। এভাবে প্রায় প্রতিদিনই তারা

নাসেরের হত্যা-ষড়যন্ত্রের গুজব ছড়িয়ে থাকে। এবং কৃত্রিম গুজবের ভিত্তিতে হাজার হাজার সামরিক ও বেসামরিক লোককে গ্রেফতার করার খবর নিত্য শুনে আসছি।

সাইফ বলল–

হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা শ্রেফ গুজব বৈকি কিছুই নয় এবং জনসাধারণও এটাকে গুজব বলেই ধরে নিয়েছে।

আমি বললাম–

ঃ কেউ তাকে হত্যা করার চিন্তা করে না। কারণ জালিম-অত্যাচারীকে হত্যা করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। আসল সমস্যা নাসেরকে খুন করার চেয়েও গুরুতর। আর তা হচ্ছে দেশকে মূর্খ, খোদাদ্রোহী এবং অত্যাচারী শাসকদের নাগপাশ থেকে মুক্ত করা।

সাইফ বললেন, ব্যক্তিত্বের পরিশুদ্ধি এবং ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণের দিকেই লোকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিৎ।

আমি বললাম–

ঃ যাই হোক, গুজব ছাড়া এই দেশকে কে ধ্বংস করেছে? জনসাধারণ আজ গুজবকেও একটা অবলম্বনের বিষয় মনে করে নিয়েছে। কারণ এসব গুজবের ভিত্তিতেই অনেক বীর-পুরুষ এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে।

এরপর সাইফুল ইসলামের সাথে আমার আলোচনা শেষ হয়ে যায়।

শামস্ বাদরান বলল–

ঃ এই ঘটনা সম্পর্কে তোমার বাড়ীতে আবদুল ফাত্তাহ ও আলী উস্মাবীর মধ্যে আলোচনা হয় এবং তোমার সেই চক্রান্তের পরিকল্পনা এবং তার ভুল ত্রুটি পর্যালোচনা করেছিলেন, কিন্তু কেন?

আমি জবাব দিলাম–

ঃ তা তো হয়নি। আমি শুধু সাইফুল ইসলামের কাছ থেকে শোনা কথা ভাই আবদুল ফাত্তাহ্‌কে বলেছিলেন যে এই গুজব....

এইটুকু বলতেই লাথি আর ঘুঁষির বর্ষণ শুরু হল। শামস্ জিজ্ঞেস করলো–

ঃ তুমি এই ঘটনা হুজায়বীকে শুনিয়েছিলে কেন? কারা কি বলছে না বলছে, তা নিয়েই তুমি বলাবলি কর কেন?

আমি বললাম–

ঃ তা ঠিক, কিন্তু এ ব্যাপারে কারো মাথা ব্যথা হবে কেন?

ব্যাস, আবার হান্টারের আঘাত।

শামস্ এবার বলল–

যাকগে, আমরা এবার সাইফের বিষয় ছেড়ে অন্য বিষয় নিয়ে আলাপ করবো····।

ঃ তা বলতো, সাইয়েদ কুতুবের কারাগার থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত আবদুল আজীজ আলী ইখওয়ানের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করছিল..... ।আমাকে বল এটা কেমন করে হয়েছে?

আমি বললাম– তা ঠিক নয়।

সে জিজ্ঞেস করলো–

ঃ কেন ঠিক নয়? আবদুল আজীজ, আলী উসমাবী, আবদুল ফাত্তাহ, জিরা, ইয়াহিয়া, সাজলী এবং মজিদের সাথে বৈঠক করতো ও সাইয়েদ কুতুবের মুক্তির পর বেশ কয়েকবার তার সাথে সাক্ষাৎ করে।

আমি জবাবে বললাম–

ঃ এসব বৈঠক সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা।

শামস্ বলল–

ঃ তুমি ছাড়া আর কে জানবে? এসব বৈঠক সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত ছিলে।

আমি বললাম– এটা মিথ্যা অপবাদ।

শামস্ ধমক দিয়ে বলল–

আমি এক্ষুণি মজা দেখাচ্ছি···· তুমি নিজের ভালমন্দ দেখতে পাচ্ছ না এবং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিও ব্যবহার করছো না।..

উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে তার এক চাটুকার বলল–

ঃ একজন গরম হলে অন্যজনকে নরম হতে হয়····।

পাশা; এক মিনিট সবুর করুন। আমি চেষ্টা করে দেখছি।

এরপর আমার দিকে চেয়ে বলল–

ঃ জয়নব; হুজায়বী এবং আবদুল আজীজ উভয়েই সব স্বীকার করে নিয়েছে। এখন অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। নাসেরকে হত্যা করার জন্যে আবদুল আজীজের তৈরী বিষ ব্যবহারের কথা ছিল ইসমাইলের। বিষ প্রয়োগের ঘটনাটা কি ছিল এবং এ ব্যাপারে কি করে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়?

আমি উচ্চস্বরে বললাম–

ঃ তোমরা সব নাসেরের হত্যার নামে পাগল হয়ে রয়েছে। সত্যি সত্যিই যদি তোমরা তাকে খতম করতেই চাও তো খতম করে আমাদেরকে মুক্তি দাও। আমাকে আবদুল আজীজ এবং ইমাম হুজায়বীর সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করে দাও।

তারা বলল- না, আমরা প্রথমে তোমাকে আলী উসমাবীর সাথে সাক্ষাৎ করাবো।

আমি বললাম- আলী উসমাবী এক নম্বর মিথ্যুক ব্যক্তি। সে তোমাদের ভাড়াটে লোক আমি তার সাথে কথা বলবো না।

শামস্ বাদরান জিজ্ঞেস করলো- আলী উসমাবী কি তোমাদের একজন নয়?

আমি ওর প্রশ্ন উপেক্ষা করে বললাম-

ঃ আমাকে শ্রদ্ধেয় আবদুল আজীজ এবং জনাব ইমাম হুজায়বীর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দাও।

হাসান খলীল বলল-

ঃ তা ঠিক আছে, আমরা তোমাকে তাঁদের সাথে দেখা করাবো।

শামস্ বাদরান বলল-

ঃ তুমি আবদুল আজীজকে ইখওয়ানের নেতৃত্বদানের ব্যাপারে তার উপস্থিতিতে কখন হাসান হুজায়বীর সাথে পরামর্শ করছিলে?

আমি বললাম- এমন কোন কথা হয়নি।

শামস্ আলী উসমাবীকে ডেকে আনার জন্যে সাফওয়াতকে পাঠালো।

আলী উসমাবী বেশ কেতাদুরস্ত হয়ে এলো। তার পরণে যেমন উত্তম রেশমী পরিচ্ছেদ তেমনি সুন্দর করে আচঁড়ান চুল এবং তার সাথে ওদের মিষ্টি ব্যবহার আমাদের সাথে তাঁর বিশ্বাসঘাতকার প্রমাণই পেশ করছিল।

শামস্ তাকে স্নেহের স্বরে বলল-

ঃ আলী, জয়নবের যখন পা ভেঙ্গে যায়, তখন সে গাড়ী থেকে না নেমে এ ব্যাপারে হুজায়বীর মতামত জানার জন্যে তোমাকে তার মেয়ের কাছে পাঠানো হয়। কেন এমন করা হয়েছিল?

আলী উসমাবী বলল-

ঃ জী হ্যাঁ, আমি হুজায়বী সাহেবের মেয়েকে গিয়ে বলি তিনি যেন আবদুল আজীজের উপর আস্থা সম্পর্কে তার আব্বার মতামত জিজ্ঞেস করেন। ....তিনি ভারপ্রাপ্ত নেতৃত্বের জন্যে আবদুল আজীজের নির্বাচনের পক্ষে জনাব হুজায়বীর মতামত ও সমর্থন নিয়ে আসেন।

শামস্ আমাকে জিজ্ঞেস করল-

ঃ এবার তোমার মত জয়নব?

আলী উসমাবীকে লক্ষ্য করে বললাম-

ঃ ভীষণ মিথ্যেবাদী তুমি.....। আসলে তুমি আমাকে বলেছিলে যে, একজন ইখওয়ানী আবদুল আজীজের নাতনির বিয়ের পয়গাম দিতে ইচ্ছুক, এ ব্যাপারে সে জনাব হুজায়বীর মতামত নিতে চায়। ঘটনাক্রমে আমি গাড়ীতে করে বেরুচ্ছিলাম, তখন তুমিও আমার গাড়ীতে উঠে বস। আমি তোমাকে বলেছিলাম যে····আহত পা নিয়ে আমি জনাব হুজায়বীর বাড়ী পর্যন্ত যেতে সক্ষম নই····। জনাব হুজায়বী বিয়ের প্রস্তাব শুনে বলেছিলেন যে, আবুদল আজীজের পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসার কিছুই নেই····সত্যিকারের মুসলিম পরিবারই বলতে হয়····। এই বিয়েতে আল্লাহ্ বরকত দেবেন।

শামস্ জিজ্ঞেস করলো- আলী এর কথা কি সত্য?

আলী উসমাবী বলল পাশা- এসব তার পারিভাষিক কথা। জয়নব এ ধরনের পারিভাষিক বলতে খুব পাকা।

আমি তার কথা শুনে তাকে প্রত্যক্ষভাবে বললাম-

ঃ আলী, তুমি এক নম্বরের মিথ্যুক এবং বেঈমান। তুমি তোমার কৃত অপকর্মের জন্যে একদিন অবশ্যই অপমানি হবে। ····ইখওয়ানদেরকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হচ্ছে; তাদের উপর হান্টার আর চাবুকের অবিরাম বর্ষণ চলছে, তাদের উপর কুকুর ছেড়ে দেয়া হচ্ছে- আরো কত রকমের নিষ্ঠুর জুলুম চলছে। আর তুমি এদের ভাড়াটে দালালের ভূমিকা পালন করছো। এজন্যেই এরা তোমার কথাকে বিশ্বাস করে।

শামস্ আলীকে যেতে নির্দেশ করে বলল-

ঃ জয়নব, আমরা তোমাকে সর্বশেষ সুযোগ দিচ্ছি। সংগঠনের সাথে আবদুল আজীজের সম্পর্কের ব্যাপারে আমাকে বিস্তারিত জানাও। তোমার মাধ্যমে হুজায়বী এবং আবদুল আজীজের মধ্যে যে চিঠি পত্রের আদান-প্রদান চলে, সেসব খুলে বল।

আমি এসব কথা এড়িয়ে গিয়ে বললাম-

ঃ আমি, জনাব আব্দুল আজীজ ও জনাব হুজায়বীর সাথে দেখা করার ব্যাপারে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

শামস্ বাদরান সাফওয়াতকে ডেকে বলল-

ঃ আবদুল আজীজ এবং হুজায়বীকে না আনা পর্যন্ত একে এখান থেকে নিয়ে যাও।

সাফওয়াত আমাকে একটি দেয়ালের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে আবার শামস্ এর অফিসে নিয়ে গেল। কিন্তু আব্দুল আজীজ এবং হুজায়বী কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

আমি জানতে চাইলাম.....

ঃ আব্দুল আজীজ এবং হুজায়বী সাহেবরা কোথায়?

শামস্ ঝাঁঝিয়ে বলল– আমরা কি তোমার কথামত কাজ করবো? আমরা যখন যাকে যে সময় প্রয়োজন মনে করবো ডেকে আনবো। ····তোমাকে দেখছি আগের শাস্তিই আবার দিতে হবে।

আমি তার অভিশপ্ত চেহারার দিকে চেয়ে বললাম–

ঃ তুমি যখন আল্লাহ্‌কেই ভয় করনা, তো মানুষকে কতটুকু শরম করবে?

হাসান খলীল এসে বলল– দেখ মেয়ে, আমার সাহায্য নাও। পাশা তোমাকে আদালতে সোপার্দ করতে চাচ্ছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম– আদালত? কিসের আদালত? তোমরা কারা?

শামস্ বলল–

ঃ আমরা তোমাকে আদালতে পেশ করার জন্যে তৈরী করবো।

আমি বিদ্রুপ করে বললাম–

ঃ আদালতে পেশ করার প্রস্তুতিই বটে! চাবুক, হান্টার, কুকুর, আগুন আর পানির সে'ল, জবাইকৃত পশুর মতো উল্টো লটকিয়ে মারপিট করা, অশ্লীল নোংরা ভাষায় গালি-গালাজ করা, ক্ষুধায়-পিপাসায় কাতর করে রাখা, দীর্ঘদিন পর্যন্ত মল-মুত্র ত্যাগ করার সুযোগ না দেয়া, তদন্তের নামে রাত দিন অফিসে অফিসে ঘুরিয়ে হয়রানী করা, পাশবিক নির্যাতন চালানো, যান্ত্রিকভাবে কঠিন শাস্তি দেয়া– ইত্যাদি নির্মম ব্যবহার করে বুঝি আমাকে মিশরের আদালতে পেশ করার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

মোহাম্মদ কুতুব

শামস্ এর অফিসে হাসান খলীল বললো, আমরা আদালতের কাজকর্ম শুরু করার আগে ডঃ মাসুদের সমস্যা বিবেচনার জন্যে মুহাম্মদ কুতুবের সংগঠন সংক্রান্ত বিষয়াবলীর আলোচনা শেষ করতে চাই।

শামস্ হঠাৎ যেন কোন হারানো বস্তু ফিরে পেল বা ভুলে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে পড়লো– তেমনি ভান করে অভিনয় সুলভ ভঙ্গিতে বলল–ওহ্ হো, সেই কুতুবের সংগঠন····।

আমি বললাম–

ঃ আমি আগেই বলেছি যে, মোহাম্মদ কুতুব কোন সংগঠনের বুনিয়াদ স্থাপন করেননি। তিনি একজন সাহিত্যিক-চিন্তাবিদ। মানুষকে সত্য সরল সহজ পথের দিক-নির্দেশ দেয়াই তাঁর কাজ। মুসলমানদের সমস্যাবলী ও তার সমাধান এবং তারা কোন পর্যায় অতিক্রম করছে ইত্যাদি বিষয়ে জাতিকে সজাগ ও সচেতন করার জন্যেই তিনি তাঁর সাহিত্য প্রতিভাকে নিয়োজিত রেখেছেন। ···· তা যে কোন ব্যক্তির চিন্তা-ধারা এবং মতামত প্রকাশ করার মৌলিক অধিকার রয়েছে।

শামস্ বাদরান অস্থিরতা প্রকাশ করে বলল–

হামজা, একে নিয়ে যাও। আমার মনে হচ্ছে আবার ঐ পানি, আগুন, কুকুর এবং চাবুকের দিকে ফিরে যেতে চাচ্ছে।

হামজা আমাকে শামস্ -এর অফিস থেকে কিছু দূরে নিয়ে একটি কক্ষে আটক রেখে চলে যায়।

আধঘন্টা পরে হাসান খলীল এসে বলল–

ঃ শোন জয়নব! আমি তোমাকে সুপরামর্শ দিতে এসেছি। তুমি যেভাবে নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছ, তাতে আমি উদ্বিগ্ন। ····সব ইখওয়ানরাই বাঁচার পথ খুঁজে নিয়েছে। ····আমরা এক লাখ লোককে গ্রেফতার করেছিলাম। কিন্তু এখন আমাদের কাছে মাত্র বিশ হাজার লোক রয়ে গেছে। আর এর মধ্যেই সবাই তাদের নিজ নিজ অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। যারা যারা ক্ষমা চাচ্ছে, তাদের মুক্তি দেয়া হচ্ছে। এমনকি মুর্শিদে আ'ম হাসান হুজায়বী, আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইল আর সাইয়েদ কুতুবের মতো লোকেরাও দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আর তুমি কিনা মুর্শিদে আম'কে বাঁচানোর চেষ্টায় আছ; অথচ তিনি তোমার ব্যাপারে অনেক অভিযোগ তুলেছেন। তুমি এমন লোকদের জন্যে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছ, যারা তোমার বিরোধিতা করছে। তোমার অভিমত পরিবর্তন করা উচিৎ। কারণ, ওরা সব ঘটনার জন্যে তোমাকেই দোষী সাব্যস্ত করেছে। হুজায়বী, সাইয়েদ কুতুব, আব্দুল ফাত্তাহ, মোহাম্মদ কুতুব এবং অন্যান্য সব ইখওয়ানরাই তোমার নিন্দা করছে। ····পাশা, হামজা, সাফওয়াত ইত্যাদির গালিগালাজ এবং দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও

তোমার অভিমত আমাদের কাছে প্রশংসনীয় মনে হয়েছে। ইখওয়ানরা যখন তোমাকে গালি দিয়েছে তখন তাদেরকে আমরা হীন মনে করেছি এবং তোমার প্রতি আমাদের মর্যাদার ভাব আরো আরো বৃদ্ধি পেয়েছে····। দেখ, পাশা তোমাকে নতুন করে কঠোর শাস্তি দেয়ার কথা ভাবছে। কিন্তু আমি তোমার সাথে সমঝোতা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি····। সুতরাং আমি পাশার কাছে তোমার এমন মতামত নিয়ে যেতে চাই যাতে তুমি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পার।

সে এবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বলল–

ঃ তুমি সপ্তাহে দু'বার বা কমপক্ষে একবার দুপুরের খাবার কি হুজায়বীর সাথে খেতে? এটা হুজায়বীও স্বীকার করেছেন; এবং তুমি তার নির্দেশ ও পরামর্শ আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইলের কাছে পৌঁছাতে। আমি আশা করি তুমি সেসব পরামর্শের নমুনা আমাদেরকে সরবরাহ করবে। আবদুল ফাত্তাহ এবং হুজায়বী উভয়েই একথা স্বীকার করেছেন, সাইয়েদ কুতুব যখন জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন তখন থেকে তুমি তাঁর ও হুজায়বীর মধ্যেকার যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছিলে। দেখ জয়নব, আমরা ভিত্তিহীন কথা বলছি না।

ওর হাতে একখানা লিখিত কাগজ ছিল। তা দেখে দেখে সে কথা বলছিল। এরপর সে আরো বলল–

ঃ যেমন, সংগঠনের টাকা তোমার কাছেই গচ্ছিত ছিল এবং এ টাকা তুমি হুজায়বীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছ। ওসব টাকা আবার তোমার কাছে আসে; কিন্তু তুমি আবার ওসব টাকা হুজায়বীর বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দাও। পরে সে টাকা আবার তোমার কাছে আসে, হুজায়বীও এ কথার উল্লেখ করেছেন। এসব কথা অস্বীকার করার কোন উপায় আছে কি? সব গোপন কথা ফাঁস হয়ে গেছে জয়নব! ব্যাস, এখন শুধু তোমার লিখিত স্বীকৃতির প্রয়োজন রয়ে গেছে। নিশ্চয়ই তুমি এ সব কথা এবং অন্যান্য বিষয় লিখে দেবে। এরপর আমরা তোমাকে আদালতে নিয়ে যাবো। ওখানে এসবের তদন্ত হবে। এর দু'দিন পরেই তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তোমাকে সমাজ কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রীপদে বরণ করা হবে। ····হেকমত আবুজায়েদকে এখন আর পছন্দ করা হচ্ছে না····তোমার কি মত? এসব বলে সে ঘন্টা বাজাতেই একজন সিপাহী এসে উপস্থিত হলো। সে তাকে লেবুর রস আনতে বলে আমার সাথে অন্যান্য প্রসঙ্গের আলোচনা জুড়ে দিল। ····সিপাহীটি দু'পেয়ালা লেবুর রস এনে উপস্থিত করলে সে আমাকে তা পান করার অনুরোধ করলো। এরপর সে সিপাহীকে দু'পেয়ালা কফি আনতে হুকুম দিয়ে তার কথা

অব্যাহত রাখলো। আমি আগাগোড়া চুপ থেকে তার কথা শুনে গেলাম। বুঝলাম, সে বেশ আশ্বস্ত হয়েছে। যাবার সময় সে সিপাহীকে বলে গেল, তুমি জয়নবের অধীনে থাকবে।

আমার দিকে চেয়ে বলল–

এক ঘন্টা পরে তোমাকে পাশার অফিসে ডাকা হবে। ততক্ষণে·তুমি তোমার ভাল-মন্দ সম্পর্কে খুব ভাল করে ভেবে নাও।

আমি লিখতে বসলাম এবং আমার কলম ছুটে চললো।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

মহান আল্লাহ্‌র যথার্থ প্রশংসা এবং তাঁর অশেষ মেহেরবানীর শোকর আদায় করতে আমার ভাষা সত্যিই অক্ষম। আমার শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে তাঁর দ্বীনের খেদমতের জন্যে মনোনীত করেছেন; যেপথ তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্যে নির্বাচিত করেছেন, আমাকেও সেই পথে চলার শক্তি ও সুযোগ দান করেছেন।

বস্তুতঃ কুরআন এবং সুন্নাহর পথ এবং আদর্শই হচ্ছে প্রকৃত সত্য, শান্তি ও সুন্দরের পথ। আল্লাহ্ বিশ্বমানবতাকে এই পথেই আহ্বান জানিয়ে বলেছেন "হে মানব জাতি, তোমাদের কাছে তোমাদের পালন-কর্তার পক্ষ থেকে সেই বস্তু এসেছে, যা তোমাদের জন্যে সর্বোত্তম পথ এবং শ্রেষ্ঠ উপদেশ।" আল্লাহ্ আরো বলেছেন, "হে মানবজাতি, আপন প্রতিপালকের উপাসনা কর, তিনিই তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বসূরী মানুষদের সৃষ্টি করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাই সেই মহান আল্লাহ্‌কে, যিনি আমাকে তাঁর সেই ফরমান মোতাবেক গড়ে ওঠার সৌভাগ্য দিয়েছেন যে, "হে আমাদের প্রভু আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের পথে ডাকতে শুনেছি। তিনি বলেছেন "হে দুনিয়ার মানুষ। তোমাদের পালনকর্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি।" সেই পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করছি, যার কালামের ছায়া-তলে আমি আশ্রয় পেয়েছি "নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন।" সেই আল্লাহ্‌র প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি, যিনি আমাকে মু'মিন পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে শামিল করেছেন এবং আমাকে তাঁদের সাথে নির্বাচিত করেছেন।

"শোকর সেই দয়াময় আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে তাঁর দ্বীন ও আদর্শের প্রচার, দ্বীনের পথে মানুষকে ডাকার ও দ্বীনের পথে জিহাদ করতে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করার

অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র কালামের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়ার যোগ্যতা দিয়েছেন।" আল্লাহ্ বলেছেন, 'মুমিনরা' তাদের জান-মালের বিনিময়ে জান্নাত ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে, মারে এবং শাহাদাত বরণ করে।" আল্লাহ আরো বলেছেন, "দুনিয়াতে তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদেরকে এই জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তোমরা সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবে এবং মিথ্যে ও বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।"

"আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল।" আমরা কালেমায়ে শাহাদাতের এই ঘোষণার উভয়দিক ও তাৎপর্যের ধারক ও বাহক। আমরা আল্লাহ্‌র কুরআন, তাঁর নির্দেশাবলী ও বিধি-বিধানের সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত।" যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, "আমরা তোমার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে করে মানুষের সমাজে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।" প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর উম্মতের প্রতি যে পথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমরা তার অনুসারী। প্রিয় নবী বলেছেন, "আল্লাহ্ যা তোমাদের দান করেছেন তার আলোকে মানব সমাজে সত্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর।" আমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আদেশ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে দৃঢ় সংকল্প।

হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষি থাক যে, আমরা তোমার পথে অটল-অবিচল রয়েছি। আমাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। অতএব হে খোদা, যারা শেরেক করে, যারা তোমার কুরআনকে দুরে সরিয়ে দেয়, যারা তোমার দ্বীনের সাথে শত্রুতা করে, যারা তোমার দ্বীনের পথের যাত্রী, তোমার কুরআনের পতাকাবাহী এবং তোমার রাসূলের নীতির অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, সে সব জালিম-অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদে আমাদের সাহায্য কর।

হে রাসূল আল-আমীন! আমি এভাবেই জীবন যাপন করবো এবং এভাবে তোমার দরবারে উপস্থিত হবো। হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে তাওহীদবাদীদের মধ্যে সত্যিকারের মুসলমান এবং তোমাব ভয়ে ভীত ও তোমার কাছে লজ্জিত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল কর।

হে খোদা, তুমি আমাকে শক্তি দাও। আমি যেন কেবল তোমার জন্যেই ভালবাসি, তোমারই কারণে ঘৃণা করি এবং তোমারই সন্তুষ্টির পথে জিহাদ করি। হে

মানুষ! এ-ই হল আমাদের জীবন-চলার পথ। এরপর তোমরা যা চাও কর। ····কথা ভাবছে। কিন্তু আমি তোমার সাথে সমঝোতা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি····। সুতরাং আমি পাশার কাছে তোমার এমন মতামত নিয়ে যেতে চাই যাতে তুমি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পার কথা ভাবছে। কিন্তু আমি তোমার সাথে সমঝোতা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি···· সুতরাং আমি পাশার কাছে তোমার এমন মতামত নিয়ে যেতে চাই যাতে তুমি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পার। আমি পুরো আত্মদৃষ্টি এবং সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তোমাদের আল্লাহ্‌র পথে ডাকছি। অতএব তোমরা আমাকে তোমাদের দুর্বলতার অংশীদার করতে কুফুর ও বিভ্রান্তির অন্ধকারে হোঁচট খেতে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করানোর ব্যর্থ চেষ্টা করো না। আমি তোমাদের সব অপকর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রয়েছি এবং তোমাদের মিথ্যে আর বাতিলের মোকাবেলার জন্যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রস্তুত থাকবো।

স্বাক্ষর–
জয়নব আল-গাজালী

হামজা কক্ষে প্রবেশ করেই বললো–

ঃ বাহ্ জয়নব! আল্লাহ্ চাহেতো আমাদের মনিব তোমার সহযোগিতা করবেন। একমাত্র শর্ত হলো তুমি নিজ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। ·····তোমার স্বামী সালেম অত্যন্ত ভালো লোক। ·····তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধ। ·····কি জানি, তুমি কিভাবে ইখওয়ানদের শিকারে পরিণত হলে! ....আচ্ছা হ্যাঁ, তোমার লেখা শেষ হয়েছে কি?

সে কাগজগুলো হাতে নিয়ে বলল, এস, আমার সাথে পাশার অফিসে চল। আমরা শামস্ এর অফিসের দিকে চললাম। শামস্ বাদরান আমাকে দেখে কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করে বলল– এস জয়নব, বস।

সে আমার জন্যে শরবত এবং কফি আনার আদেশ দিয়ে আমার লিখিত কাগজ পাঠে মন দিল। তার চেহারার উত্থান-পতন তার ভাব ও অনুভূতির আবাস দিচ্ছিল। অবস্থা দেখে আমার বুঝতে বাকী রলো না যে, এক্ষুণ ফেটে পড়বে। সত্যি সত্যিই তার দু'চোখ আগুনের ভাটার রঙ ধারণ করল এবং দাঁতে দাঁত পিষে বিশ্রী চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো–

এ-স-ব-কী·····? ·····সাফওয়াত, এক হাজার চাবুক। এই মেয়ে আমাদের প্রত্যেককে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছে। তোমরা সবাই কোথায় ছিলে?

ততক্ষণে হান্টারের বিষবর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। শামস্ কাগজগুলোকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল–

ঃ এই মেয়ে আমাদের প্রত্যেকের জ্ঞান-বুদ্ধির সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ দেখছি অতিমাত্রায় লেখিকা এবং বাগ্মী। আমার উভয় আহত পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল, আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ সহ্যসীমার অতিরিক্ত চাবুক আর হান্টারের আঘাত বরদাস্ত করেছে কিন্তু এরপরও তারা আমাকে জবাইকৃত পশুর মতো আবার উল্টো লটকিয়ে দেয়। রাগে উন্মত্ত শামস্ পাশার আদেশে আমার দূর্বল ক্ষত-বিক্ষত শরীরের উপর চালাল অসহ্য চাবুকের অজস্র আঘাত।

সারা শরীর, এমনকি ব্যান্ডেজ কেটেও ঝরঝর করে রক্ত বেরুতে দেখে ডাক্তার আমাকে তক্ষুণি নামিয়ে দেয়ার হুকুম দেন। আমাকে শামস্ এর অফিসের বাইরে এক ঘন্টা পর্যন্ত ফেলে রাখা হয়। এরপর ষ্টেচারে করে হাসপাতালে পৌঁছানো হয়।

মুরাদ এবং হামজা বলল–

ঃ ডাক্তারদের মতে তুমি মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছ। কিন্তু আমাদের মতে তোমাকে আদালতে পেশ করা দরকার। কারণ এতে করে তুমি নিজেই ফাঁসীর হুকুম শুনে মরতে পারবে। আমরা আগামীকাল সকালে তোমাকে আইন বিচার বিভাগীয় মন্ত্রণালয়ে সোপর্দ করবো। খুব মনে রেখো, তুমি যদি আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত আদেশ মোতাবেক জবাব না দাও তাহলে তোমাকে আবার এখানে আসতে হবে।

এরপর হামজা সাফওয়াতকে ডেকে বলল–

ঃ একে সকাল ন'টায় আদালত ভবনে নিয়ে যাবে।

এই বলে ওরা সবাই চলে যায়।

তদন্ত

আমি অত্যাচারের প্রতিটি পর্যায় অতিক্রম করেছি। অনলবর্ষী হান্টার দিয়ে আমাকে পিটানো হয়েছে, কুকুর লেলিয়ে দিয়ে কামড়ানো হয়েছে, পানির সে'লে ডুবানো হয়েছে, আগুনের সে'লে জ্বালানো-পোড়ানো হয়েছে, জবাইকৃত পশুর মতো উল্টিয়ে লটকানো হয়েছে । এ ধরনের লাগাতর জুলুম নির্যাতনে আমার দেহ-মন উভয়কেই জর্জরিত করা হয়েছে। এতসব জোর-জুলুমের পর এখন সরকারের আইন দপ্তর বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে আমার মতো অসহায়া নিরীহ মজলুমদের উপর আরো অন্যায় শাস্তি চাপানোর পাঁয়তারা করছে।

আমাকে আদালতের তদন্ত বিভাগের শিবিরে পাঠানো হয়। এরাও ওদের মতো সেই একই পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করছে। তদন্ত শিবিরে তথ্য সংগ্রাহকরা ধমক এবং ভয় দেখিয়ে অভিযুক্তদের মধ্যে ভিত্তিহীন দোষ-স্বীকার সম্বলিত কাগজ-পত্রে স্বাক্ষর করার জন্যে বাধ্য করছিল।

আর এসব মিথ্যে অভিযোগ সম্বলিত দলিল-দস্তাবেজ তৈরী করা হয়েছে, তথাকথিত আইন-উপদেষ্টা এবং বিচারপতিদের নাকের ডগায় বসে।

সত্য ও সুবিচারের ক্ষেত্রে মুসলিম বিচারপতিদের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ রায়ের যে ঐতিহ্য ও সুনাম ইতিহাসের পাতাকে উজ্জ্বল করে রেখেছে, আজ তাদেরই উত্তরসূরীরা মিথ্যে শক্তির সামনে মাথা নত করে আদালত ও বিচার ব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করছে। জাতির জন্যে এটা চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। এভাবে চলতে থাকলে মুসলিম জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। অথচ মুসলমান কাজী ও বিচারপতিদের সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়-প্রীতি সর্বকালে সর্বমানবতার অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে আসছে।

আইন বিভাগের এসব লোকদের কয়েক জনকে আমি সামরিক কারাগারে প্রকাশ্য মিথ্যে বলতে শুনেছি। এরা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ভাবে মনগড়া কথা লিখে তার উপর স্বাক্ষর করার জন্যে নির্দোষ লোকদের বাধ্য করে। এরা কিভাবে যে ভয়-ভীতি দেখিয়ে কয়েদীদের সন্ত্রস্ত করে স্বাক্ষর আদায় করছিল, তা আমি নিজের চোখে দেখেছি।

আমি যখন দ্বিতীয় বারের মতো জেলের তদন্ত দপ্তরে উপস্থিত হই, এটর্নি আমাকে নীরব দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন। আমার সারা শরীর ব্যান্ডেজ বাঁধা; আমি এতো দুর্বল ছিলাম যে, বার বার অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলাম, আমার কথার শব্দ যথার্থভাবে উচ্চারণের ক্ষমতাও ছিল না।

একগাদা ফাইলের স্তুপের পিছনে এটর্নি সাহেব বসেছিলেন। তার সামনে ছিল একখানা লিখিত কাগজ। তার পাশে একটি ছোট টেবিলের সামনে বসেছিল এটর্নির সেক্রেটারী। তার সামনে এক গাদা সাদা কাগজ। তিনি কলম হাতে নিয়ে এটর্নির নির্দেশ পালনে তৈরী ছিলেন। এটর্নি সাহেব প্রথমে আমার নাম, বয়স, জাতীয়তা এবং বাড়ীর ঠিকানা লিখলেন।

এরপর এটর্নি নির্বিকার-নিস্প্রভ দৃষ্টি মেলে আমাকে বললেন–

ঃ জয়নব, এসব ফাইলে সব ইখওয়ানদের বিবৃতি রয়েছে। এর মধ্যে তোমার বিবৃতিই সবচেয়ে স্পষ্ট। আমি তোমার বিবৃতি ফাইলেই রেখে দেবো। .....আমি

তোমার মুখে আসল ব্যাপার শুনতে চাই। ····ফাইলের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন–

ঃ এসব হুজায়বী, সাইয়েদ কুতুব এবং আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইলের বিবৃতিতে পূর্ণ। ·····জয়নব, আমি চাই তুমি তোমার জিদ ছেড়ে দিয়ে সঠিক পথে এস। অনর্থক ফালতু কাজে আমাদের সময় নষ্ট করো না। নয়তো তোমাকে আবার সামরিক কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

এরপর তিনি আমাকে প্রশ্ন করতে থাকেন এবং আমি জবাব দিতে থাকি। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে আমি স্তম্ভিত হলাম যে, আমি যেখানে মাত্র কয়েকটি বাক্যে জবাব শেষ করি, সেখানে তা লিখার জন্যে পুরো এক পৃষ্ঠার দরকার পড়ছিল তাদের। এটা দেখে অত্যন্ত রাগ হলো আমার। আমি এটর্নির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম–

ঃ জনাব কোনাবী! আমিতো কেবল কয়েক বাক্যে জবাব দিয়েছিলাম ····! কিন্তু·····

এটর্নি বললেন– আমি তোমাকে সাহায্য করবো। কারণ তোমার এসব কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করা হবে। তিনি দৈনিক তোমার বক্তব্য জানতে চান।

আমি বললাম–

ঃ আমি আমার বক্তব্যের কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন বা কমবেশী করার অধিকার দিচ্ছেনে, অর্থাৎ আমার কথা হলো আমার নামে কেবল আমি যা বলেছি তাই লেখা হবে।

এটর্নি বললেন– পরে তোমাকে সব পড়ে শোনানো হবে।

আমি শান্তভাবে বললাম–

ঃ আপনারা যদি আপানাদের পক্ষ থেকেই আমার কথা লিখতে থাকেন, তাহলে আমার পক্ষে কথা বলা অনাবশ্যক। আপনার কেরানীকে দিয়ে আপনার ইচ্ছেমত সব কিছু লেখাতে পারেন। যদি এসবের উপর ভিত্তি করে মামলা চালানো হয় তাহলে আমি শুধু আমার কথাই স্বীকার করবো।

এটর্নি আবার জিজ্ঞেস করলেন–

ঃ তুমি কি প্রেসিডেন্ট নাসের, তাঁর সরকার এবং বর্তমান সমাজকে কাফের বলতে চাও?

আমি বললাম-

ঃ আমি কেবলা কাবার অনুসারীদের কাফের মনে করিনা।

এটর্নি জানতে চাইলো, কেবলা-কাবার অনুসারী কারা?

আমি বললাম-

ঃ যারা কালেমা তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লায় বিশ্বাস করে এবং যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূলের মাধ্যমে পাঠানো আল্লাহর বিধান মেনে চলে। এটর্নি পরীক্ষার মতো প্রশ্ন করলেন-

কেবলা-কাবা অনুসারীদের গুণাবলী বিশ্লেষণ কর।

আমি বিশ্লেষণ করে বললাম-

ঃ যারা নামাজ আদায় করেন, জাকাত আদায় করেন, রমজানের রোজা রাখেন, সক্ষম হলে হজ্জব্রত পালন করেন, কুরআন ও সুন্নাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন এবং নিজের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন করেন না আর আল্লাহর নির্দেশিত আইন ছাড়া অন্য কোন আইন মোতাবেক সরকার পরিচালনা করেন না।

এটর্নি জিজ্ঞেস করলেন-

তুমি কি নাসেরকে, তার সরকারকে এবং বর্তমান সমাজকে কেবলা-কাবার অনুসারী মনে কর?

আমি পরিষ্কার করে বললাম-

ঃ নাসেরের ব্যাপারে আমি তা মনে করিনা। কারণ সে চাইলে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক শাসন পরিচালনা করতে পারে কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কুরআন সুন্নাহর আইনকে স্থগিত করে রেখেছে। সে নিজের পক্ষ থেকে জনগণের উপর আইন চাপিয়ে দেয়·····নাসের এটা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছে যে, সে কোন ইসলামী শাসন কায়েম করবে না।

ঃ এটর্নি জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমাকে স্পষ্ট করে বলে দাও যে, আবদুন নাসের এবং তার সরকার উভয়ই কাফের।

আমি বললাম-

ঃ আমার জবাব দেয়া হয়েছে। যারা নিজেদের বাস্তবতা যাচাই করতে চায়, আল্লাহর কুরআনের কষ্টি পাথরে নিজেদের পরখ করে দেখা তাদের কর্তব্য।

ব্যাস, এই কথাটাই লেখার জন্যে এটর্নি সাহেব ফুলস্কেপ কাগজের পাঁচটি পৃষ্ঠা কালা করলেন।

লেখা শেষ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন– তোমরা উম্মে কুলসুম এবং আবদুল হালীম হাফেজকে খুন করতে চেয়েছিলে?

আমি বললাম–

ঃ মুসলিম জাতির কর্ণধার এবং ইসলামী আন্দোলনের ব্যক্তির কাছে এসব তুচ্ছ কথা ভাবার অবকাশ নেই। যেদিন মুসলমানরা আবার জেগে উঠবে সেদিন এমনিতেই সব অনাচারের বিলুপ্তি ঘটবে এবং জাতি সত্যিকারের মর্যাদা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে। আজ বিভিন্নভাবে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে শয়তানী কর্মে তৎপর রাখা হয়েছে, তা একদিন বুদবুদের মতোই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এটর্নি মোহাম্মদ আল কোনাবী আমার কাছ থেকে শুনতেন এক রকম এবং লিখতেন অন্য রকম। তিনি আমার সামনে বসেই আমার কথাকে বিকৃত করছিলেন, পরিবর্তন-পরিবর্ধন করছিলেন। কোন কোন কথা আবার অন্য ফাইল থেকে নকল করছিলেন!

এভাবে দশদিন পর্যন্ত আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের এই আজব তদন্ত নাটক চলতে থাকে। উপদেষ্টা আবদুল সালাম দৈনিক এসে জনাব কোনাবীর কাছে অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন এবং চেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য আদেশ দিয়ে ফিরে যেতেন।

শিবিরের তাবুতে একদিন আমি এটর্নি জনাব কোনাবীকে বললাম–

ঃ আমি এক আজব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করছি। .....আমি দেখতে পাচ্ছি আইন বিভাগ ও আদালতের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ বন্যজন্তুর রূপ ধারণ করেছেন, তারা দেহ থেকে বিচারকের পোষাক এবং মাথা থেকে আইনের তাজ ফেলে দিচ্ছেন।

এটর্নি বললেন–

ঃ আমরা তোমাকে ইখওয়ানের কবল থেকে বাঁচাতে চাচ্ছি। হুজায়বী, সাইয়েদ কুতুব ও আবদুল ফাত্তাহর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তোমার জন্যে ফাঁসীর দণ্ড অনিবার্য হয়ে পড়েছে। হুজায়বী, সাইয়েদ কুতুব এবং আবদুল ফাত্তাহর বক্তব্য সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?

আমি তার চোখে চোখ রেখে বললাম–

ঃ আপনি ওদের নামে মিথ্যে কথা বলছেন। তাঁরা সব ইসলামী আন্দোলনের নেতা। তাঁরা কোন সময় কারো বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা বলবেন না।

এটর্নি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বললেন– তুমিই মিথ্যে বলছ।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম–

ঃ আমি কার বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা বলছি?

এটর্নি জবাব দিলেন-

ঃ সরকার এবং আমাদের বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে।

আমি তখন এটর্নিকে চ্যালেঞ্জ্য করে জিজ্ঞেস করলাম-

ঃ আপনি যে আদালতের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, তার প্রমাণ পেশ করতে পারেন কি? এটুর্নি এবার বললেন-

ঃ আমি তদন্তের কাজ বন্ধ করছি এবং তোমাকে আবার শাস্তির জন্যে সামরিক কারাগারে পাঠাচ্ছি। পরে তোমাকে আবার এখানে আসতে হবে।

এরপর তিনি কফি পান করতে লাগলেন। কফি পান শেষ করে তিনি বললেন-

ঃ জয়নব, তুমি কি আবার সেই শাস্তির কারাগারে ফিরে যেতে চাও? আবুদন নাসের শিগগীরই তোমার কাগজ-পত্র দেখতে চান।

এরপর এটর্নি যা কিছু লিখেছিলেন, আমাকে তাতে স্বাক্ষর করতে নির্দেশ দিলে আমি তা করতে অস্বীকার করি। .....বল্যবাহুল্য, আমাকে আবার সামরিক কারাগারের অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং সেখানে চাবুক আর হান্টার আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। এভাবে বিচার বিভাগীয় তদন্তের আপাততঃ এখানেই ইতি হয়।

আবার আদালত

দু'দিন পর আবার আমাকে আদালত ভবনে তলব করা হয়। এবার এখানে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় অনেক আহত যুককদের দেখতে পেলাম। এটর্নি কোনাবী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন-

ঃ তুমি কখনো এদের সাথে দেখা করেছ? কখন এদের সাথে পরিচিত হয়েছ এবং এদের নাম কি?

আমি যুবকদের দিকে দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞেস করলাম-

ঃ আমি তোমাদের কবে দেখেছি? আসলে তোমরা আমার সাথে কখনো দেখা করেছ? এর আগে কি তোমরা কখনো আমাকে দেখেছিলে। তোমাদের নাম কী?

এটর্নি চেঁচিয়ে আপত্তি তুলে বললেন-

ঃ আমিই তাদের কাছে প্রশ্ন করবো।

আমি জবাবে বললাম-

ঃ তাহলে আপনি তাদের জিজ্ঞেসা করুন, তারা কবে আমার সাথে দেখা করেছে?

আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না যে, আমি কবে তাদের সাথে দেখা করেছি?

এরপর এটর্নি একের পর এক ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ওরা প্রত্যেকেই যখন বললো যে, তারা আমার সাথে দেখা করেনি, তখন এটর্নি তাদের প্রশ্ন করলেন-

ঃ কিন্তু তদন্তের সময় তোমরা প্রত্যেকেই জয়নবের সাথে দেখা করার কথা বলেছিলে কেন?

ওরা জবাবে বলল-

ঃ হান্টারের মারই আমাদেরকে মিথ্যে বলতে বাধ্য করেছিল।

এরপর আমাদের সবাইকে সামরিক কারাগারে পাঠানো হয়। এসব বীর যুবকরা অসংখ্যবার আমার সামনে দিয়ে আদালত ভবন এবং সামরিক কারাগারের মধ্যে যাতায়াত করতে বাধ্য হয়।

আবার সেই অত্যাচার

শামস্ বাদরানের সাথে তার কারাগারের অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ এবং আমার উপর জোর-জুলুম চলতে থাকে। আমাকে প্রায় প্রতি রাতেই শামস্ অথবা তার কোন সাথীর অফিসে নিয়ে গিয়ে প্রথমে ভীষণ শাস্তির ভয় দেখানো হতো, তারপর অপরিচিত কিশোর-যুবক-মহিলা-পুরুষ বন্দীদের সামনে এনে জিজ্ঞেস করতো-

ঃ তুমি এদের সাথে কবে দেখা করেছিলে?

আমি জবাবে বললাম-

ঃ তাদেরকেই জিজ্ঞেস করে দেখ যে, ওরা কবে আমার সাথে দেখা করেছে এবং তারা আদৌ আমাকে চেনে কিনা?

এর উত্তরে দেয়া হতো নিত্য নতুন শাস্তি। যেমন, কোন অন্ধকার স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখা, অথবা আমাকে দৌড়াতে বাধ্য করে পিছন থেকে হান্টারের আঘাত করা ইত্যাদি। আহত এবং দুর্বলতার কারণে দৌড়াতে দৌড়াতে আমি যখন হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে যেতাম তখন কষে কষে পনের বিশ ঘা লাগিয়ে আবার দৌড়াতে আদেশ দিত। অবশেষে বেহুঁশ হয়ে পড়লে হাসপাতালের কক্ষে রেখে আসতো। আইন ও বিচার বিভাগীয় তদন্তের পর আমাকে যেসব নির্যাতনমূলক শাস্তি দেয়া হয়-তা আগেকার শাস্তির চেয়েও ভয়ানক এবং মর্মান্তিক। এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করবো। এতে করেই আপনারা অনুমান করতে পারবেন যে, নাসের এবং তার পোষা চাটুকাররা কতো নিষ্ঠুরভাবে অমানবিক নির্যাতন চালাতে পারে।

শাস্তি

মধ্যরাতের অন্ধকারে আমাকে শামস্ বাদরানের অফিসের কাছে অন্য একটি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে জালালুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি বসেছিল। সে আমাকে দেখা মাত্রই প্রশ্ন করলো–

ঃ জয়নব, খালেদা হুজায়বী এবং তাঁর স্বামী আহমদ সাবেতের সাথে তোমার সম্পর্ক এবং সংগঠনে ওদের উভয়ের কি ভূমিকা ছিল? বল।

আমি বললাম– আমার সাথে খালেদা হুজায়বীর কাজ, আটক ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের সাহায্য পর্যন্ত সীমিত ছিল।

জালাল জিজ্ঞেস করলো কি ধরনের সাহায্য?

আমি বললাম– আর্থিক এবং বস্তুগত সাহায্য। যেমন-খাদ্যদ্রব্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

এরপর সে আমাকে খালেদা হুজায়বীর স্বামী আহমদ সাবেত সম্পর্কে জানতে চাইলে আমি জানালাম যে, তিনি মহিলা সংস্থার দফতর থেকে বিভিন্ন পরিবারের জন্য দেয়া দ্রব্য সামগ্রী খালেদা হুজায়বীর কাছে পৌছাতেন। তিনি এসব দ্রব্যাদি নিতে আসতেন সত্য কিন্তু গাড়ীতেই বসে থাকতেন। অফিসে যেতেন না। এছাড়া তাঁর উপর আর কোন দায়িত্ব ছিল না।

জালাল আমার কথার সত্যতা মানতে অস্বীকার করে এবং আমাকে সাফওয়াতের হাতে সোপর্দ করে। সাফওয়াত আমাকে দেয়ালের দিক মুখ করে দাঁড় করিয়ে সেই সকল প্রশ্ন আবার জিজ্ঞেস করতে লাগলো। আমি আগের জবাবেরই পুনরাবৃত্তি করলাম। এভাবে জিজ্ঞাসা ও জবাবের ধারা এক ঘন্টা পর্যন্ত চলতে থাকে; কিন্তু আমার বর্ণনায় কোন পরিবর্তন না দেখে সে আমাকে হান্টার আর কুকুরের ভয় দেখাতে লাগল। কিন্তু আমি আপন বক্তব্যে অনড়। এর মধ্যে হামজা এবং জালাল এসে উপস্থিত হয়। জালাল আমার উপর কুকুর লেলিয়ে দেয়ার আদেশ করে। এরপর আমাকে দু'ঘন্টা পর্যন্ত একটি কুকুরের সাথে আটক করে রেখে পরে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় রাতও খালেদা হুজায়বী এবং তাঁর স্বামী সম্পর্কে সেই একই প্রশ্ন করা হলো এবং আমিও আমার সাবেক জবাব দিতে থাকি। আমাকে বারবার একই অভিমত প্রকাশ করতে দেখে জালাল সাফওয়াতকে ডাকলো। সাফওয়াত তার সর্বশক্তি দিয়ে আমাকে মারতে শুরু করলো।

আমাকে আবার শামস্ বাদরানের অফিসে তলব করা হয়। শামস্ বাদরান আমাকে বলল–

ঃ আমরা গাজা থেকে জেইনিকে আনিয়েছি। মুর্শিদে আ'ম এবং মামুন হুজায়বী তাকে চেনে। তুমি যদি তাকে চিনতে অস্বীকার কর তাহলে আমরা তোমাকে আবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুনঃতদন্তের জন্যে পাঠিয়ে দেবো। জেইনি? স্বীকারোক্তি·····খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাকে একটি কক্ষে নিয়ে গিয়ে এমন কিম্ভুত কিমাকার ব্যক্তিকে দেখানো হলো, যাকে চেনার বা জানার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং আমাকে আবার শামসের কাছেই ফিরিয়ে আনা হল।

শামস্ জিজ্ঞেস করলো– কে এই ব্যক্তি?

জবাব দিলাম– আমিতো চিনলাম না।

শামস্ বলল–

ঃ এ যে সাদেক জেইনি তাকে প্রত্যেকই জানে। কথার মাঝখানে জালাল শামস্‌কে বাধা দিয়ে টাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে বললো। শামস্ এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম–

যে সব লোকের উপার্জনকারী লোকদের কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে, তাদের পরিবার-পরিজনের খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার খাতে ব্যয়ের জন্যে এসব টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল।

শামস্ উত্তেজিত কণ্ঠে হামজাকে ডেকে বলে–

একে নিয়ে গিয়ে এবার কুকুরের কাছে নয় বরং বিষাক্ত সাপের সে'লে বন্ধ করে দাও।

হামজা ও সাফওয়াত আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। হামজা চেয়ারে বসতে বসতে বললো, তুমি যদি টাকা সংগ্রহের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সত্য কথা বলে দাও, তাহলে আমরা তোমাকে সাপের সে'লে বন্ধ করবো না।

আমি বললাম ঃ তোমরা ইতিমধ্যেই সব ব্যাপার তদন্ত করে দেখেছ। এসময় জালালুদ্দিন সেখানে পৌঁছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো–

ঃ ও কি ঠিক পথে এসেছে?

হামজা বললো– ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। মনে হচ্ছে সে কুকুরের সংস্পর্শই পছন্দ করে।

কুকুর! হ্যাঁ আমার দৃষ্টিতে বুদ্ধি বিবেচনা এবং বিবেকের ক্ষেত্রে কুকুর এদের তুলনায় অনেক উন্নত। যখনই কুকুরের সে'লে বসে আমি এসব লোকদের চরিত্র ও মানসিকতার সম্পর্কে ভেবেছি, তখন আমার কাছে কুকুরের তুলনায় ওদের বেশী ঘৃণ্য জীব মনে হয়েছে। শামস্, হামজা, জালাল, সাফওয়াত ইত্যাদির তুলনায় কুকুরের পরিবেশ অনেক সহনীয় ছিল নিঃসন্দেহে।

একদিন রাতে আমাকে শামস্ এর অফিসে নিয়ে গিয়ে কোন কথা-বার্তা ছাড়াই হঠাৎ এমনভাবে মারতে শুরু করে যে, কয়েক মুহূর্তেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। আমাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তিন দিন পরে আমাকে আবার শামস্ এর অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়।

সে জামাল নাসেরের শপথ করে বলল–

ঃ তুমি যদি আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব না দাও, তাহলে তোমাকে এক নম্বর থেকে চৌত্রিশ নম্বর সে'ল পর্যন্ত আবার নতুন করে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আমি ইতিমধ্যে এসব সে'লের লোমহর্ষক নির্যাতন সয়ে এসেছি।

শামস্ কথা শুরু করতে গিয়ে বলল–

ঃ জয়নব, আমি তোমাকে দু'টি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এর একটিতে মোহাম্মদ কুতুব, জনাব হুজায়বীর স্ত্রী এবং মোহাম্মদ কুতুবের বোনেরা শামিল রয়েছে, আর দ্বিতীয় ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে আলী উসমাবী এবং মামুন হুজায়বী।

আমি যদি বলি যে, এসব কথা হাসান হুজায়বী তাঁর স্ত্রী এবং মোহাম্মদ কুতুব স্বীকার করেছেন তাহলে তুমি বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তাহলে বল যে, আমরা এসব কেমন করে জানতে পারলাম? মানলাম; যে ঘটনার সাথে আলী জড়িত ছিল তাকে তুমি মিথ্যে বলতে পার কিন্তু অন্যটিতে তো আলী নেই।

যেদিন মোহাম্মদ কুতুব হালওয়ান থেকে রাতের বেলা আমার বাড়ীতে যায় এবং আলাপ আলোচনার পর তুমি তাঁকে স্বর্ণালঙ্কারসহ পাঁচশো জিনিহ্ দিয়ে বলেছিলে, পাঁচশো জিনিহ্ মা'কে অর্থাৎ হুজায়বী সাহেবের স্ত্রীকে দেবেন আর এসব স্বর্ণালঙ্কার বন্দী ইখওয়ানদের পরিবার পরিজনের ব্যয় নির্বাহের জন্যে চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করুন এবং যথা সময়ে মা'য়ের কাছে হস্তান্তর করবেন।

আমি বললাম–

ঃ হ্যাঁ, এই ঘটনা ঠিকই। কিন্তু তাতে এমন দুশ্চিন্তার কি থাকতে পারে? আমি আমার অলঙ্কার যাকে মর্জি দিতে পারি। আমি তা এক মানব সেবামূলক কাজে

দান করেছি, তাতো সুখের বিষয়। অবশ্য টাকাগুলো ছিল ইখওয়ানের। এ টাকা দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়া আমার কর্তব্য ছিল।

শামস্ জিজ্ঞেস করলো–

ঃ পাঁচশো জিনিহ্ সংগঠনের জন্যে ছিল, নাকি ওসব পরিবারবর্গের জন্যে।

আমি বললাম– শুধু পরিবারবর্গের ব্যয়ের জন্যে।

শামস্ বলল–

ঃ আলী উসমাবীর কথা মতো ওসব টাকা সংগঠনের জন্যে ছিলো।

আমি বললাম– আলী উসমাবী মিথ্যুক।

শামস্ বলল– মোহাম্মদ কুতুব বলেছেন পাঁচশো জিনিহ্ কি উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছিল তা তিনি জানেন না। অবশ্য তুমি তা অলঙ্কারের সাথে দিয়ে হুজায়বী সাহেবের স্ত্রীকে পৌছাতে বলেছ।

আমি বললাম–

ঃ মোহাম্মদ কুতুবকে আমার সামনে আন। .....আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, পাঁচশো জিনিহ্ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে দেয়া হয়েছে।

শামস্ বলল–

ঃ আচ্ছা ঠিক আছে? কিন্তু তা কোত্থেকে এসেছে?

আমি বললাম–

ঃ আলী উসমাবী একদিন আমার কাছে এক সউদী-ভাইয়ের জন্য মুর্শেদ অথবা মামুনের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সুপারিশপত্র নিতে আসে। আমি তাকে বললাম যে, ভাই মামুনের সাথে দেখা করার জন্যে কোন সুপারিশপত্র বা মাধ্যমের দরকার নেই। আর মুর্শেদ আলেকজান্দ্রিয়ায় রয়েছেন। অবশ্য মামুন এখানেই আছেন এবং তার সাথে দেখা করা যেতে পারে। পরে আলী উসমাবী আমাকে জানায় যে, সউদী ভাই মামুনের সাথে সাক্ষাৎ করে চাঁদা হিসাবে কিছু টাকা দেন। মামুন তাঁকে চাঁদার সেই টাকা জয়নব আল-গাজালীকে দেয়ার অনুরোধ করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সউদী ভাই আলী উসমাবীর কথা মোতাবেক আমার কাছে সেই চাঁদার টাকা পৌছানোর জন্যে তাকে দায়িত্ব দেন। তিনি এটাও বলে দেন যে, এ টাকা বন্দী ইখওয়ানদের পরিবারবর্গের সাহায্য বাবদ ব্যয় করা হবে।

শামস্ বলল–

ঃ মোহাম্মদ কুতুবের কথা মোতাবেক সে টাকা পরিবারবর্গের জন্য ছিলনা।

অধ্যাপক মোহাম্মদ কুতুবকে আমার সামনে হাজির করা হলে তখন আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম–

ঃ মায়ের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে আপনার কাছে অলঙ্কার ও টাকা হস্তান্তর করার সময় আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, এ টাকা পরিবারবর্গের জন্যে আমার কাছে গচ্ছিত ছিল……। সম্ভবত আপনি সেকথা ভুলে গেছেন।

আমার কথার পর জনাব মোহাম্মদ কুতুব বললেন–

ঃ জয়নব, আমাকে সেকথা বলেছেন বলে যদি নিশ্চিত থাকেন–

তাহলে জয়নবের কথাই সত্য।

এরপর ওরা আমাকে দেয়ালের দিকে মুখ করে ভোর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করে। এরপর আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

দু'দিন পরে আবার শামস্ এর অফিসে নিয়ে গিয়ে কোন ভূমিকা ছাড়াই বলা হয়–

ঃ জয়নব, মোহাম্মদ কুতুব যে সংগঠন কায়েম করেছেন, সে কথা স্বীকার কর।

আমি বললাম–

ঃ এ ব্যাপারে আগেও প্রশ্ন করা হয়েছে এবং আমি জানিয়েছিলাম যে, মোহাম্মদ কুতুব কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেননি।

একথা শুনে শামস্ আমাকে লটকিয়ে চাবুক মারার জন্যে সাফওয়াতকে আদেশ দেয়। এরপর কাছাকাছি আরেক অফিসে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে এক অপরিচিত ব্যক্তি আমাকে বললো–

ঃ জয়নব, তুমি একটা আস্ত বোকা। তুমি নিজের প্রাণ বাঁচাতে জাননা। ইখওয়ানরা তোমার বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে……। তাহলে তুমি মোহাম্মদ কুতুব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবে না কেন? জান, তোমার একটু সহযোগীতায় সমঝোতার পথ করত সহজ হয়ে যাবে।

আমি বিদ্রুপাত্মক প্রশ্ন করলাম–

ঃ সমঝোতা করবো তোমাদের সাথে? আমিতো তোমাদের চাল-চলন ব্যবহার এবং শঠতাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। তোমরা সবাই শয়তানের সহচর। কিন্তু তোমরা কোন দিন আমাদের চলার পথে টিকতে পারবে না। আমরা আল্লাহ্‌র গোলাম ও মুজাহিদ। তোমরা যতই অপচেষ্টা করো না কেন, আমাদের কোন ভাইকে

বিভ্রান্ত করে অথবা অত্যাচার করে মিথ্যে বলাতে পারবে না। এটা তোমাদের জানা থাকা চাই।

সে কর্কশ কণ্ঠে বললো-

ঃ আমরা আবার তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবো এবং তোমাদের ব্যাপারে আবার বিচার-বিভাগীয় তদন্ত করাবো।

আমি বললাম-

ঃ আইন মন্ত্রনালয় বিচার-বিভাগ এবং তোমরা সবাই একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। তোমরা আল্লাহ্‌র পথ থেকে দুরে সরে গিয়েছ। তোমরা প্রত্যেকেই বিভ্রান্তির আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছ, তোমরা আল্লাহ্‌র গজবের শিকারে পরিণত হবে।

এ সময় হামজা এসে একটি লিখিত কাগজ সামনে রেখে চলে গেল। এবার এ ব্যক্তি আমাকে মোহাম্মদ কুতুব সম্পর্কে বলতে শুরু করলো। একটু পরে সেও কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

এরপর সাফওয়াত এসে আমাকে বেদম প্রহার করে চলে যায়। তারপর আর এক ব্যক্তি এসে আমাকে এক বিশেষ সংগঠন সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের বিনিময়ে অনেক পুরস্কারের লোভ দেখাতে থাকে। কিন্তু কোনক্রমেই যখন আমার মতের রদবদল করা গেল না তখন আমাকে কুকুরের সে'লে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়। এবার কিন্তু কুকুরের সাথে অন্য একটি লোকও ছিল। হামজা সেই লোকটিকে বলে গেল যে, কুকুর যদি তাকে না কামড়ায় তাহলে তুমিই তাকে কামড়াবে। দু'ঘন্টা পর্যন্ত সে'ল বন্ধ করে রাখা হলো। এ সময় আমি শুধু আল্লাহ্‌র স্মরণে ব্যস্ত থাকলাম। দু'ঘন্টা পরে দরজা খোলা পর্যন্ত কুকুর এবং সেই ব্যক্তি শান্ত সুবোধ শিশুর মতো চুপ করে বসে রইল।

এরপর আমাকে হাসপাতালে পৌছিয়ে দেয়া হয়। পরের দিন রিয়াজের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সে আমাকে করওয়াসাহ্‌র কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেছি কিনা জানতে চাইলো। আমি তাকে বললাম-

ঃ করওয়াসাহ্ সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা।

রিয়াজ জিজ্ঞেস করলো-

ঃ তোমার সাথে ওখানকার কোন ব্যক্তি কি কোন সময় দেখা করেনি? জয়নব, তোমার কি স্মরণ নেই যে আবদুল হামীদ করওয়াসাহ্‌রই লোক। এরপর সে এক ধমক দিয়ে বলে গেল-

ঃ তোমাকে শায়েস্তা করার জন্যে আমি পাশার কাছে থেকে লোক পাঠাচ্ছি। এর পরমুহূর্তেই এক সিপাহী এসে আমাকে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে চাবুক লাগাতে লাগলো। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচার চালিয়ে আমাকে আবার হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বিচার-বিভাগীয় তদন্তের পরই এসব অত্যাচার করা হচ্ছে।

কয়েকদিন পরে আমাকে আবার রিয়াজের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এবার সেখানে আরো কয়েকজন মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। এদেরকে আমি আগে কোনদিনই দেখিনি।

আমাকে জিজ্ঞেস করল– এদের মধ্যে সিসীর স্ত্রী কে?

জবাবে বললাম– আমি তো জানি না।

এসময় সিপাহী, একজন তরুণকে নিয়ে উপস্থিত হলো। তরুণ ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করা হল, এদের মধ্যে জয়নব আল-গাজ্জালী কে?

ছেলেটি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে বললো– আমি জানি না।

এরপর তাকে আব্বাস সিসী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে এতেও অজ্ঞতা প্রকাশ করে। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়–

ঃ এখানে উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে তুমি কার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলে? ছেলেটি এবারও নেতিবাচক জবাব দিলে তাকে চাবুক লাগিয়ে বের করে দেয়া হয়।

এসময় হঠাৎ বোন হামীদা কুতুবকে আসতে দেখা গেল। তাঁর পিছনে সাফওয়াত আসছিল। বোন হামীদা কুতুবকে সিসীর স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনিও বলেন, আমি তাঁকে জানিনা।

এরপর বোন হামীদা কুতুবসহ সব মহিলাকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু আমাকে রিয়াজের সামনে বসিয়ে রাখা হয়। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো–

ঃ এক ইখওয়ান নাকি চার বিয়ে করেছে। সে সম্পর্কে তুমি কিছু জানকি?

আমি বললাম– না।

সে গর্জে উঠে বলল–

তাহলে আমি কি মিথ্যে বলছি? সে ব্যক্তি কে, তা যদি তুমি না বল তাহলে পিটানো হবে।

আমি ঘৃণা প্রকাশ করে বললাম– যা মর্জি তাই কর।

সে আমাকে দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে বেশ কয়েক ঘা চাবুক লাগিয়ে চলে গেল। দু'ঘন্টা পরে সে সাফওয়াতের সাথে ফিরে এসে আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

গোশতের কীমার প্যাকেট

আমার দ্রুত অবনতশীল স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করে ডাক্তাররা বলেন যে বাড়ী থেকে আমার জন্যে উত্তম খাবার সরবরাহের অনুমতি না দিলে আমার জীবননাশের আশংকা রয়েছে। সুতরাং ডাক্তারী পরামর্শ মোতাবেক আমার জন্যে বাড়ী থেকে খাবার আনানোর অনুমতি দেয়া হয়। অবশ্য এ অনুমতি দুধ এবং ফল পর্যন্তই সীমিত রাখা হয়। একদিন আমার বোন আমার কাছে গোশত পৌঁছানোর চমৎকার বুদ্ধি করে। সে দুধের খালি প্যাকেটে এমনভাবে গোশতের কীমা ভরে দেয় যে, বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল। একেবারে দুধের প্যাকেটের মতোই তা ছিল মোলায়েম। কেবল আমার কাছেই তা ধরা পড়ে। এর সাথে কিছু মাখন এবং কমলালেবুও পাঠানো হয়। আমি আমার অংশ রেখে অবশিষ্ট সব খাবার আব্দুল মাবুদের মাধ্যমে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্যান্য ইখওয়ান ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেই। আমাদের সাথে তখন স্থানীয় প্রশাসন বিষয়ক সাবেক মন্ত্রী অধ্যাপক আব্দুল আজীজও ছিলেন। আমরা প্রত্যেকে একটি করে কমলালেবু এবং প্রতি দু'জনে মিলে এক প্যাকেট মাখন পরস্পরের মধ্যে বন্টন করে নেই।

খাবার বন্টন শেষ হলে আমি আব্দুল মাবুদকে ডেকে দুধের থলে দিয়ে তা সব ইখওয়ানদের মধ্যে বন্টন করতে বলি। সে বাইরে গিয়ে আবার ফিরে এসে বললো।

ঃ আরে, এতে তো দেখছি গোশতের কীমা রয়েছে। এটা আপনার জন্যে খুবই উপকারী হবে। নিজের কাছে রেখে দিন।

কিন্তু আমি তাকে তা বন্টন করে দিতে বলি। সবাইকে বন্টন করার পরও প্যাকেটে কিছুটা কীমা থেকে যায়। আমি এসব কীমা এবং কিছু মাখন অধ্যাপক আব্দুল আজীজের কাছে পাঠিয়ে দেই।

আব্দুল মাবুদ জিজ্ঞেস করলো– আপনার জন্যে রাখলেন না যে?

আমি বললাম–

ঃ আল্লাহ্‌র অশেষ শোকর। তিনিই তাঁর বান্দাদের রিজিক দান করেন।

সে বললো– সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিজিক দাতা।

ওয়ার্ড এ্যাসিষ্টেন্ট এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো–

ঃ ভেতরে খাবার এলো কেমন করে?

আমি বললাম– ডাক্তারের অনুমতিতে।

ইখওয়ানের ভাইয়েরা অল্প-স্বল্প উত্তম খাদ্যদব্য একত্রিত করে অপেক্ষাকৃত অসুস্থ ভাইদের জন্যে রেখে দিতেন। এই জন্যে জেলের বাইরে থেকে কিছু এলে আমরা খুব আনন্দিত হতাম। তা' সে জিনিষ যতই কম হোক না কেন। জালিম-অত্যাচারীদের অধীনে থেকেও আমরা পরস্পর পরস্পরের কল্যাণের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতাম।

হাসপাতালে অভুক্ত

কারাগারে প্রথম এক বছর আমাকে বাড়ী বা বাইরের খাদ্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। একেবারে শেষ দিকে অনন্যোপায় হয়ে আমাকে বাড়ী থেকে খাবার আনানোর অনুমতি দেয়। তাও এজন্যে যে, তাদের মিথ্যে ভিত্তিহীন অভিযোগের আলোকে আদালত আমাকে যেন সম্ভাব্য ফাঁসির দন্ড দিতে পারে। এ উদ্দেশ্যে অন্তত ফাঁসীর আদেশ পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে বাড়ী থেকে উত্তম খাদ্যদ্রব্য আনিয়ে খাবার অনুমতি দেয়।

আদালতে মামলা শুরু হবার কয়েকদিন আগে আমার মা এবং বোন আমার সাথে কারাগারে দেখা করতে এসে কথা প্রসঙ্গে জানান যে, সাফওয়াত আমার নাম ভাঙ্গিয়ে তাদের কাছ থেকে ঔষুধপত্র, ফলমুল, কাপড় ইত্যাদি কেনার বাহানায় মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এ ছাড়া আরো নানাভাবে আমার পরিবার ও আত্মীয়দের উপর বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করে স্বার্থ পূর্ণ করা হয়।

ওরা কোন কোন কয়েদীকে শুরু থেকেই বাইর থেকে খাবার আনার অনুমতি দিয়ে রাখে কিন্তু ইখওয়ানদের বেলায় এ ধরনের কোন অনুমতি দেয়া হয়নি। বরং কোন না কোনভাবে ইখওয়ানদের কষ্ট দেয়া বা মেরে ফেলাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এজন্যে তারা এমনকি হাসপাতালেও ইখওয়ানদেরকে তাদের ন্যায্য খাবার থেকে বঞ্চিত রাখতো। বস্তুত এ সব কিছুই ছিল তাদের ইসলাম বিদ্বেষী, হীন-মানসিকতারই বাহ্যরূপ।

একদিন এক যুবক ইখওয়ানকে ভীষণভাবে আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। ওর চিকিৎসার জন্যেই সুগারের প্রয়োজন দেখা দেয়। ডাক্তার সুগার বা ঐ জাতীয় কোন দ্রব্য খুঁজে আমার জন্যে লোক পাঠান। কিন্তু কোথাও তা পাওয়া গেল না। আমি ব্যাপারটা জানতে পেরে ওয়ার্ডের দরজায় করাঘাত করি। দরজা খোলা হলে আমার জন্যে বাড়ী থেকে পাঠানো মধুর বোতলটি ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেই। এতে করে শিগগীরই ইখওয়ান ভাইটির চিকিৎসা হয়। হাসপাতালে মোতায়েন সরকারী চররা এসব লক্ষ্য করে। আইন মোতাবেক আমি নাকি নিষিদ্ধ কাজ করেছি।

এর জন্যে কয়েকদিন পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কয়েদীদের জন্যে পানি বন্ধ করে দেয়া হয়। অমানবিক আচরণের এটা একটা ঘৃণ্য উদাহরণ। প্রচন্ড গরমের মৌসুমে প্রত্যেক রাত এক ফোঁটা পানি থেকে আমাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়। সারাদিন কোনভাবে এক পেয়ালা পানি যোগাড় করা ছিল বাঘের দুধ সংগ্রহ করার মতো দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আমি এমনিতেই ভীষণ অসুস্থ ছিলাম। স্বাস্থ্য দিন দিন অবনতির শেষ সীমার দিকে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত শুধু আমার জন্যে পানি বরাদ্দ করা হয়। আমি আমার পানি ভাগ করে পাশের কক্ষের ভাই আব্দুল করীমের কাছে পাঠাতাম। কিন্তু পাশের কক্ষে পানি পৌঁছানো ছিল ভীষণ কষ্টকর। প্রহরীদের ফাঁকি দেওয়ার কোন উপায় ছিল না। অগত্যা দেয়ালের একটি অতি শীর্ণ ছিদ্র পথে আমি এপার থেকে গড়িয়ে দিতাম আর ওপারে দেয়ালের ছিদ্র পথে মুখ লাগিয়ে ভাইটি তাঁর পিপাসা নিবারনের চেষ্টা করতেন। হান্টারের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত শরীর আর মন টিকিয়ে রাখার জন্য সেই কয়েক বিন্দু পানি তাঁর জন্যে নবজীবনের সমতুল্য ছিল। সরকারের পোষা জল্লাদরা এসব নিরপরাধ লোকদের উপর সব রকমের জঘণ্য শাস্তিরই অনুশীলন করতো। মানবতাবোধের মতো কোন অনুভূতির সাথে তারা আদৌ পরিচিত ছিলনা। এমনকি তাদের নিষ্ঠুরতা পশুত্বের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল বললে ভুল হবে না।

অত্যাচারীর অনুতাপ ও সত্য পথে প্রত্যাবর্তন

আমি হাসপাতালে থাকতেই একটি ঘটনা ঘটে। এতে আমার কাছে মানুষের সুপ্ত সৎ গুণাবলী প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আমার এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সত্যিকার অর্থে যদি আন্তরিকতার সাথে কোন ব্যক্তিকে সৎ কথা বোঝানো হয় তাহলে, সে যতই মন্দলোক হোক না কেন-একদিন না একদিন সৎশিক্ষা গ্রহণ করবেই। প্রয়োজন শুধু আন্তরিক প্রচেষ্টার। চেষ্টা করলে জাতি আবার তার আসল মঞ্জিলের পথে পূর্ণ শক্তির সাথে এগিয়ে চলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

আমাদের তত্ত্বাবধানের জন্যে সামরিক হাসপাতালে সালাহ্ নামক এক সামরিক সহকারী ছিল। সে রোগীদের ইঞ্জেকশন দেয়া এবং কায়েদীদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার দায়িত্বও পালন করতো। একদিন আমি স্নানাগারে যাবার পথে দেখলাম সাইয়েদ কুতুবের কক্ষের দরজা হিসাবে ব্যবহৃত পর্দা বেশ উঁচু হয়ে বাতাসে উড়ছে। ঠিক সেই সময়েই আমি ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। ব্যাস, তা দেখে হৈ-চৈ করে এক এলাহী কান্ড জুড়ে দিল। সে বলল-

ঃ জয়নব আল-গাজালী পর্দা হটিয়ে ভিতরে বসা সাইয়েদ কুতুবকে দেখার দুঃসাহস কিভাবে করলো? সালাহ্ অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ শুরু করে দিল। লম্প ঝম্ফ করে সে এক অবস্থা আর কি! ঠিক সেই মুহূর্তে ওখানে সাফওয়াত পৌঁছায় সালাহ্র হাঁকডাক এবং গালাগালী আরও বেড়ে গেল। সে এসব করে তার উপরওয়ালাদের কাছে এটাই প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে, সে কতো যোগ্যতা এবং সতর্কতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সে যে হাসপাতালে আহত-অসুস্থ বন্দীদের নিজের প্রশাসনিক শক্তির গুণে একেবারে কাবু করে রেখেছে, তার প্রামাণ্য তথ্য সে একে একে বলে যেতে লাগলো।

আসলে সালাহ্ ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক, ধর্ম শিক্ষা ইত্যাদি সব সদ্গুণ থেকে বঞ্চিত বন্যজন্তুর মতো পাশবিক স্বভাবের লোক। তার কদর্য্য কথাবার্তা এবং হৈ-চৈ শুনে অধ্যাপক সাইয়েদ কুতুব তাকে কাছে ডেকে খুব স্নেহের সাথে বুঝালেন–

ঃ ভাইটি আমার! পর্দাতো বাতাসেই উড়ছিল। এতে ওর অপরাধ হবে কেন? তারতো কোন দোষ নেই। এভাবে তিনি তাকে আরো অনেক কথা বুঝালেন। আশ্চার্য! এই বন্যপশুর মতো জঘণ্য লোকটি সাইয়েদ কুতুবের কথায় মোহিত হয়ে একেবারে গলে গেল যেন। সে চুপচাপ লজ্জাবনত দৃষ্টিতে মাটির দিকে চেয়ে রলো।

কয়েকদিন পর সে আমার কাছে এসে তার পূর্ব ভুলের জন্যে লজ্জা প্রকাশ করে বললো–

ঃ আমি আবার নতুন করে মুসলমান হতে চাই। আমি ইসলামকে জানতে চাই বলুন, আমি কিভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানে পরিণত হতে পারি।

আমি বিস্মিত হেসে জিজ্ঞেস করলাম–

ঃ ইখওয়ানদের সাথে যে জোর-জুলুম অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছ, তা-কি তুমি সহ্য করতে পারবে?

সে বললো–

ঃ আমিও যদি তাদের মতো যথার্থ মুসলমান হতে পারি তাহলে আল্লাহ্ আমাকেও ধৈর্য ও শক্তি দান করবেন।

আমি আবেগ জড়িত কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম–

ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)।

সে বেশ কয়েকবার অত্যন্ত ধীর অথচ বলিষ্ঠ উচ্চারণে কালেমা তাইয়্যেবা পড়লো।

এরপর আমি বললাম–

ঃ ঠিক আছে, আল্লাহ্ যা করতে হুকুম করেছেন, তা করতে থেকো। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন বাতিল শক্তির সামনে মাথা নত করো না।

সে বললো–

ঃ আমি সেই সত্যিকারের ইসলামী শিক্ষা শিখতে চাই, যা আপনাদের চরিত্রকে এত উন্নত এবং আপনাদের ঈমানকে এত মজবুত করেছে যে, নিষ্ঠুরতম অত্যাচারের সামনেও আপনাদের নীতির এতটুকু পরিবর্তন হয়নি এবং হাসিমুখে সব জুলুম-নির্যাতন সয়ে যাচ্ছেন। সাধারণ কোন মানুষের পক্ষে এ ধরনের অত্যাচারের শতকরা একভাগ সহ্য করাও সম্ভব নয়। বলুন, কিভাবে আমি সত্যিকারের ইসলামী শিক্ষা অর্জন করতে পারি।

আমি তাকে বললাম–

ঃ তুমি যখন ইঞ্জেকশন এবং ঔষধ দেয়ার জন্যে সাইয়েদ কুতুবের কাছে যাও তখন এ প্রশ্ন করো। তিনি তোমাকে উত্তমভাবে ইসলামী শিক্ষার সন্ধান দেবেন।

আমি তার মাধ্যমে সাইয়েদ কুতবের কাছে সালাম পাঠাই।

ফয়সালা নিকটবর্তী

বেশ কয়েকদিন পরে আদালতে মামলা শুরু হবার আগে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমার কাছে অভিযোগ পত্র আসে।

এ এক আজব মামলা। বিচার বিভাগের এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ভূমিকার নজীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া মুশকিল.....। এটাকে বিরাট ট্র্যাজেডী বলা যেতে পারে। আমরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছি যে, আদালতের চূড়ান্ত রায় শামস্ বাদরানে টেবিলের দেরাজে পড়ে রয়েছে। আর ওদিকে মামলার প্রহসন মঞ্চস্থ করার আয়োজন চলছে। সরকারী ফরমান মোতাবেক আমাদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার এবং কৌশুলীদের সাথে সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। আমি প্রসিদ্ধ আইনজীবী জনাব আহমদ খাজাকে Mondater নিযুক্ত করতে চাইলে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, তিনি এই মামলায় অংশ নিতে পারবেন না। এরপর আমি বললাম, আমার কোন কৌশুলীর দরকার নেই। আমি নিজেই নিজের মামলা পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করি।

জনসাধারণ আমার অজান্তেই আমার পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্যে একজন খ্রীষ্টান এ্যাডভোকেট নিযুক্ত করে। মামলা শুরু হবার পূর্বক্ষণে আমার সাথে

সাক্ষাতের জন্যে আমার নিকটাত্মীয়দের অনুমতি দেয়া হয়। আমার মা এবং বোন আমাকে দেখতে আসেন। আমার দুরবস্থা এবং শারীরিক দুর্বলতা দেখে তাঁরা প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আমি তাঁদের সাথে বসে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিলাম। আমাদের সাক্ষাতের সময় সাফওয়াত ও হামজা পাশেই দাঁড়িয়ে তাদের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করছিল। আমি আমার মা ও বোনের মাধ্যমে প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করে পাঠাই যে, কেউ যেন আমার জন্যে কৌশুলী নিযুক্ত না করেন। কিন্তু তারা আমাকে জানান যে, এক হাজার জিনিহের বিনিময়ে হুসাঈন আবু জায়েদকে ইতিমধ্যেই আমার পক্ষের কৌশুলী নিযুক্ত করা হয়েছে এবং তাঁকে মামলা শুরু হবার আগেই অর্ধেক টাকা অগ্রীম দিয়ে দেয়া হয়েছে। তা আসলে আমি তাদেরকে এ ব্যাপারে ওখানে শেষ করতে বললাম। কিন্তু মামলা শুরুর প্রথম দিনই দেখলাম যে হুসাঈন আবু জায়েদ আমার পক্ষে মামলায় লড়তে এসেছেন।

ওদিকে মামলা শুরু হবার আগের দিন আমাকে শামস্ বাদরানের অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। শামস্ আমাকে ডেকে বললেন—

ঃ আশা করি তুমি তদন্তকালীন লিখিত বিবৃতির ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন আপত্তি করবেনা এবং লিখিত সব কথারই সত্যতা স্বীকার করবে। তুমি যদি আদালতে একথা প্রকাশ কর যে, ইখওয়ান তোমাকে বিভ্রান্ত করেছিল এবং সেজন্যে তুমি লজ্জিত, তাহলে অতি সহজেই মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে এবং আমরাও তোমার যথাযোগ্য সেবা ও সম্মান করবো।

আমি বললাম—

ঃ আল্লাহ্ যা পছন্দ করেন তাই করেন। কোন ব্যক্তি তার আপন সমস্যা সমাধানে সক্ষম নয়।

শামস্ বললো—

ঃ বাপু! তুমি সহজ আরবী ভাষায় কথা বল। আমি তোমার ওসব কথা বুঝি না। তবে মনে হচ্ছে তোমার উদ্দেশ্য আমাদের পক্ষে নয়। অথচ আমরা তোমার সেবা ও সম্মান দিতে চাচ্ছি।

আমি বললাম-

ঃ অজানা অদৃশ্য রহস্যের চাবিকাঠি সব আল্লাহর হাতে। এই বিশাল আকাশ-মাটি, জলে-স্থলে, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে; তিনি ছাড়া আর কেউই জানেনা। তিনিই সবকিছু জানেন, শুনেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। এই যে পাতাটি ঝরে পড়লো তার খবরও তিনি রাখেন আর মাটির নীচে গভীর অন্ধকারে যে বীজটি অঙ্কুরিত হতে যাচ্ছে, তাও তিনিই শুধু দেখেন-জানেন। বস্তুতঃ অণু থেকে আসমান পর্যন্ত সব কিছুই তাঁরই নিয়ন্ত্রাধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

শামস্ হা করে তাকিয়ে থেকে সব শুনে হামজাকে ডেকে বলল-

ঃ একে নিয়ে যাও হামজা। ও নিজের স্বার্থ সম্পর্কে চিন্তা করা না করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

হামজা বলল-

ঃ ওকে আমার কাছে ছেড়ে দিন জনাব, আমি তার সাথে আলাপ করে দেখছি।

আমাকে শামস্ বাদরানের অফিস থেকে বের করে অন্য এক কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। হামজা আমাকে আদালতে ইখওয়ান-বিরোধী ভূমিকা পালনের জন্যে বোঝাতে লাগলো। এ পর্যন্ত ওদের মুখ থেকে যেসব কথা শুনতে শুনতে আমার বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা এসে গেছে, সে সেসব বস্তাপচা কথাই আউড়িয়ে যেতে থাকলো। সে বলল-

ঃ প্রথমতঃ তোমার কাছ থেকে বাজেয়াপ্তকৃত সব টাকা তোমাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর আদালতে ইখওয়ানকে যদি ধোকা দেয়া হয় তাহলে তা প্রেসিডেন্ট নাসেরের প্রতি তোমার বিরাট উপহার বলে গণ্য হবে।

সে আমাকে শামস্ -এর কাছে নিয়ে গিয়ে হুকুম ও ইচ্ছে মোতাবেক কাজ করার উপদেশ দিতে লাগলো। আমি তার সব কথা নির্লিপ্তভাবে শুনলাম, হ্যাঁ-না কোন শব্দই উচ্চারণ করলাম না। অবশেষে সে যখন আমাকে ফাঁসীর দন্ড থেকে বাঁচাবে বলে কথাটা একাধিকবার বলল-

তখন আমি তার দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে চেয়ে বললাম-

ঃ আহম্মক কোথাকার! তোমার যদি মলত্যাগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, তা বের করার সামান্য শক্তিও তোমার নেই, আর তুমি এসেছ কিনা আমাকে ফাঁসী থেকে বাঁচাতে।

সে আমাকে কক্ষে পৌঁছিয়ে দিয়ে আদালতে মিথ্যে মামলা দায়েরের ব্যবস্থা পাকাপাকি করতে চলে গেল।

আশ্চার্য! সরকার আর আদালত সবই ছিল তাদের হাতের মুঠোয়। এরপরও তারা আমাকে এতো ভয় করছিলো কেন? তারা চাচ্ছিল আমি যেন আদালতে কথা না বলি, তাদের পেশ কৃত বক্তব্য অস্বীকার না করি এবং তাদের দুঃশাসনের অক্টোপাশে আবদ্ধ জাতির সামনে সত্য তুলে না ধরি।

তারা আদালতে যে মামলা পেশ করে তা এক হাস্যকর অথচ ট্র্যাজেডিপূর্ণ নাটকীয়তার পরিচয় বহন করছিল। তারা এটা বোঝাবার প্রয়াস পাচ্ছিল যে, দেখ ওরা যে নাসেরকে খুন করতে চেয়েছিল, সেকথা তারা নিজ থেকে স্বীকার করছে এবং প্রত্যেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের বিরুদ্ধে নিজের সাক্ষ্য দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর রহমতে তাদের সব চক্রান্ত এবং দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হয়ে যায়। আদালতের রায় তাদের চক্রান্তকে ধূলিস্যাৎ করে দেয়। অথচ আদালতকে প্রভাবিত করার জন্যে তারা সব আয়োজনই পূর্ণ করেছিল। এমনকি কর্ণেল ওজুমীর মতো লোকেরা এসে আদালতের ডায়াসে বসে থাকতো। কিন্তু সত্যের জয় যে অবশ্যম্ভাবী তা প্রমাণিত হয়ে গেল।

সুখবর

ঃ এমন অবস্থায় একদিন আমি স্বপ্নে দেখি যে, দিগন্ত বিস্তৃত, এক মাঠে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার মনে হচ্ছিল এটাই আদালত এবং এখানেই আমাদের বিচার হবে। সারা আকাশ যেন মাটির উপর সামিয়ানা হয়ে ছায়া দিচ্ছিল। আর আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত মনোরম এক আলোক রেখা ছড়িয়ে আছে। আমি দেখলাম, প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কেবলামুখী হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং আমি তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম। তিনি

বলছিলেনঃ "সত্যের আওয়াজ মনোযোগ দিয়ে শোন!" আমি এমন এক অপূর্ব আওয়াজ শুনলাম, যা মনে হচ্ছিল আসমান-যমীনের সবদিক থেকে একই ভাবে ভেসে আসছিল। ভেসে আসা এই কথাগুলি ছিলঃ "এখানে মিথ্যে আদালত কায়েম হবে এবং তা বাতিলের পক্ষে সিদ্ধান্ত দেবে। কিন্তু তোমরা বিশ্বাসী এবং সত্য পথের দিশারী·····। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ধৈর্যের শিক্ষা দাও, পরস্পর যোগাযোগ রাখ এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমাদের কল্যাণ হবে।" এসব কথা অতি সুন্দরভাবে আকাশ-মাটি ছেদ করে যেন বেরিয়ে আসছিল। এর প্রভাবে এক গভীর উপলব্ধি এবং হৃদয়-মনে এক অবর্ণনীয় আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম বলে সব কথা আমার স্মরণ নেই। এই অস্বাভাবিক আওয়াজ শেষ হয়ে এলে প্রিয়নবী আমার দিকে লক্ষ্য করে ডানদিকে দেখতে ইঙ্গিত করলেন। দেখলাম, আকাশ-ছোঁয়া এক পর্বত চূড়া। তার সজীব-সুন্দর শ্যামলিমা ছিল অত্যন্ত মনোলোভা তাতে সবুজ গালিচা পেতে দেয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল।

প্রিয়নবী আমাকে বললেন–

ঃ "জয়নব, তুমি এই পর্বত চূড়ায় উঠে পড়। চূড়ায় হাসান হুজাবীকে দেখতে পাবে। তার কাছে এসব কথা পৌছিয়ে দাও।" এরপর প্রিয়নবী গভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি আমার সকল অস্তিত্বে অপূর্ব এক শক্তি অনুভব করলাম। যদিও প্রিয়নবী কোন শব্দ উচ্চারণ করেননি, কিন্তু আমার মনে হলো আমি তাঁর সব কথা বুঝে নিয়েছি এবং এর উদ্দেশ্যও বুঝতে পেরেছি। প্রিয়নবী পর্বত চূড়ার দিকে হাত উঠালে– আমি নিজেকে পর্বত আরোহণ করছি বলে অনুভব করলাম। পর্বতারোহণ কালে খালেদা ও আলীয়া হুজায়বীর সাথে দেখা হলো। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম–

ঃ আপনারাও কি আমার সহযাত্রী?

তাঁরা ইতিবাচক জবাব দিলেন। আমি তাদের ছেড়ে সামনে এগিয়ে চললাম। কিছুদূর গিয়ে উমাইয়াহ্ ও হামীদা কুতুব এবং মাজমা ঈসার সাথে দেখা হলো। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম–

ঃ আপনারাও কি আমার সাথে চলছেন?

তাঁরা জবাব দিলেন–হ্যাঁ।

আমি আরো এগিয়ে চললাম। অবশেষে চূড়ায় গিয়ে পৌছলাম। চূড়ায় গিয়ে দেখি, গালিচা মোড়া ছোট সমতল মালভূমি। একপাশে চমৎকার করে আসন পাতা রয়েছে ওখানে জনাব হুজায়বী বসে আছেন। আমাকে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে সালাম জানালেন। আমার উপস্থিতিতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন। আমি তাঁর কুশলাদী জেনে বললাম–

ঃ আমি প্রিয়নবীর কাছে থেকে কয়েকটি কথা আপনার কাছে পৌছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে এসেছি।

তিনি বললেন–

ঃ তা ইতিমধ্যেই আমার কাছে পৌছে গেছে।

আমরা আল্লাহ্কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বসে পড়লাম। প্রিয়নবীর কথা শব্দে নয় বরং আধ্যাত্মিকভাবে পৌছে গেছে। আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতিতে তাঁর স্পষ্ট ছবি অংকিত হয়ে গেছে।

আমি জনাব হুজায়বীর কাছে বসা অবস্থায় পর্বতের নীচে তাকিয়ে একটি চলন্ত রেলগাড়ীতে দু'জন বিবস্ত্র মহিলা দেখতে পেলাম। আমি জনাব হুজায়বীর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলে তিনিও তা দেখেন। আমি দৃশ্য দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হলাম। আমার মর্ম যাতনা আঁচ করে জনাব হুজায়বী বললেন–

ঃ এতে কি তোমার কোন আপত্তি আছে?

আমি বললাম– অবশ্যই আছে।

তিনি বললেন–

ঃ তুমি কি মনে কর যে, আমরা আমাদের হাত পায়ের শক্তিতে এখানে পৌছেছি। বরং আমাদের উপর আল্লাহ্র মেহেরবানী হয়েছে।·····তুমি ঐ দু'জন মহিলা সম্পর্কে দুশ্চিন্ত করো না।

আমি বললাম, এদেরকে সৎপথে আনার জন্য আমাদেরকে সংগ্রাম করে যেতে হবে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন– তা কি তুমি ব্যক্তিগতভাবে করতে পার?

আমি বললাম– আল্লাহ্র সাহায্যে পারবো।

হুজায়বী সাহেব তখন বললেন–

ঃ আল্লাহ্র রহমতের জন্যে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিৎ। শোকর আদায়ের জন্যে তিনি দু'হাত তুলে মোনাজাত করলেন। আমিও তাঁর সাথে যোগ দিলাম। মোনাজাত কালে আমরা বার বার আলহামদু লিল্লাহ্ শব্দ উচ্চারণ করতে থাকি।

এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ খুলে যায়। জেগে উঠে অপূর্ব এক অনুভূতিতে সারা মনপ্রাণ ছেয়ে যায়। এরপর আমার মনে আর কোন ভয়ভীতি থাকলো না। অদ্ভুত এক প্রশান্তি আর শক্তি অনুভব করলাম। এই স্বপ্ন আমার শারীরিক ব্যথা-বেদনা এবং মানসিক দুঃখ-দুশ্চিন্তাও দূর করে দিল।

আল্লাহ্ বলেছেন– "যারা হিযরত করেছে, যাদেরকে তাদের আপন বাসস্থান থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, যারা আমার পথে চলতে গিয়ে দুঃখ দুর্দশা সহ্য করেছে, যারা জিহাদ করেছে এবং শহীদ হয়েছে– আমি তাদের সব পাপ ক্ষমা করে দেবো। আর তাদেরকে এমন বাগানে স্থান দেব, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রতিদান হিসেবে উত্তম পুরস্কার দেয়া হবে। তোমরা ওসব লোকের অনুসরণ করো না, যারা আল্লাহ্কে অবিশ্বাস করেছে। হে মুমিনগণ! ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যের শিক্ষা দাও, পরস্পর পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রাখ, আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমরা কল্যাণ পাবে।"

প্রতিশ্রুত দিবস

মামলার রায় ঘোষণার দিন আমাদের আদালতে পৌঁছানোর জন্যে গাড়ির অপেক্ষায় অফিসে পাঠানো হয়। আটটার দিকে পুলিশ সামরিক বাহিনীর অফিসার এবং সৈনিক কারাগারের মাঠ ভরে যায়। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন যুদ্ধ করার জন্যে রণাঙ্গণে যাচ্ছে। একটি গাড়ী এলে আমরা তাতে উঠে বসি। অফিসার এবং সিপাহীরা আমাদের গাড়ী ঘিরে দাঁড়ায়। আদালতে পৌঁছতেই আমাদেরকে কাঠগাড়ায় পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। আমরা সংখ্যায় ছিলাম ৪৩ জন। ক্রমিক পর্যায়ে তাঁদের নাম হচ্ছে–

১। সাইয়েদ কুতুব
২। মোহাম্মদ ইউসুফ হাওয়াশ
৩। মোহাম্মদ ফাত্তাহ ইসমাইল
৪। আহমদ আবদুল মজিদ আবদুস্ সমী
৫। আহমদ ওরফে ইব্রাহীম আলকাওমী
৬। মাজদী আবদুল আজীজ মুতাওয়াল্লী
৭। আবদুল মজীদ ইউসুফ আবদুল মজীদ আল সাজলী
৮। আব্বাস সাঈদ আস্ সিসী
৯। মোবারক আবদুল আজীম মাহমুদ আয়াদ
১০। ফারুক আহমদ আলী আল মানসাবী

১১। ফায়েজ মোহাম্মদ ইসমাইল ইউসুফ
১২। মামদুহ্ দরবেশ মুস্তাফা আদ দিউবী
১৩। মোহম্মদ আহমদ আবদুর রহমান
১৪। জালালুদ্দিন বিকরী দিসাবী
১৫। মোহাম্মদ আবদুল মোয়াত্তা ইব্রাহীম আল জাজ্জার
১৬। মোহাম্মদ আল মামুন ইয়াহিয়া জাকারীয়া
১৭। আহমদ আবদুল হালীম আস সীরোজী
১৮। সালাহ্ মোহাম্মদ খলিফা
১৯। সাইয়েদ সাদুদ্দিন আস-সায়েদ শরীফ
২০। মোহাম্মদ আবদুল মোয়াত্তা আবদুর রহীম
২১। ইমাম আবদুল লতীফ আব্দুল ফাত্তাহ গাইস
২২। কামাল আব্দুল আজীজ আল ইরফী
২৩। ফুয়াদ হাসান আলী মুত্তাওয়াল্লী
২৪। মোহাম্মদ আহমদ আল বুহাইরী
২৫। মুহাম্মদী হাসান সালেহ্
২৬। মোস্তফা আব্দুল আজীজ আল-খুজায়বী
২৭। আস-সাইয়েদ নজিলি মোহাম্মদ আউলিয়াহ্
২৮। মুরসী মোস্তফা মুরসী
২৯। মোহাম্মদ বদি আব্দুল মজীদ মোহাম্মদ সানী
৩০। মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম্ শাহীন
৩১। মাহমুদ আহমদ ফখরী
৩২। মোহাম্মদ ইজ্জত ইব্রাহীম
৩৩। সালাহ্ মোহাম্মদ আব্দুল হক
৩৪। হেলমী মোহাম্মদ সাদেক হাতহুত
৩৫। আলহিসাম ইয়াহিয়া আব্দুল মজীদ বদবী
৩৬। আব্দুল মোনয়েম আব্দুর রউফ ইউসুফ আরাফাত
৩৭। মোহাম্মদ আব্দুল ফাত্তাহ রিজ্‌ক শরীফ
৩৮। জয়নব আল-গাজালী আল জুবাইলী
৩৯। হামীদা কুতুব ইব্রাহীম
৪০। মহীউদ্দীন হেলাল
৪১। ইসাবী সুলায়মান
৪২। মোস্তফা আল-আলম

৪৩ নম্বর আসামী ছিল আলী উসমাবী। কিন্তু সে সংকীর্ণ স্বার্থের মায়ায় পড়ে নিজের ধর্ম ও বিবেক বিক্রি করে রাজস্বাক্ষী হয়ে যায়। এভাবে সে লজ্জিত ও অপমানিত হয়।

আমরা কাঠগড়ায় পৌঁছলে সুবিচারের শত্রু বিচারপতির গাউন পরে এজলাসে এসে বসলেন। তিনি একে একে আমাদের প্রত্যেকের নাম ডেকে তাঁর বিচারের প্রতি আমাদের কোন আপত্তি আছে কিনা জানতে চাইলেন। জবাবে তাঁকে জানানো হলো–

ঃ কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আমাদের কোন আপত্তি নেই; তবে যে আইনের মাধ্যমে আমাদের বিচার করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে আমাদের আপত্তি অবশ্যই আছে। যেসব আইনের অধীনে আমাদের বিচার করা হচ্ছে, তা বাতিল আইন। এর উপর আমাদের কোন আস্থা নেই। আমরা কেবল আল্লাহ্‌র দেয়া আইনের বিশ্বাসী এবং সেই আল্লাহ্‌র আইন মোতাবেকই বিচার চাই।

যাহোক, আদালতের আনুষ্ঠানিক জিজ্ঞাসাবাদের পর জানানো হয় যে, আদালত, জয়নব আল-গাজালী এবং হামিদা কুতুব সম্পর্কিত মামলার রায় আলাদাভাবে ঘোষণা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরপর আমাদের কাঠগড়া থেকে বের করে দেয়া হয়। আমরা আদালত কক্ষে আগত আত্মীয়-স্বজনকে দুর থেকে ইঙ্গিতে সালাম জানাই।

আদালতের শুনানী মুলতবী না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে একটি কক্ষে বন্ধ করে রাখা হয়। এরপর গাড়ীতে করে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ হচ্ছে ১৯৬৬ সালের ১০ই এপ্রিলের কথা। সে বছর ১৭ই মে পর্যন্ত আমরা বিচারের নামে প্রহসন শুরু হওয়ার অপেক্ষায় কারাগারের কালো কক্ষে অবস্থান করি।



ষষ্ঠ অধ্যায়

আদালত

১৭ই মে'র সকালে আমাদের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। বিচারক মন্ডলীর সভাপতিত্ব করছিলেন সামরিক বাহিনীর কর্ণেল ওজুমী। তাঁর হাবভাব ছিল ভীষণ কড়া ধরনের। অন্যান্য বিচারপতিরা তাঁর ডানপাশে বসেছিলেন।

এটর্নির কাছে একটি টেবিল ঘিরে কয়েকজন সাংবাদিক বিচার শুরু হবার অনেক আগে থেকেই এসে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। প্রেস ফটোগ্রাফাররা আমাদের ছবি নিতে শুরু করলো। এদের মধ্যে আব্দুল আজীম নামক প্রেস ফটোগ্রাফারও ছিল। আব্দুল আজীম ইসলামী মহিলা সংস্থার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি নিতে আসতো বলে তাকে দেখেই আমি চিনতে পারি।

আমি তাকে ডেকে বললাম–

ঃ আব্দুল আজীম। এসব সংরক্ষণ করে রেখো। পরে এসবের দরকার পড়তে পারে।

সে বললো– অবশ্যই।

সে নির্ভীকভাবে তা বলতে গিয়েও অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল বলে মনে হলো। জবাব দিয়ে হঠাৎ তার চেহারা রঙ হলুদ হয়ে উঠলো। সে কয়েক মিনিটের মধ্যে পালিয়ে বাঁচলো যেন। সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে বিচারপতি কর্ণেল ওজুমী আমার নাম উচ্চারণ করেই মামলার কাজ শুরু করলেন। তিনি বললেন–

ঃ জয়নব, কি করছো?

আমি প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছাই।

আমাকে যেসব প্রশ্ন করা হলো, তার সাথে তদন্তকালীন দেয়া আমার বিবৃতির সাথে কোন সম্পর্কই ছিল না।

আমি তার কথার জবাবে বললাম– আমি এসব কথা তার কাছে বলিনি। আমি শুধু দু'টি প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম।

কর্ণেল বিচারপতি ওজুমী বললেন–

ঃ হাসান হুজায়বীর কথা হচ্ছে, তুমি তাঁকে যে চার হাজার জিনিহ দিয়েছ, তা নিজের স্বামীর কাছ থেকে চুরি করে দিয়েছ।

আমি বললাম–

ঃ চার হাজার জিনিহ ছিল আটক ব্যক্তিদের পরিবার বর্গের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ইত্যাদির জন্যে ইখওয়ানদের চাঁদার টাকা। ১৯৫৪ সালের মামলার পর জামাল আব্দুল নাসের এসব পরিবার বর্গকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

আমার কথায়, বিশেষ করে শেষ বাক্য শুনে মুখোশ পরিহিত বিচারপতি ওজুমীর অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যেন তাঁকে এই মাত্র বিষাক্ত বিছায় কামড়েছে।

তিনি এবার বললেন–

ঃ তোমার যখন পা ভেঙ্গে যায় তখন কেন এসব টাকার ব্যাপারে তোমার মনে শংকা জাগে? তোমার কাছে হাসপাতালে আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইল কেন আসতো? যাকে তুমি নিজের ঘরে সিন্দুকের চাবি দিয়েছিলে, তাথেকে টাকা নিয়ে হুজায়বীকে দেওয়ার জন্য!

আমি বললাম–

ঃ যেহেতু ওসব ইসলামী আন্দোলনের টাকা ছিল যা কয়েদী ভাইদের পরিবার বর্গের সাহায্যার্থে জমা করা হয়েছিল। ওসব পরিবারকে আপনারাই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। ·····আমি মরে গেলে সেই টাকা আমার ওয়ারিশরা নিয়ে নিতে পারে এই আশংকায় আমি টাকা তার আসল মালিক অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলনকে ফিরিয়ে দেই।

বিচারপতি ওজুমী এবার বললেন–

ঃ ওসব সংগঠনের টাকা, যা দিয়ে তোমরা অস্ত্র ক্রয় করতে। হুজায়বী বলেছেন, এ টাকা অর্জন সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। ·····তুমি নিশ্চয়ই তোমার টাকা চুরি করেছ।

এটর্নি মাঝখানে হস্তক্ষেপ করে বললেন–

ঃ সাইয়েদ কুতুবের বক্তব্য মোতাবেক তিনি হামীদার কাছ থেকে ব্যাপক আকারে কর আদায়ের জন্য বলেছেন।

আমি বললাম– এসব কিছু হয়নি।

এটর্নি প্রশ্ন করলো– তাহলে, সাইয়েদ কুতুব কি মিথ্যে বলেন? আমি বললাম– আল্লাহ্ তাকে মিথ্যাবাদীতা থেকে মুক্ত রাখুন।

এটর্নি আর সইতে পারলো না। সেই ভরা আদালতেই বিশ্রী গালিগালাজ শুরু করে দিল। আমি বিস্মিত হলাম। আদালত কক্ষে এধরনের অশ্লীল গালি শুনবো তা জীবনে কোনদিন ভাবিনি। আশ্চার্য! এসব অসভ্য ব্যক্তি এভাবেই কি মিশরের ভদ্রতা ও শালীনতার ঐতিহ্যকে গলা টিপে হত্যা করবে?

কর্ণেল বিচারপতি ওজুমী আমার সাথে জিজ্ঞাসাবাদ মূলতবী ঘোষণা করলে আমি আবার কাঠগড়ায় ফিরে যাই। এরপর হামীদা কুতুবকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে ডাকা হয়। তার সাথে সওয়াল জবাব শেষ করে তাকেও কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এরপর এটর্নি তার বিবৃতি পাঠ করতে শুরু করলো।

এসবকে আদালত বা বিচারালয় বলা ঠিক হবে কিনা জানিনা। যেখানে এর্টনি সম্ভ্রান্ত লোকদের বিশ্রী ভাষায় গালি দিতে পারে এবং মনগড়া অপবাদ রটনা করতে পারে, সেটা আবার কেমন আদালত? এটর্নির নামে যে ব্যক্তিটি আদালতে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, তার মনের কালিমা চেহারাকে কালো করে আদালত কক্ষেও তার কালো প্রভাব ছাড়াচ্ছিল।

এর জঘন্য মিথ্যাবাদীতা শুনে রাগে আমার রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ওঠে। আমি তার আপত্তিকর কথার প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্যে হাত তুলি। বিচারপতি গাউন পরিহিত ওজুমী ভেবেছেন, আমি হয়তো ফাঁসীর দন্ড থেকে বাঁচার জন্যে শেষ মুহূর্তে তাদের পক্ষ অবলম্বনের উদ্দেশ্যে হাত তুলেছি। তিনি আহম্মকের মতো আমার দিকে তাকিয়ে বললেন– বল।

আমি মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে পুরো আদালত কক্ষে দৃষ্টি বুলিয়ে বলতে শুরু করলাম–

ঃ পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। আমরা জাতির কর্ণধার। আমরা কুরআন ও শরিয়তের হেফাজতকারী। আমাদের কাছে রাসূলই হচ্ছেন মানবতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। আমরা আল্লাহ্‌র পথে অবিচল থাকবো এবং তাওহীদ, রিসালাত, ন্যায় ও সত্যের পতাকা উত্তোলিত রাখবো। এ থেকেই জাতি তার পথের দিশা পাবে। .....জালিম-অত্যাচারীদের চক্রান্ত ও ধোকার মুখে আল্লাহ্‌ই আমাদের নেগাহ্‌বান এবং তাঁরই দয়াই আমাদের জন্যে যথেষ্ট।

এরপর আমি তথাকথিত বিচারপতি এবং এর্টনির দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে বলি–

ঃ এদের মিথ্যাবাদীতা এবং অপবাদ থেকে আল্লাহ্‌ই আমাদের জান ও মাল রক্ষার জন্য যথেষ্ট।

একথা আমি কয়েকবার বললাম। তথাকথিত বিচারপতি ওজুমী হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত রোগীর মতো চেঁচিয়ে উঠে বলল–

ঃ থামো! থামো! তুমি এসব কি বলছো? এই বলে তিনি এমন সব শব্দ উচ্চারণ করছিলেন যে, তার কসরৎ দেখে আদালত কক্ষে উপস্থিত সব লোক হাসতে লাগলো। বিচারপতিই বটে! .....বিচারপতিকে কিভাবে কথা বলতে হয়, তাও তার জানা ছিল না। বস্তুতঃ আব্দুন নাসেরের সব সহযোগিই ছিল এমন গৌয়ার-গোবিন্দ। এসব সহযোগিই তাকে বিভ্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কোন ভদ্র এবং জ্ঞানীলোক তার সংস্পর্শে থাকতো না বলে সে এসব গৌয়ার-গোবিন্দকেই বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্যে নিয়োগ করতো।

এরপর আমি বসে বসে বললাম-

ঃ মুর্খতাই হচ্ছে আসল সমস্যা। এই মুর্খতার কারণেই যতোসব মন্দ কাজের সৃষ্টি হয়। আজকের বিচারপতি ও এটর্নির যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব ইতিহাস অবশ্যই তার সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে রাখবে। সেদিনের এজলাস মুলতবী হলে আমাদের জেলে ফিরিয়ে আনা হয়। আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষে ফিরে আসি। কিন্তু আমাকে আদালতে কথা বলার শাস্তি ভোগ করতে হয়।

চরম বর্বরতা

আমি ভেবেছিলাম, আদালতে মামলা চলছে বলে আমার উপর অত্যাচার চালানো হয়তো বন্ধ রাখা হবে। কিন্তু না, আগের মতোই আমাকে তদন্তের নামে অফিসে অফিসে ঘোরানোর কাজ চলতে থাকে। এবার আমাকে কয়েকজন লোক সম্পর্কে তথ্য দিতে বলা হয়। আমি এ ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করলে, আমাকে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে মারধোর করা হয়। একদিকে আদালতে মামলার কাজ চলছে। অন্যদিকে আমার উপর সমানে অত্যাচার চলছে। কোন অভিযুক্তের সাথে এমন দুর্ব্যবহারের নজীর ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। কোন আদালত বা কোন তদন্তকারী দল কি এ -ধরণের অন্যায় আচরণ করতে পারে? এমনকি ইসলামী আন্দোলনের প্রথম দিকে সেই অন্ধকার যুগের কোরাইশরা পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন জঘন্য অসৎ আচরণ করেনি। সত্যিই করেনি। ইতিহাস তার সাক্ষী।

মামলার রায় ঘোষণা

মামলার রায় ঘোষণার দিন আমাকে এবং হামীদাকে একখানা আলাদা গাড়ীতে করে সিপাহীদের কড়া পাহারায় আদালতের রায় শোনার জন্যে নেয়া হয়। আমাদের আগের গাড়ীতে পুরুষ বন্দীদের নেয়া হয়। প্রথমে পুরুষদের শুনানী শুরু হয়। ততক্ষণ আমাদের পৃথক কক্ষে বসিয়ে রাখা হয়। এরপর আমাদের আদালত কক্ষে আনা হয়। প্রথমে আমার নাম ডাকা হয় এবং "পঁচিশ

বছরের সশ্রম কারাদন্ড সহ আমার স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত" ঘোষণা করা হয়। আমি আদালতের রায় শুনে বললাম-

ঃ আল্লাহু আকবার। সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে! .....জয়নব সত্যের পথে, ইসলামী আন্দোলনের পথে কোন দুর্বলতা দেখালে চলবে না। কোন ভয় বা দুঃখেরও কারণ নেই। .....মুমিন হয়ে বেঁচে থাক, শেষ পর্যন্ত সাফল্য তোমারই পদচুম্বন করবে।

আমার পর বোন হামীদা কুতুবের নাম ঘোষণা করা হলো-

"দশবছর সশ্রম কারাদন্ড।"

আমি উঠে হামীদাকে গলা জড়িয়ে বললাম-

ঃ আল্লাহ আকবর। আল্লাহ্‌র শোকর। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের পথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে আমাদের চেষ্টা ও সংগ্রাম সাফল্যে ম র পথে, আমরা সন্তুষ্ট।

আম্‌র স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে বলতে আদালত প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হই। ওখানে গাড়ী ভরা ইখওয়ান ভাইদের দেখতে পাই। ওঁদের ব্যাপারে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম। ওরা আমাদেরকে দেখতে পেয়ে একজন উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন-

ঃ ".... জয়নব বোন....?"

আমি জবাব দিলাম- "ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের পথে পঁচিশ বছরের সশ্রম কারাদন্ড।"

তিনি এবারে জানতে চাইলেন- "....হামীদা বোন....?"

আমি বললাম- আল্লাহ্‌র দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দশ বছরের সশ্রম কারাদন্ড।"

আমি তাঁদের কাছে জনাব সাইয়েদ কুতুব, ভাই আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইল এবং ইউসুফ হাওয়াশের খবর জানতে চাইলে তাঁরা জানালেন- .....আল্লাহ্‌র পথে শহীদ....বুঝলাম তাঁদের মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে। হাত তুলে আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করলাম।--

ঃ হে পরওয়ারদিগার! তোমার সন্তুষ্টির পথে নিবেদিত তাঁদের মহান আত্মত্যাগ কবুল কর এবং বিনিময়ে এই যমিনের বুকে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে তোমার মুজাহীদদের শক্তি-সাহস ও সাহায্য দান কর। ইনশাআল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌র দ্বীনই বিজয়ী হবে।

সাফওয়াত এবং অন্যান্য সিপাহীরা এসে আমাকে এবং হামীদাকে একটি ছোট্ট গাড়ীতে তুলে দিল। সাংবাদিক এবং প্রেস ফটোগ্রাফাররা আমাদের দেখে ছুটে এলো। ওরা ছবি নিতে চাচ্ছিল। আমার কাছে তা খুব আপত্তিকর মনে হয়। আমি তাদের ডেকে বললাম-

ঃ তোমরাও কি ওইসব জালিম অত্যাচারীদের অনুসারী? আমাদের উপর অন্যায়-অবিচারে তোমরাও কি আনন্দিত? –জাতীয় ঘৃণ্যতম শত্রুদের সাথে কি তোমরা হাত মিলিয়ে আছ? যদি তা হয় তাহলে এসব কি হচ্ছে? কি দেখতে পাচ্ছি



হামিদা কুতুব (বামে) জয়নব আল-গাজ্জালীকে (ডানে) জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ছবি ঃ জনাব শাহ আবদুল হান্নান এর সৌজন্যে

আমাদের জেলে পৌঁছানোর পরপরই নির্যাতনের নতুন ধারা শুরু হয়ে যায়। তবে আদালতের রায় ঘোষণার পর থেকে আমাকে এবং বোন হামীদা কুতুবকে একই কক্ষে রাখা হয়।

সাইয়েদের সাথে কয়েক মুহূর্ত

মৃত্যুদন্ড ঘোষণার পাঁচদিন পরে ভাই সাইয়েদ কুতুব এসে আমাদের কক্ষের কড়া নাড়লেন। দরজা খুললে তিনি একজন সামরিক অফিসারের সাথে ভিতরে এলেন। তাকে ভিতরে রেখে অফিসার ফিরে চলে যায়। অবশ্য সাফওয়াত সাইয়েদ কুতুবের কাছে বসে থাকে। আমি বীর সাইয়েদকে খোশ্ আহমেদ জানিয়ে বললাম।

ঃ আপনি আমাদের কাছে কয়েক মুহূর্তের জন্যে বসেছেন– তা আমাদের উপর

আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতের সমতুল্য এবং এটাকে আমরা আমাদের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য বলে মনে করি।

তিনি অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক কণ্ঠে আমাদের সাথে মৃত্যু এবং তার নির্ধারিত সময় সম্পর্কে তত্ত্বগত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

ঃ জীবন-মৃত্যুর এখতিয়ার পুরোপুরি আল্লাহ্‌র হাতে। আল্লাহ্‌র ছাড়া অন্য কেউ এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের পথে অবিচল থাকতে বলেন। তিনি বলেন– আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যই আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা এবং তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য জান-মাল কোরবান করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের জীবনের পরম স্বার্থকতা।

এরপর তিনি তাঁর বোন হামীদা কুতুবকে কানে কানে কিছু উপদেশ দেন এবং চাপাকণ্ঠে আমাকেও কিছু পরামর্শ দেন। সত্যদ্রোহী সাফওয়াত আমাদের কথাবার্তায় অসহ্য হয়ে গর্জে উঠলো এবং সাইয়েদকে উঠে যেতে বললো। এ ধরণের কঠিন সন্ধিক্ষণে পাথরও হয়তো গলে যেতো। কিন্তু পাপিষ্ঠ জালিমদের মন পাথরের চেয়েও কঠিন। মানবতাবোধ বলতে তাদের কোন অনুভূতিই নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই যে ভাই শহীদ হতে যাচ্ছেন, তাকে তার বন্দিনী বোনের সাথে কয়েক মুহূর্ত কথা বলার সুযোগ দিতেও তারা নারাজ।

সাইয়েদ কুতুব সাফওয়াতের অভদ্র আদেশ শুনে আমাদের লক্ষ্য করে বললেন–

ঃ কোন পরওয়া নেই। আমাদের অন্তরে ধৈর্য্যের স্থান বহাল থাকা চাই। এই বলে তিনি আমাদের সালাম জানিয়ে চলে গেলেন।

ফাঁসির আগের পাঁয়তারা

ফাঁসির জন্যে নির্ধারিত রাতে নাসেরের এজেন্টরা বোন হামীদা কুতুবকে ডেকে যে আলাপ-আলোচনা করে, তা তার মুখেই শুনুন। বোন হামীদা বললেন–

ঃ হামজা আমাকে অফিসে তলব করে মৃত্যুদন্ডের সরকারী নির্দেশনামা ও তার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি-পত্র আমাকে দেখিয়ে বললো–

ঃ আপনার ভাই যদি এখনো আমাদের কথামতো জবাব দেন তাহলে সরকার তাঁর মৃত্যুদন্ড প্রত্যাহার করতে রাজী আছেন। .....দেখুন, আপনার ভাইয়ের ফাঁসি পুরো জাতির জন্যে দুঃখজনক এবং শোকাবহ হবে। আর তা মিশরের এক অপূরণীয় ক্ষতি বলে বিবেচিত হবে। .....আমার বিশ্বাস করতে মন চাচ্ছেনা যে, মাত্র কয়েক ঘন্টা পরেই এই মহান ব্যক্তিত্বকে আমরা

চিরদিনের জন্যে হারিয়ে ফেলবো। .....আমরা যে কোন উপায়ে হোক আপনার ভাইকে এই অবাঞ্ছিত মৃত্যুদন্ড থেকে বাঁচাতে আগ্রহী। অবশ্য এঁজন্যে তাঁকে কেবল দু'একটি কথাই বলতে হবে। এরপরই তাঁকে ফাঁসির দন্ড থেকে রেহাই দেয়া হবে। .....আমরা জানি যে, আপনি ছাড়া অন্য কেউই তাঁকে কোন কথায় রাজী করাতে পারবেনা। এ ব্যাপারে আপনি শেষ ভরসা.....এসব কথাবার্তা আমার দায়িত্বেই থাকবে। কিন্তু আমার চেয়ে আপনিই তাঁর উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবেন। ব্যাস–শুধু একটি কথাই তিনি বলবেন। এরপর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাকে শুধু এ কথাটাই বলতে হবে যে, এই আন্দোলনের আসল সম্পর্ক অন্য কোন দেশের সাথে রয়েছে। এই কথাটা বলা মাত্রই আমরা তাঁর অবনতিশীল স্বাস্থ্যের অজুহাত দেখিয়ে মৃত্যুদন্ড মওকুফ করে তাঁকে মুক্তি দিয়ে দেবো।

ওর কথা শুনে আমি বললাম–

ঃ কিন্তু তোমরা প্রত্যেকেই এবং তোমাদের প্রেসিডেন্ট নাসের জানে যে, এই আন্দোলনের সাথে অন্য কোন দেশ বা শক্তির কোন সম্পর্ক নেই। হামজা স্বীকার করে বলল–

ঃ প্রতিটি লোকই এটা জানে যে, তোমরা মিশরে ইসলামের জন্যে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছ এবং তোমরা নিঃসন্দেহে দেশের সবচেয়ে উত্তম ও চরিত্রবান লোক সচেতন ও শিক্ষিত লোক; কিন্তু এখন সাইয়েদ কুতুবকে বাঁচানোই হচ্ছে আসল কথা।

আমি তখন বললাম–

তোমাদের হাই কমান্ড যদি একথা তাঁর কাছে পৌছানোর ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।

এরপর হামজা সাফওয়াতকে ডেকে বলল–

ঃ এঁকে তাঁর ভাইয়ের কাছে পৌছিয়ে দাও।

আমি আমার ভাই সাইয়েদ কুতুবের কাছে গিয়ে সরকারের পয়গাম পৌছিয়ে দিই। তিনি সব শুনে আমার দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে দেখে নীরব-নিঃশব্দেই যেন জিজ্ঞেস করলেন–

ঃ তুমিও কি তা চাও? নাকি এটা শুধু ওদেরই ইচ্ছে?

আমি আমার ইঙ্গিতে জানালাম–

ঃ এটা আমার কথা বা ইচ্ছে নয়।

এরপর সাইয়েদ কুতুব গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–

আল্লাহ্‌র শপথ আমি যা বলেছি তা সত্যই বলেছি। বিশ্বের কোন শক্তিই কোন কিছুর বিনিময়েই আমার মুখ দিয়ে মিথ্যে বলাতে পারবেনা।

আমি কোন রকমের অনুচিত কথা বলিনি।

সাফওয়াত জিজ্ঞেস করলো–

ঃ এটাই কি তোমার মত? একথা জিজ্ঞেস করে সে আমাদের ওখানে রেখে যেতে বলল–

ঃ কিছুক্ষণ আরো বসে বুঝতে পার কিনা, চেষ্টা করে দেখ।

আমি আমার ভাইকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব ঘটনা খুলে বলে চললাম।

হামজা আমাকে ডেকে মৃত্যুদন্ডের সরকারী নির্দেশনামা দেখিয়েছে এবং আপনার কাছে তার পক্ষ থেকে সরকারের পয়গাম পৌঁছাতে অনুরোধ করে। আমার ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন–

ঃ তুমি কি তাতে সুখী হবে?

আমি বললাম–না!

তিনি শান্ত সহজ কণ্ঠে বললেন–

ঃ লাভ-ক্ষতি মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। জীবন এবং জীবনের আনুসঙ্গিক সব কিছু আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি আমার হায়াত বাড়াতে বা কমাতে পারে না কারণ যা করার তা শুধু আল্লাহ্‌র হাতেই রয়েছে। তিনিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন।

ফায়সালা কার্যকরী

কয়েকদিন পর আমরা সাইয়েদ কুতুব, আব্দুল ফাত্তাহ্ ইসমাইল ও মোহাম্মদ হাওয়াশের শাহাদাতের খবর শুনি। এ খবর আমাদের উপর যেন বজ্রপাতের মতো পড়লো। এ'রা প্রত্যেকেই ছিলেন জাতীয় নেতা। তাঁদের প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, উন্নত চরিত্র, মহানুভবতা, বিপ্লবী চিন্তাধারা এবং ইসলামী বৈশিষ্ট্যের জন্যে গোটা জাতির কাছে এঁরা ছিলেন আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র। এমন কি শত্রুরা পর্যন্ত তাদের বলিষ্ঠ নৈতিক-চারিত্রিক গুণাবলীর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করতো না। আজ তাদের মতো মহান জন-নায়কদেরকে বিদেশী লাল-সামাজ্যবাদের ইঙ্গিতে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। কি মর্মান্তিক

বিশ্বাসঘাতকতা মহান বিপ্লবী নেতা সাইয়েদ কুতুবকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। আর তাঁর বোন আমারই সাথে লৌহকারার অন্তরালে আমারই পাশে বসে। কোন্ ভাষায়, কোন্ শব্দে যে তাঁকে শান্তনা দেবো, তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। ব্যথায়-দুঃখে আমিও মূহ্যমান; নির্বাক-নীরবতা ছাড়া কোন ভাষাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিইবা আমি বলতে পারি? কিইবা করতে পারি? এটা আমার বা কোন ব্যক্তি বিশেষের দুঃখ নয়; এই দুর্ঘটনায়, এই দুঃখে গোটা মিশর, সমগ্র মুসলিম বিশ্ব শোকাভিভূত। এই ক্ষতি শুধু মিশরে নয়, বরং সমগ্র মুসলিম জাহান আজ তাদের মহান নেতার নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। এটা কোন সহজ কথা নয়। সহজভাবে এই ক্ষতি বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌র দুনিয়ায়-মুসলমানদের দেশে-ইসলামের নাম নেয়াকে অপরাধ গণ্য করে ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হবে আর কোন প্রতিক্রিয়া হবে না, তা কেমন করে হতে পারে?

সাইয়েদ কুতুব কুরআনের মোফাচ্ছের, ইসলামের মুবাল্লেগ, ইসলামী সাহিত্যের দিকপাল, ইসলামী আন্দোলনের নির্ভীক আপোষহীন নেতা, খোদার পথের বিপ্লবী মুজাহীদ-লাখো অন্ধকে দিয়েছেন সত্যের দৃষ্টি, বিশ্বের কোণে কোণে যার যুক্তিবাদী সাহিত্যের অসাধারণ সমাদর, সেই তেজস্বী বাগ্মী পুরুষকে হত্যা করা হয়েছে। কেমন লাগে কথাটা ভাবতে। আজকের যুগে কুরআনের পয়গামকে যথার্থভাবে বোঝার জন্যে তিনি সম্পূর্ণ আধুনিক ও যুক্তি নির্ভর দৃষ্টিকোণ থেকে রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "ফী জিলালিল কুরআন" –কুরআনের ছায়াতলে। আধুনিক বিশ্বের জটিল আর্থিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক সমস্যাবলীর পরিষ্কার ইসলামী সমাধান পেশ করেন তিনি তাঁর অমর গ্রন্থে। সূরা আনয়ামের ভূমিকায় তিনি মানুষের সামনে মুক্তির সঠিক পথ তুলে ধরেন।

ইসলামে সামাজিক সুবিচার; ইসলামের উজ্জল ভবিষ্যত, কিয়ামতের দৃশ্য, কুরআন মানবতার জীবনাদর্শ ইত্যাদি গ্রন্থ সহ বিশটি গ্রন্থের রচয়িতা ইমাম সাইয়েদ কুতুব। তাঁর এক একটি গ্রন্থ আজকের বঞ্চিত মানবতার জন্যে এক একটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

তাঁর বিখ্যাত রচনা 'মাআলিম ফিত-তারীক' পড়লেই বুঝতে পারা যাবে যে, বৃহৎ শক্তিবর্গ ও তাদের দোসররা তাকে হত্যা করার জন্যে কেন উঠে পড়ে লেগেছিল। ইমাম সাইয়েদ কুতুব দুই বৃহৎ শক্তির নিষ্ঠুর কবল থেকে বিশ্বের নিষ্পেষিত মানবতাকে মুক্তির পথ নির্দেশ দান করেন। তিনি তথাকথিত দুই পরাশক্তির অক্টোপাশ থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বমানবতাকে তাদের স্বাভাবিক জীবনাদর্শ

ইসলাম মোতাবেক নব জীবনের সূচনা করার আহ্বান জানান। আর বিশ্বজোড়া ইসলামী পূণর্জাগরণের অর্থই হচ্ছে– পুঁজিবাদী আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এবং সমাজবাদী সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের পতন। এই জন্যে দুই বৃহৎ শক্তি তাদের শত পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে আদা-নুন খেয়ে নেমেছে। সাইয়েদ কুতুব মুসলিম জাতিকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে কুরআনের ভাষায় বলেন–

ঃ মানুষের মধ্যে তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি; সুতরাং শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা চলবেনা। তিনি অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে বলেন–

ঃ বাতিল ও কুফরী শক্তি যতই বিরোধিতা করুকনা কেন, ইসলামের অনির্বাণ আলোকে এই বিশ্ব আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

শেষ কয়দিন

যেদিন ইমাম সাইয়েদ কুতুবকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়, সেদিন ভোরে ফজরের নামাজের পর ঘুমিয়ে আমি স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে বলছেন–

ঃ জেনে রেখো, আমি ওসব লোকদের সঙ্গী নই, আমি প্রিয়নবীর সাথে মদীনায় আছি।

এই টুকুতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি উঠে হামীদাকে স্বপ্নের বিবরণ শোনাই। ফাঁসির দ্বিতীয় দিন ফজরের নামাজের পর তসবীহ্ পড়তে পড়তে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লে একটি নেপথ্য আওয়াজ শুনতে পাই–

ঃ সাইয়েদ জান্নাতুল ফেরদৌসে অবস্থান করছেন।

ঘুম ভেঙ্গে গেলে আমি স্বপ্নের কথা হামীদাকে বলি। শুনে তাঁর চোখ বেয়ে দরদর করে অশ্রু গড়াতে লাগলো। তিনি বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন–

ঃ আল্লাহ্‌র মেহেরবানীর উপর আমার অবিচল বিশ্বাস রয়েছে। তিনি অবশ্যই জান্নাতুল ফেরদৌসে আছেন। আমি বললাম, স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে সাইয়েদের সৌভাগ্যের ইঙ্গিতই দিচ্ছেন।

এদিকে জালিমরা আমাদের উপর তাদর জুলুমের হাত চালিয়ে যেতে লাগলো। সে কঠিন অত্যাচার কোন মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে আবার তথাকথিত তদন্তের নামে নিত্য দিন অফিসে অফিসে ঘোরানোর কসরতও চালানো হয়। মনে হচ্ছিল, আদালতের রায় ঘোষণার পর আনুষ্ঠানিক শাস্তি ছাড়া অন্যান্য জুলুম থেকে মুক্তি পাবো। কিন্তু সে আশা দুরাশা মাত্র। তারা আমাকে স্বস্তি দেবে কেন?

আমাকে প্রতিদিন হয়রানীর জন্যে অফিসে অফিসে ঘোরানো হতো আর আমি বোন হামীদাকে একা শোকাবিভূত রেখে জল্লাদদের অনুসরণ করতে বাধ্য হতাম। প্রতিদিনই অফিস থেকে ফিরে এসে তাঁকে খবর দিতে হতো যে আজো জালিমরা অনেক মুসলমানকে গ্রেফতার করে এনেছে। ওরা আমাকে অজানা-অচেনা লোকদের সম্পর্কে তথ্যাদি জিজ্ঞেস করতো। আসলে ওরা আরো অন্যান্য মামালায় জড়াতে চাচ্ছিল। আমার পঁচিশ বছরের সশ্রম কারাদন্ডেও যেন ওরা তৃপ্ত হতে পারেনি। এভাবে দুঃসহ অবস্থার মধ্যে আমরা কারাগারের এক একটি মুহূর্ত কাটাচ্ছিলাম। প্রতি মুহূর্তকেই শত বছরের মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। এই দুঃখ-দুশ্চিন্তা ও বিরক্তি থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ছিল পবিত্র কুরআন পাঠ। কুরআন পড়তে বসে সব দুঃখ ভুলে যেতাম এবং এক অপার্থিব প্রশান্তিতে মনপ্রাণ জুড়িয়ে যেতো। আল্লাহ্ যথার্থই বলেছেন- "শোন, আল্লাহ্‌র জিকির হৃদয়ে ধৈর্য ও প্রশান্তির সৃষ্টি করে।"

কিছুদিন পর আমরা পত্রিকার দাবী করি। অতএব কারাগারের তহবিলে আমাদের জমা টাকা থেকে হামজা আমাদের জন্যে পত্রিকা আনানোর ব্যবস্থা করে দেয়। পত্রিকা আসার পর অনেক দিন পরে আমরা বাইরের দুনিয়ার খোঁজ-খবর পেতে শুরু করলাম। এতে করে সময়ও ভাল কাটতে লাগলো।

কারাগারে বসে আমার সমস্যার অন্ত ছিল না। এদিকে প্রায় প্রতিদিনই নাসেরের বিরুদ্ধে কোন না কোন ষড়যন্ত্রের খবর আসছিল। যেই মাত্র কোন ষড়যন্ত্রের গুজব উঠতো, অমনি আমাকে নিয়ে তারা টানা-হেঁচড়া শুরু করে দিত। ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকতো অর্থহীন জিজ্ঞাসাবাদ। ব্যাপার ঘটতো বাইরের মুক্ত পৃথিবীতে আর এখানে কারাগারের বন্ধ কক্ষে অবস্থানকারী বন্দিনীকে দিতে হতো ওসব কৃত্রিম ষড়যন্ত্রের জবাবদিহি। বস্তুতঃ এসব ষড়যন্ত্রের খবর সরকার নিজেই তৈরী করে প্রচার করতো। প্রতিদিনই ষড়যন্ত্র ফাঁস হচ্ছে আর প্রতিদিনই আমার মাথায় এসে পড়ছে অবাঞ্ছিত বজ্রপাত।

আমার স্বামীর ইন্তেকাল

আদালতে রায় ঘোষণার পরে হামজা বিসিউবিকে ডেকে আমি আমার স্বামীর সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করতে বললাম। কয়েকদিন পরেও তিনি আসেননি দেখে আমি তাকে আবার সেকথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। এ অজুহাতে আমাকে অফিসে ডেকে স্বামীর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করা হয়। আমি তখন তাদেরকে বললাম-

ঃ আমি পঁচিশ বছরের কারাদণ্ডে দন্ডিত এবং বন্দিনী। এ ব্যাপারে তাঁর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক নিয়ে আলাপ করে তাঁকে আমি সম্পর্কের আওতা থেকে মুক্ত করতে চাই। তাঁর মতামত ও পরামর্শ শোনা দরকার। আমার কথা শুনে হামজা বলল–

ঃ আব্দুন নাসের তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে না বরং তিলে তিলে ধ্বংস করবে।

আমি বললাম–

ঃ আল্লাহ্ ভরসা! আব্দুন নাসের, তোমরা এবং পুরো দুনিয়ার লোকের এতটুকু শক্তিও নেই যে, তারা একটি গাছের পাতা ঝরাবে। আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারে না।

হামজা বলল– আমরা শিগগীরই তোমার কাছে তোমার স্বামীর তালাক নামা পৌছাবো।

ঃ তোমরা সত্যিই জানোয়ার! –একথা বলে আমি ফিরে আসি। আমি সে'লে ফিরে আসি সত্য কিন্তু আমার অন্তর ভীষণভাবে ছটফট করছিল। অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটে। একদিন ফজরের নামাজের পর ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখলাম, পত্রিকায় আমার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে। আমি আরো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। তাঁর জন্যে আল্লাহ্র দরবারে হাত তুলে বললাম–

ঃ হে জীবন-মৃত্যুর মালিক! মৃত্যুকে ফিরিয়ে দাও তাতো বলতে পারিনি। তবে তার উপর রহমত বর্ষণ কর। সেদিন বোন হামীদাও সেই একই স্বপ্ন দেখেন। পরের দিন শুক্রবারে পত্রিকা এলে আমরা সত্যি সত্যিই পত্রিকায় আমার স্বামীর ইন্তেকালের খবর পাঠ করে ভেঙ্গে পড়লাম। প্রিয়তম স্বামীর ইন্তেকালের খবর পড়ে আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলে শিশুর মতো কাঁদতে থাকি। কাঁদতে কাঁদতে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমার জন্যে ডাক্তার ডাকা হয়।

কয়েকদিন পরে আমার পরিবারের সদস্যরা আমার সাথে দেখা করতে এলে তাঁরা জানান যে, আব্দুন নাসের এবং তার সৈন্যরা আমার স্বামীকে ত্যাগ করতে অথবা জেল বরণ করার জন্যে বাধ্য করে। আমার স্বামী অত্যন্ত সরল প্রাণ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সমাজে তিনি প্রত্যেকের শ্রদ্ধেয় হাজী সাহেব বলে পরিচিত।

নাসেরের লোকেরা খুব বেশী পীড়াপীড়ি শুরু করলে তিনি এ ব্যাপারে ভাবনা চিন্তার জন্যে দু'সপ্তাহের সময় চান। কিন্তু তারা কোন সময় দিতে অস্বীকার ক'রে জোর-জবরদস্তি আমার স্বামীকে তালাকনামায় স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। তিনি তাদের এ কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে বলেন যে–

ঃ আল্লাহ্ স্বাক্ষী রয়েছেন, আমি আমার স্ত্রী জয়নব আল-গাজালীকে কোন অর্থেই তালাক দেইনি।

তিনি আরো বলেন–

ঃ আমি বুড়ো হয়েছি। আমার মৃত্যু নিকটবর্তী! আমাকে তোমরা স্বসম্মানে শান্তির সাথে মৃত্যুবরণ করতে দাও। .....আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জয়নব আমার স্ত্রী থাকবে।

হয়েছেও তাই। আমার স্বামী কারাদন্ডের খবর শুনে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনিতেও তিনি পক্ষাঘাতে ভুগছিলেন তাঁর কোম্পানীর লোকসান, আমার গ্রেফতারী, ঘরবাড়ী বাজেয়াপ্ত ইত্যাদি কারণে তিনি ভীষণভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হন। আমার স্বামীর কাছ থেকে জবরদস্তি স্বাক্ষর আদায়ের পরপরই তিনি ইন্তেকাল করেন।

বিয়ের আগে আমার স্বামী আমার দ্বীনি ভাই ছিলেন। দাম্পত্য সম্পর্ক থেকেও সেই ঈমানের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মজবুত। তাঁর সাথে আমার দাম্পত্য সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত মধুর। তাঁর ইন্তেকালের পর আমার আত্মীয়-স্বজনরা যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে তাঁর দাফন-কাফনের কাজ সমাধা করেন। এজন্যে আমি তাদের প্রত্যেকের কাছে ঋণী।

আমি প্রিয়নবীকে স্বপ্নে দেখার যে ঘটনা উল্লেখ করেছি সে দিনের তারিখ আমি লিখে রেখেছিলাম। আমি তারিখ মিলিয়ে দেখলাম যে, ঠিক সেদিনই শত্রুরা আমার স্বামীকে তালাকনামায় স্বাক্ষরের জন্যে বাধ্য করে। আমি প্রিয়নবীকে পরিষ্কার সাদা ধপধপে পরিচ্ছদে স্বপ্নে দেখলাম। প্রিয়নবীর পিছনে জনাব হাসান হুজায়বীকেও সাদা পোষাক সাদা টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখলাম। আমি দাঁড়িয়েছিলাম এবং আমার পাশেই ছিলেন মা হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং অন্যান্য কয়েকজন মহিলা। তিনি আমাকে কিছু উপদেশ দিচ্ছিলেন। এমন সময় প্রিয়নবী সেখানে এলেন এবং মা আয়েশা (রাঃ)-কে ডেকে বললেন–

ঃ ধৈর্য ধারণ কর আয়েশা! ধৈর্য ধারণ কর! এর সাথে সাথে মা আয়েশা (রাঃ) আমার হাত ধরে মৃদুচাপ দেন এবং ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেন।

আমি ঘুম থেকে জেগে বোন হামীদাকে স্বপ্নের বিবরণ বলি। তিনি ধৈর্য শক্তি বৃদ্ধির জন্যে আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করেন। সেদিনই আমি অনুভব করি যে আমার সামনে হয়তো বিরাট কোন বিপদ অপেক্ষা করছে। সুতরাং নতুন পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনের জন্যে আমি আল্লাহ্র দরবারে হাত তুলে বলি–

ঃ হে, অসহায়ের সহায়। আমাকে ধৈর্য-শক্তি দাও, আমাকে তোমার মেহেরবাণীর ছায়াতলে আশ্রয় দাও।

নয়া প্রতিবেশী

শীতের এক প্রচন্ড হিমেল রাতে আমাদের পাশের কক্ষে দারুন হৈ-চৈ শোনা গেল। আমরা অবগতির জন্যে কক্ষের দরজা খুললে দেখতে পেলাম সালাহ্ আমাদের দিকে আসছে। সে এসেই সকালে দিয়ে যাওয়া বমি নিরোধক ঔষুধ চাইলো। তাকে আমরা তক্ষুণি ঔষুধ দিয়ে দেই। পরের দিন সে আমাদের পাশের কক্ষের প্রতিবেশীরা হচ্ছে ইয়েমেনের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর বিশ জন সহকর্মী। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক হলেও এতে আমি তেমন বিস্মিত হয়নি। কারণ কথায় বলে, জেল মানে যাদুঘর। এখানে সব কিছুই সম্ভব।

আবদুন নাসের বেশ জোরে শোরেই ইয়েমেন জয়ের অপপ্রচার চালিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ইয়েমেনের প্রধানমন্ত্রী মিশরের কারাগারে বন্দী কেন? আপনারা কি কেউ শুনেছেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মিশর জয় করে ডজন ডজন মিশরীয়কে লন্ডনের কারাগারে নিয়ে বন্দী করেছে। অথবা নেপোলিয়ান বোনাপার্ট্‌ মিশর অধিকার করে কি কোন মিশরীয়কে প্যারিসের কারাগারে নিয়ে আটক করেছিল?

নাসেরের বিচার চাই

নাসেরের অসংখ্য গুরুতর অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা চালানো হয়নি কেন, তা আমি জিজ্ঞেস করতে পারি কি? মিশর তার জাতীয় ইতিহাসে মর্যাদার আসন এজন্যেই কি হারায়নি যে, এখানে জালিম-অত্যাচারীদের দমন করার কোন পদক্ষেপই নেয়া হয়নি!

এসব অপরাধীদের অপরাধ-তৎপরতা থেকে আজো যদি দেশকে বাঁচানো না হয় তাহলে সমস্যা আরো জটিলরূপ ধারণ করবে।

মিশরে স্বৈরাচারী শাসনের চরম দুর্দিনে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের মহান দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছিল ইখওয়ানুল মুসলিমুন। ইখওয়ানুল নির্ভীকভাবে অন্যায়-অবিচার ও জুলুম-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং জনগনের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী তোলে। প্রথম দিকে নাসের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইখওয়ানকে প্রতারিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু শিগ্‌গীরই থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ে এবং তার মুখোশ খসে পড়ে। যখন এতে আর কারো সন্দেহ রলো না যে, নাসের সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের পোষা দালাল, তখন শত্রুর মোকাবেলায় ইখওয়ানের সাথে গোটা জাতি সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৫৪ সালে জাতি সত্যের সংগ্রাম ইখওয়ানকে সমর্থন করে। ১৯৬৫ সালে জাতি আবার তার

ঈমানী দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে। ১৯৬৫ সালে বিদেশী শক্তির এজেন্টরা মিশরের বুক থেকে ইসলামী আন্দোলন সমূলে উচ্ছেদের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসে। তারা ইখওয়ানকে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিতে প্রয়াস পায়। এজন্যে লাখ লাখ লোককে বন্দী করা হয়। অসংখ্য কর্মীকে হয়রানী করা হয়, আর কত লোক যে হতাহত হয়েছে তার হিসেব দেয়া মুশকিল। কিন্তু এতসব জোর-জুলুম সত্ত্বেও সত্যের মশালকে নিভানো সম্ভব হয়নি। তাদের সুখ স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র দ্বীনের কাজ আগের মতো এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং অনাগতকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আব্দুন নাসেরের বিপ্লবের সময় যেসব শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল ১৯৬৫ সালের ইসলামী গণআন্দোলনে তারাই নাসেরের স্বৈরাচারী শাসনের নাকে দম আনিয়ে ছাড়ে।

নাসের তার বিদেশী প্রভুদের সহযোগীতায় দেশে নাস্তিক্যবাদ ও অশ্লীল ছায়াছবি, পত্র-পত্রিকা আমদানী করে দেশের নবীন বংশধরদের চরিত্র হননের আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু দেশের বীর তরুণরা এসব বিজাতীয় চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিয়ে ইসলামের জয়কেতন সমুন্নত করে রাখে।

নবীন বংশধরদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্যে আমরা যে পদক্ষেপ নিয়েছিলাম, এভাবে তার সাফল্য দেখা দেয়। নবীন তরুণরাই ইসলামী আন্দোলনের প্রধান গতি সঞ্চারক শক্তিতে পরিণত হয়। ইসলামী আন্দোলনের তরুণদের প্রধান ভূমিকা দেখে নাসের ক্ষেপে পাগল হয়ে পড়ে।

সে তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের প্রায়ই বলতো–

ঃ জয়নব আল-গাজালী এবং আব্দুন ফাত্তাহ ইসমাইল তরুণ সম্প্রদায়কে আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে।

নাসেরের এই স্বীকৃতি আমাদের জন্যে গৌরবের কথা। তার নির্লজ্জ কঠোর থাবা থেকে আমরা তরুণ সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছি। আমরা ইসলামের খেদমতে এমন তরুণ বাহিনী সৃষ্টি করে দিয়েছি, যা যুগের যে কোন হুজুগের মোকাবেলায় ইসলামের ঝান্ডাকে বুলন্দ করে রাখতে সক্ষম। শিক্ষায়-ভদ্রতায়, জ্ঞানে-চরিত্রে এবং নৈতিক বৈশিষ্ট্যে এসব তরুণ আজকের যুগের জন্যে এক জীবন্ত আদর্শ।

এই মহান সাফল্যের ক্ষেত্রে শহীদ আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইলের অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে! তিনি নিজেই একটি সংগঠন ছিলেন আর মোহাম্মদ হাওয়াশের মতো মহান বিপ্লবী তরুণের অবদানও অনির্বাণ হয়ে থাকবে। আজকের ইসলামী যুব আন্দোলন হচ্ছে তাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের সোনালী ফসল।

সামরিক কারাগারের দিনগুলি ক্রমে শেষ হয়ে এলো। দুর্যোগের সেই দীর্ঘ দিনগুলোতে অবর্ণনীয় অত্যাচারের মুখেও ইসলামী আন্দোলনের বীর সেনানীদের ধৈর্য-সাহস ও বীরত্বে এতটুকুও ভাটা পড়েনি।

বিপদ-সংকুল এই মহাসমুদ্র পেরিয়ে এসেছে তারা তাদের দুর্জয় ঈমানী শক্তিতে। ৫ই জুন অভিশপ্ত নাসেরের উপর আল্লাহ্র গজব নাযিল হয়। আর আমাদেরকে সেইদিন সামরিক কারাগার থেকে বে-সামরিক জেলে স্থানান্তর করা হলে আমরা প্রত্যেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

এভাবে নাসেরের নিষ্ঠুর কবল থেকে আল্লাহ্ আমাদের উদ্ধার করেন। ইসলামের শত্রু নাসের ধ্বংস হয়ে গেছে আর ইসলামের মুজাহিদরা নতুন উদ্দীপনার ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছে।

সুতরাং মিশরের ইতিহাসে ৫ই জুন জুলুম নিপাতের দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সেদিন নাসেরের অস্তিত্ব থেকে মিশর মুক্তি পেয়েছে। রোজ হাশরে তাকে অপমানিত হয়ে লাঞ্ছনার শিরোপা পরে দাঁড়াতে হবে। বিশ শতকের ফেরাউন নাসেরের মৃত্যু ছিল মিশরীয় জাতির জন্যে এক আশীর্বাদ। ৫ই জুন সে অপমানের শৃঙ্খল পরে মানুষের পৃথিবী থেকে বিতাড়িত হয়। জীবদ্দশায় সে নিরীহ অসহায়-জনগণের উপর বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের উপর যে সব বর্বর অত্যাচার চালিয়েছে, মৃত্যুর পর তাকে তার প্রতিফল ভোগ করতেই হবে।



সপ্তম অধ্যায়

কানাতির জেলে স্থানান্তর

সেই দিনটি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এর আগে ৩রা ও ৪ঠা জুনে আমাদের কক্ষের দরজা কোন রকমের পূর্বাভাস ছাড়াই যখন মর্জি খোলা হচ্ছিল। ওরা এসে আমাদের "কোন জিনিসের প্রয়োজন আছে কিনা" বার বার জিজ্ঞেস করছিল।

এরপর যুদ্ধ, ফিলিস্তিনি ও আরব সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা শুরু করা হতো। আমরা অবশ্য চুপ করেই থাকতাম। আলোচনার অংশ গ্রহণ কারীদের মধ্যে একজন ডাক্তারও ছিলেন। আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম–

ঃ আমরা কি সত্যিই ফিলিস্তিনকে মুক্ত করতে সক্ষম?

আমার প্রশ্ন শুনে থমমত খেয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন–

ঃ কি;····· কি বলতে চাচ্ছেন আপনি?

আমি ধীর কণ্ঠে বললাম–

ঃ বিভিন্ন পরিণাম থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। আমাদের কর্তারা ইসরাইলের ব্যাপারে শক্রতা-মিত্রতা সম্পর্কীয় যত বুলিই আওড়ান না কেন; আর তারা যাই আশা করুন না কেন; যতদিন পর্যন্ত বিশ্ব ইহুদীবাদী আন্দোলন দুই বৃহৎ শক্তিকে তাদের কুটনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের স্ব-ঘোষিত বড় কর্তারা বৃহৎ শক্তিবর্গের তাবেদারী করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবেন না·····বস্তুতঃ ফিলিস্তিন তথা অধিকৃত আরব এলাকা পুনরুদ্ধারের একটি মাত্র উপায় রয়েছে। তা হচ্ছে যথার্থ ইসলামী ঐক্যের মাধ্যম চূড়ান্ত জিহাদ ঘোষণা। আরব ও মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সত্যিকারের ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হলেই ফিলিস্তিন এবং অন্যান্য সব অধিকৃত আরব এলাকা পুনরুদ্ধারের পথ সুগম হতে পারে।

৫ই জুন ভোর হলো। কিন্তু আজ তড়িঘড়ি দরজা খোলার জন্যে কেউ এলো না। কিছুক্ষন পরে হঠাৎ দরজা খুলে এক হাবসী সিপাহী চেঁচিয়ে যা বলে গেল তা তাৎপর্য বোঝা গেল না। যতটুকু বোঝা যায়-হতভাগা নাসের বিজয়ী হয়েছে।

একটু অসমাপ্ত কথা বলে বিড় বিড় করতে করতে অন্যান্যদের কাছে ছুটে গেল। এরপর এসে শক্রদের বেশ জঙ্গী বিমান ভূপাতিত করার খবর শুনালো। এর সাথে সাথে এক, দুই, তিন, চার করে একের পর এক তাদের তৃতীয় মহান

নেতার বীরত্ব ও বিজয়ের কাহিনী বলে যেতে লাগলো।

আমরা কথার আগাগোড়া কিছু অনুমান করতে না পেরে চুপ করে রলাম। আসরের নামাজের পর সাফওয়াত এসে কোন কথাবার্তা ছাড়াই আমাকে তার ভারী বুট দিয়ে লাথি মারতে শুরু করলো।

সে হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে বলছিল–আমরা বিজয়ী হয়েছি।

ভারী বুটের অজস্র লাথি খেয়ে আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ি। হামীদা তাকে বার বার আমাকে অতর্কিত আক্রমণ করার কারণ জিজ্ঞেস করছিলো। কিন্তু কেবল লাথি বর্ষণ ছাড়া কোন জবাবই তার মুখ থেকে বেরুচ্ছিল না। আমি আঘাতের চোটে অজ্ঞান হয়ে পড়লে সে তার সাথে আগত সিপাহীদের আমার সব দরকারী জিনিষ-পত্র ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার আদেশ দিল। জ্ঞান ফিরে এলে সে আমাকে আবার পিটালো। তারপর আমাদের সে'ল থেকে বের করে হাঁটতে বলে সেও গালি দিতে দিতে এগিয়ে চললো। সে বার বার এটাই বলছিল "আমরা বিজয়ী হয়েছি! আমরা সাফল্য অর্জন করেছি।' ৫ই জুনের বিকেল বেলায় আমাকে এবং হামীদাকে সামরিক অফিসার ও জোয়ানদের একটি গাড়ীতে বসিয়ে সামরিক কারাগারের প্রধান গেট অতিক্রম করে। কারাগারের কর্তারা ড্রাইভারের পাশের সীটে বসেছিল। আমি আল্লাহ্‌র নামে তসবীহ্ পাঠ করতে শুরু করলাম। আমার মনে হচ্ছিল, আসমান জমীন তথা পূরো সৃষ্টি-জগতের প্রতিটি প্রাণী ও প্রতিটি বস্তু আমার সাথে আল্লাহ্‌র নাম জিকির করছে। আমি যখন উচ্চস্বরে তসবীহ্ পাঠ করছিলাম তখন হামীদা আমাকে আওয়াজ বন্ধ করতে বললো। এরপর আমি তসবীহ্‌র শাব্দিক অর্থ ও তাৎপর্যের দিকে মনোনিবেশ করি। এবার মনে হচ্ছিল গোটা পৃথিবী আমার সাথে কথা বলছে।

সামরিক কারাগারের কক্ষে আমার উপর অতর্কিত হামলার সময় সাফওয়াতের কথাবার্তায় মনে হচ্ছিল আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার জন্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এজন্য আমি আল্লাহ্‌র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত তেলাওয়াতে মগ্ন হয়ে পড়ি। "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান মাল কিনে নিয়েছেন।"

একটি কবিতার কিছু অংশ আমার মনে পড়ছিল তখন। কবি বলেছেন–

..... আসে যদি মৃত্যু ঈমানের সাথে
প্রশ্ন নেই কোন কিভাবে এলো, মৃত্যু আমার?

অন্যত্র কবি বলেছেন–

"পাখি উড়ে গেল অজানা পথে নিরুত্তর পৃথিবী
আমি জানি কিন্তু তার মনজিল মধুর।"

কবি আরো বলেন–

"যদি বাঁচতে চাও মেয়েদের বেশী
অসম্ভব জেনে এখানে বেশী কম দাবীর
নেই অনুমতি।"

·····ব্যাস মেনে নাও মৃত্যু ধৈর্যের সোপান,
এ সোপান হয় শেষ অনন্তের দ্বারে।"

গাড়ী ব্রেক করে দাঁড়ালে হামীদা আমাকে ডাক দেয়। আমি চোখ খুলে দেখি সামনে কানাতি জেল। মহিলাদের জন্যে নির্দিষ্ট।

মানসিক পীড়ার রাত

কানাতির কারাগারের প্রধান গেট অতিক্রম করে আমাদের জেল দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে আমাদের মালপত্রের নিখুঁত তল্লাশী করা হয়। তখন রাত্রিকাল। এরপর কমিশনারের পাশের দফতরের মহিলা জেলার আবার আমাদের তল্লাশী নেন এবং বন্দীদের জন্যে নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট কক্ষে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। কক্ষ কি বলা যায়, লোহারতাবু লোহার কায়েকটি খুঁটি ছাড়া এর দরজা বলতে কিছুই ছিল না। তারই মাঝে একটি পাশ ভাঙ্গা চৌকি এবং অপর চৌকির উপর রাখা একটি ছাড়া কোথাও আর কোন জিনিসের অস্তিত্ব ছিল না। আমাদের কক্ষ পেরিয়েই শুরু হয় বিরাট এক হলঘর। এর সাথেই ছিল মহিলা কয়েদীদের তিনটি ওয়ার্ড। এসব মহিলাদের চুরি, মাদক দ্রব্যের ব্যবসা; হত্যা এবং অবৈধ যৌন-অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রাতের অন্ধকার গাঢ় হতেই দূর মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসে আজানের সুমধুর ধ্বনি। তায়াম্মুম করে এশার নামাজ আদায় করি। নামাজের পর শুয়ে পড়ে ঘুমানোর চেষ্টা করি। কিন্তু কোথায় ঘুম। ঘুম কোথায় কোন অজানা রাজ্যে পালিয়েছে, কে জানে! রাতের অন্ধকার আরো ঘন ও বিভীষিকাময় হতে লাগলো আর ওয়ার্ডের দরজা সে রাতের মতো বন্ধ হতেই নৈতিক চারিত্রিক অধঃপতনের বীভৎস রূপ প্রকট হতে লাগলো। মানুষ তার মানবিকতার আবরণ খুলে ফেলে নির্লজ্জ নোংরামীর চরম সীমায় পৌঁছাতে শুরু করলো। মানুষ স্বেচ্ছায় অমানুষে পরিণত হলে যে পরিণতি হতে পারে; তারই চরম নির্দশন দেখে মানসিক যন্ত্রণা আর আহত উপলব্ধির যাতনায় কাটলো সেই অভিশপ্ত রাত্রি।

আমরা দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল থাকতাম। কারণ আল্লাহ্‌র স্মরণের মাধ্যমেই হৃদয়ে প্রশান্তি অর্জন করা সম্ভব। সুব্‌হে উমিদের আলোক রেখা প্রকাশ পেলে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্‌কে কৃতজ্ঞতা জানালাম। আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে মনের উদারতা এবং সার্বিক মুক্তির জন্যে মোনাজাত করলাম।

আমি সেই বীভৎস নারকীয় রাতটিকে কোনদিন ভুলতে পারবো না। অথচ সেদিন সে রাতে কোন জল্লাদ আমার উপর হান্টার বা চাবুক চালায়নি·····কউ গালি-গালাজও করেনি। তবুও সেটাই ছিল আমার কারা জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর অসহ্য-নারকীয় রাত। সেই নারকীয় রাতের বিষাক্ত বিদঘুটে পরিবেশ দেখে হামীদা কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে পড়ছিল। আমি তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে বলি–

ঃ আমরা যে আদর্শ ও পথের অনুসারী·····সে পথে চলতে গিয়ে যে কোন অবস্থা ও পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্যে ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রয়োজন। আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করবেন। সামরিক কারাগারে আমাদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালানো হয়েছিল, অপমান করা হয়েছিল, মেরে মেরে শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছিল, ক্ষুধা-পিপাসায় অবর্ণনীয় কষ্ট দেয়া হয়েছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রাতে আমরা যা দেখতে পেয়েছি যা শুনতে পেয়েছি তা আমাদের কাছে সামরিক কারাগারের অমানুষিক জুলুম-নীপিড়ন থেকেও অনেক বেশী কষ্টকর মনে হয়েছে। এ রাতে আমাদের সামনে অজ্ঞতা ও পাশবিকতার পঙ্কিলতায় আবর্তনশীল মানুষদের একটি দল জঘন্যতম পাপাচারে লিপ্ত ছিল। এরা সবাই ছিল নারী। এরা মানবিকতার সব বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে চরম যৌন বিকৃতি ও শয়তানী প্রবৃত্তির বাঁদীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এরা প্রত্যেকেই অপরাধ প্রবণতাকে তাদের পেশা-নেশায় পরিণত করে। মানবতা, ভদ্রতা, পবিত্রতা, মান-মর্যাদা, শালীনতা ইত্যাদি শব্দ বা গুণাবলীর সাথে এদের আদৌ কোন সম্পর্কই ছিল না। বস্তুতঃ এরা এমন এক হীনতর জীবে পরিণত হয় যাদের কাছে অশ্লীলতা আর যৌন পাপাচারই হচ্ছে জীবনের মোদ্দা কথা।

এদের এমন অন্ধ জীবের সাথে তুলনা করা যায়, যার গলার রশি ধরে রয়েছে আর এক অন্ধ। সেই অন্ধের নির্দেশমতেই এসব অন্ধ-জীব ভুল-ভ্রান্তি ও বিপদের পথে জীবন বরবাদ করে চলেছে। এরা কোনদিন সরল-সুন্দর পথ দেখার, জানার, বোঝার সুযোগ পায়নি। ফলে অন্ধ তারা অন্ধ প্রবৃত্তির অনুসরণে জাহান্নামের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। মাটির বুকে যেসব মানুষ অন্যসব মানুষকে গোলামীর শৃংখলে আবব্দ করে প্রয়াসী তারা এসব অন্ধ পথহারা লোকদের বিপথে চলতে আরো বেশী সাহায্য করেছে। খোদাদ্রোহী শাসকরা তাদের

ক্ষমতা দীর্ঘায়নের হীন স্বার্থে এ ধরনের অপরাধীদের সহযোগিতা গ্রহণকে জরুরী মনে করে থাকে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত ফজরের নামাজের আযানের সাথে সাথে সেই পাপাচারে পূর্ণ আঁধার রাতের অবসান ঘটে। ভোরের স্বর্গীয় আলোকে দূর হয়ে যায় নারকীয় রাতের অবাঞ্ছিত অন্ধকার। আমরা দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদাবনত হই এবং তাঁর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করি।

নতুন পর্যায়ের সংঘাত

আমি এবং হামীদা জেল-কমিশনারের অফিসে গেলে জানানো হয় যে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তোমাদের জন্যে ক্যান্টিনে যাওয়া এবং কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ। কমিশনার বললেন–

ঃ তোমাদের দু'জনের জন্যে বন্দীদের দেয়া অধিকারও নেই। পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত তোমাদেরকে এ অবস্থাতেই থাকতে হবে।

আমি তাকে বললাম–

আমরা আপনার কাছে সেজন্যে আসিনি, বরং এই অনুরোধ নিয়ে এসেছি যে, ...কমিশনার আমার কথা শেষ না হতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন–

তোমরা আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলে?

আমি বললাম–

হ্যাঁ। আমরা আমাদের কক্ষ পরিবর্তন করতে চাই।

হামীদা বলল– আমরা এমন কক্ষ চাই, যাতে অন্ততঃ দরজা থাকবে। জীব-জন্তুর খোঁয়াড় নয়.....

কমিশনার বললেন– এটা আবার কেমন কথা হল? ঠিক আছে, আমরা তোমাদেরকে আবার সামরিক কারাগারে পাঠিয়ে দেব। সেখানে যা ভোগ করে এসেছো, তা আবার ভোগ করতে পারবে।

আমি বললাম– আমরা এমন স্থানে থাকতে পারিনে, যা জীব-জন্তুর জন্যেও অযোগ্য।

তিনি বললেন– আমি কমিশনার; এটা জেল এবং তোমরা বন্দিনী। এছাড়া আমি আর কিছুই জানিনে।

এরপর তিনি দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন–

ঃ কে আছ; এসে এদের বের করে দাও।

আমি আবার বললাম–

ঃ আমরা জেলের প্রাঙ্গণে পড়ে থাকবো, কিন্তু কোন অবস্থাতেই সেই কক্ষে যাবো না, যা তা পরে দেখা যাবে।

কমিশনার বললেন– কারাগার কারাগারই। তোমরা যদি আদেশ মানতে অস্বীকার কর তাহলে গুলী করে মারা হবে।

আমি বললাম তা বরং অনেক সহজ·····তাছাড়া তোমাদের হাতে খুন হবার অর্থইতো শাহাদাত·····

কমিশনার আমাদেরকে অফিস থেকে বের করে জেল-ওয়ার্ডে ছেড়ে দিলেন। একটু পরে কমিশনার মহিলা জেলারকে ডেকে আমাদের তল্লাশী নেবার হুকুম দিলেন।

তল্লাশীর জন্যে আমাদেরকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা একটা প্রশস্ত ওয়ার্ড। এতে বিশখানা চৌকি ছিল। ঘন্টা খানেক পরে সেই মহিলা জেলার এসে বলল–

ঃ এস, তোমাদের আয় কত? আমরা তার প্রশ্নের মানে বুঝতে অক্ষম ছিলাম। সুতরাং আমাদের 'নোংরা' নামে বিশেষিত মেয়ে লোকদের কাতারে দাঁড় করানো হয়। এরা এমন সব মেয়েলোক, যাদের কাছে চরিত্র বা মান-মর্যাদা জ্ঞানের কোন অর্থই ছিল না। এরা তাদের হীন দুশ্চরিত্রতার অপরাধে জেলে এসেছে।

কক্ষের পাশে গিয়ে জেলার চেঁচিয়ে বলল–

ঃ আজকের আমদানী মোট পঁয়তাল্লিশ। পঁচিশজন বেলাল্লাপনার দায়ে, পনের জন যৌন অপরাধ ও নৈতিকতা-বিরোধী অপরাধে, তিনজন চুরির অপরাধে এবং দুজন রাজবন্দিনী।

রাজবন্দিনী অর্থাৎ আমি আর হামীদা। জেলারের চেঁচানো শেষ হলে আমি আগের লাইন ছেড়ে সরে আসি। হামীদাও আমার অনুসরণ করে। তা দেখে জেলার বলল–

ঃ আরে তোমরা যাচ্ছ কোথায়·····? অপেক্ষা কর।

আমি বললাম, আমরা পৃথক ভাবে দাঁড়াবো। কারণ এসব বাজে লোকদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। সে বলল-তোমাদের এত নাক ছিটকানো হচ্ছে কেন?

আমি বললাম– ওদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তাই আমরা আলাদা ভাবেই দাঁড়াবো। সে জিজ্ঞেস করলো– ওরা কি তোমাদের চেয়ে নিকৃষ্ট?

আমি এর কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রলাম। জেলার ওসব পথভ্রষ্ট চরিত্র-হীনদের একটি কক্ষে বন্ধ করে আমাদের কাছে এসে বলল–

ঃ সিষ্টার! ডাক্তার সাহেবা তোমাদের বসতে বলেছেন। তাঁর অবসর হলে তাঁর কাছে যাবে।

মহিলা ডাক্তার অবসর পেয়ে আমাদের ডেকে নাম-বয়স এবং ব্যথা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করায় একটু পরেই বিকট

চিৎকারের সাথে কান্নাকাটির শব্দ শোনা যেতে লাগলো। সারা পরিবেশ কেমন যেন বিষন্ন রূপ ধারণ করলো। আমরা কৌতুহলী হয়ে বাইরে কান লাগিয়ে বুঝতে পারলাম, বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি আত্মসমীক্ষায় মগ্ন হয়ে পড়লাম–

ঃ কত সংকট আর দুর্ঘটনাই ঘটে চলছে হায়! আমার হতভাগ্য জাতি! দুর্যোগ-দুর্ঘটনা আর হাহাকারই বুঝি তোর নিয়তি? কে আছে তোর আপন?

একের পর এক কঠিন দুর্যোগ আর দুর্ঘটনার সয়লাবে বারবার নিমজ্জিত হচ্ছে জাতির ভাঙ্গা তরী। কখনো চারিত্রিক দুর্যোগ, কখনো আদর্শিক দুর্যোগ, কখনো অর্থনৈতিক ও সামাজিক অরাজকতার দুর্যোগ। সব শেষে ৫ই জুনের গ্লানি, অপমান জনক পরাজয়ের শোকাবহ ঘটনা। ৫ই জুনের প্রলয়ঙ্কারী দুর্ঘটনা জাতীয় জীবনকে আরো ঘোলাটে আরো পতনশীল করে দিয়েছে। আমাদের শাসক গোষ্ঠী বাঁদরের মতো অনুকরণ প্রিয় এবং শুকরের মতো স্বার্থপর ও নির্লজ্জ। এরা দেশের অভিশপ্ত লোকদের সংস্পর্শে এসে সাক্ষাৎ শয়তানে পরিণত হয় এবং শত্রুর হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে, এরা জাতির উপর আরো কঠোর অত্যাচার চালাতে শুরু করে। এদের নিষ্ঠুরতা, নির্লজ্জতা ও হীনতা দেখে অভিশপ্ত ইহুদীরা পর্যন্ত অনুকম্পাবোধ করে। আমি ভাবছিলাম–

ঃ কোন ধরনের জীবন-যাপন করছি আমরা? আমাদের চোখের সামনেই ইসলাম, ভ্রাতৃত্ব, মর্যাদাবোধ, ভদ্রতা-শিষ্টাচার ইত্যাদি সব সৎগুণাবলী ধ্বংস করা হচ্ছে। মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। সাধারণ মানবিক অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। সামান্যতম অধিকার অর্জনের অনুমতিও তাদের দেয়া হচ্ছে না। এরা ইসলাম এবং মুসলমান উভয়কেই ধ্বংস করার পাঁয়তারা করছে। মুসলমানদের জনশক্তি, মুসলমানদের সামাজিক মর্যাদা, সহায়-সম্পদ, জমি, পুঁজি সব কিছুই কেড়ে নিয়ে তাদের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দিতে চাচ্ছে। অথচ ইসলামের সত্যিকার অনুসারী মুসলমানরা হচ্ছে মানবতার অতন্দ্র প্রহরী। তারা মানুষের কল্যাণের জন্যে বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ ক'রে জুলুম শোষণের অবসান ঘটায়। তারা দুঃখী সর্বহারাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বস্ব ত্যাগ কর দেয় এবং তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী মানব সমাজকে করে নিষ্কলুষ শুভ্র-সুন্দর। এদের ব্যক্তিত্বের সৌরভ সমাজ পরিবেশকে করে সুরভিত। মুসলমান আল্লাহ্‌র পথে চলে, আল্লাহ্‌রই সন্তুষ্টির জন্যে মিথ্যের বিরুদ্ধে এবং সত্যের পক্ষে সংগ্রাম করে। আল্লাহ্‌র আদেশের সামনে মাথা নত করে। ভয়-ভীতি ও দুঃখ মুসিবতের তোয়াক্কা না ক'রে দুর্জয় সাহসে এগিয়ে চলে মানবতার মুক্তির পথে।

আমার পাশে কারা যেন ফিস ফাস করছে। সত্যের পথে সহযাত্রী ভায়েরা আমার! চাপা শব্দে কথা বলোনা, মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বলোনা; বরং স্পষ্ট

কথাবার্তা বল, সম্পূর্ণ শক্তি ও সাহসিকতার সাথে সামনে-আরো সামনে এগিয়ে চল। কোন ইতস্ততা, কোন জড়তা, কোন সন্দেহ আর শংকা নয়। দূর্বার নির্ভীক অব্যাহত গতিতে লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে চল।

তোমরা যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথ ত্যাগ কর তাহলে ভয়-ভীতি আর অপমান তোমাদের পায়ের জিঞ্জির হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আমরা যদি আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে অবিচল থাকি, তাহলে আল্লাহ্ অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন। আমাদের মনপ্রাণ আর বিবেকের গভীরতা দিয়ে ইসলামকে গ্রহণ করার মতো গ্রহণ করতে হবে। আমরা চির অনির্বাণ শাশ্বত সুন্দর অকৃত্রিম ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করেই পেতে পারি তার সোনালী ফসল। আমাদেরকে সংশয়-বাদিতা ত্যাগ করতে হবে, বিভেদ মতভেদ-বির্তকের পথ পরিহার করা ফরজ, অবশ্য কর্তব্য প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এগিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি এভাবে চলতে থাকি তাহলে আল্লাহ্র রহমতে আল্লাহ্র মেহেরবানীতে আমরা দুনিয়ার বুকে আমাদের স্বপ্ন ও সাধনার নগদ ফসল তুলতে পারবো। আমরা অস্থায়ী ভেল্কিবাজ কাগুজে শক্তিবর্গকে পরাস্ত করে সাফল্য অর্জন করতে পারবো, প্রতিষ্ঠা করতে পারবো আল্লাহ্র কালাম ও রাসূলের সুন্নাতের আলোকে আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্র। আমরা আবার ফিরে পাবো আমাদের হৃত গৌরব মান-মর্যাদা। বস্তুতঃ আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত রয়ছে আমাদের মান-মর্যাদা, গৌরব, সৌভাগ্য, শক্তি ও সমৃদ্ধি। ইসলামের অনুসরণে কেবল ইহকালের এ জীবনে নয়, মৃত্যুর পরবর্তী মহাজীবনেও আমরা হবো জান্নাতুল ফেরদৌসের ভাগ্যবান। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা মহান উমর (রাঃ) বলেছেন–

ঃ আল্লাহ্র দুশমনদের মোকাবেলার বিনিময়েই অর্জিত হয় মুসলমানদের সত্যিকারের সাফল্য। আর এ পথেই আমরা পাই আল্লাহ্র সাহায্য। তা না হলে আমরা কোনদিন তাদের উপর বিজয়ী হতে পারতাম না। কারণ সংখ্যা ও সাজ-সরঞ্জাম অস্ত্র-শস্ত্রের দিক থেকে কাফেরদের তুলনায় আমাদের প্রস্তুতি নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু ইসলামী বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে আমরা কাফেরদের বরাবরও যদি হয়ে পড়ি তাহলেও তারাই হবে আমাদের উপর বিজয়ী।

আজ যে আমরা-মুসলমানরা অপমান ও পরাজয়ের গ্লানী বহন করছি, কুরআন ও সুন্নাহ্র পথ থেকে আমাদের দূরত্বই এর একমাত্র কারণ। এভাবে অবস্থা চলতে থাকলে আমাদেরকে আরো বিপদ এবং অপমানজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। কারণ, অপমান, পরাজয়, দুর্বলতা অধঃপতন, অভাব-অনটন ইত্যাদি আসে খোদা বিরোধিতার পরিনামেই। খোদা-দ্রোহীতার পরিণাম ইহ-পরকালে অব্যাহত আজাব ও জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লাহ্ বলেছেন-

"যারা আমার আদেশ মেনে চলেছে তারা দুর্ভাগ্য-পীড়িত এবং অপমানিত হবে না; আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ বর্জন করেছে তার জীবন হবে সংকীর্ণ। রোজ হাশরের দিন আমি তাকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় উঠাবো। সে বলবে, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে অন্ধ করে কেন উঠালে' অথচ আমি দৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন ছিলাম।' তখন আল্লাহ্ বলবেন, তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী পৌঁছেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গেছ, তাই তোমাকেও ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, আমি অত্যাচারী এবং প্রভুর নিদর্শনাবলীর উপর অবিশ্বাসকারীদের এভাবেই বদলা দিই। পরকালের আজাব হবে চিরস্থায়ী এবং অত্যন্ত কঠিন।"

আমি ভাবনার অথৈ পাথারে ডুবন্ত ছিলাম। অনেক অর্থ আর তাৎপর্য আমার মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাচ্ছিল। দুঃখজনক পরিস্থিতি, তিক্ত ঘটনাবলী আমার গভীর অন্তঃপুরে শোক-দুঃখের সাথে সাথে অজানা আশংকার ছায়াও রেখায়িত হয়ে উঠছিল।

হামীদার ডাকে আমি চমকে উঠি। আমি পাশের বন্ধ কক্ষেই বসেছিলাম। এর দরজা কখনো কখনো খোলা হতো। আশে পাশের কোথায় কি আছে না আছে বা কি হচ্ছে না হচ্ছে তা জানার কোন উপায় ছিল না। একদিন মহিলা প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে আমরা এ প্যাকেট সিগারেট আনতে সক্ষম হই। কঠোর-প্রাণা মহিলা-প্রহরীর জন্যে এই সিগারেটের প্যাকেট ছিল দুর্লভ বস্তু। তাকে নরম-কোমল করার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেটই ছিল যথেষ্ট। এতে করে আমাদের আশ-পাশের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে শুরু করি। আমাদের পার্শ্ববর্তী কক্ষে ছিল একটি নারী ও তার শিশু সন্তান। শিশু সন্তানটির পিতা সম্পর্কে কেউ কিছু জানতো না। সামনের কক্ষে একটি মেয়ে তার কুকর্মের ফল ভোগ করছে টি-বি রুগিনী হিসেবে। ওর সামনের ওয়ার্ডে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত মেয়ে বন্দিনীরা সাজা ভোগ করছিল। বিল্ডিং-এর শেষ প্রান্তে ছিল শৌচাগার। আমাদেরকেও প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম সারার জন্যে ওখানে যেতে বলা হয়। এই আদেশের উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকেও কোন না কোন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত করা।

বিল্ডিং-এর দ্বিতীয় ভাগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সাজানো গোছানো কক্ষ দেখা যাচ্ছিল এবং তাতে অবস্থানরত মহিলারা কোন্ দেশের নাগরিক তা প্রথমে আমরা জানতে পারিনি। সে অংশের গোসলখানা এবং শৌচাগারও ছিল বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

একদিন সেই পরিচ্ছন্ন ওয়ার্ডের এক মহিলা আমাদেরকে উত্তম খাদ্য পরিবেশন করেন। আমরা খুবই ক্ষুধার্ত ছিলাম বলে তা পরম তৃপ্তি সহকারে খাই। এভাবে

তাদের প্রতি আমাদের কৌতূহল আরো বৃদ্ধি পেলো। মহিলার ভদ্রতার পরিচয় পেয়ে মনে হলো জীব-জন্তুর এই দুর্ভেদ্য অরণ্যে হঠাৎ যেন কোন মানুষ এসে পৌছেছে।

আমি মহিলা গার্ডকে বললাম-

ঃ আমাদেরকে ওপাশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাথরুম ব্যবহারের অনুমতি দাও।

সে বলল-

ঃ ততো শুধু মহিলা·····ডাক্তার এবং ইহুদীর জন্যে নির্দিষ্ট।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম-

ইহুদী বলছো তুমি কাদের?

সে বলল- হ্যাঁ, ছয় জন ইহুদী মহিলা। মাদাম মুরসেল, মাদাম লোস প্রমুখ।

ওরা বেশ ঘোরাফেরা করে। যা চায় তা পায়। তাদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল সর্বত্র গতি-বিধির। ওদের থাকার স্থান ছিল উত্তম। ওদের দেয়া হতো উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য-দ্রব্য। অথচ ওরা সবাই ছিল ইসরাইলের গুপ্তচর। গুপ্তচর বৃত্তির অপরাধেই তাদের গ্রেফতার ও আটক করা হয়। মহিলা প্রহরী অবশ্য বললো-

ঃ আপনারা বরং মহিলা ডাক্তারের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলুন। তিনি আপনাদেরকে তাঁর বাথরুম ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন।

এ ব্যাপারে আমরা মহিলা ডাক্তারের সাথে কথা না বলে জেলারের সাথে আলোচনা করি। জেলার কোন মতেই রাজী হননি। কারণ সেই বাথরুম কেবল ইহুদীনি গুপ্তচরদের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল।

শত্রু হলেও মানুষ বটে

শেষ পর্যন্ত আমি সব ব্যাপারে আল্লাহ্‌র মর্জির উপর ছেড়ে দিয়ে তাঁরই ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়ি। হামীদাও আমার পাশে বসে ইবাদত করছিল। এমন সময় দীর্ঘ-গৌর বর্ণ এক মহিলা আমাদের কক্ষে এসে আমাদের সালাম জানালেন। আমরা সালামের জবাব দিলে তিনি প্রশ্ন করলেন-

ঃ আপনিই জয়নব আল-গাজালী?

আমি ইতিবাচক জবাব দিলে তিনি বললেন-

আমি মুরসেল-রাজ বন্দিনী এবং স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ও আপনাদের মধ্যে আদর্শগত মতভেদ রয়েছে। কারণ আমি ইহুদী এবং আপনারা মুসলমান; কিন্তু এই বিপদ-মুসিবতে আমরা সবাই মানুষ এটাই বড় কথা। এজন্যে কারগারে আমাদের পারস্পরিক ব্যাপারে কোন বাধা-বিপত্তি অবশ্যই কাম্য নয়। এসময় আমরা সবাই বিপদগ্রস্থ। আমি প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্যের ক্ষেত্রে সহযোগীতার হাত বাড়ানো।

আমরা তাঁর প্রস্তাবকে স্বাগত জানাই। এরপর তিনি বললেন–

ঃ আমাদের কাছে কম হলেও যথেষ্ট খাদ্য-দ্রব্য রয়েছে। আমরা আপনাদের সাথে খাদ্য-দ্রব্য বন্টন করবো। অবশ্য কোন রকমের অবৈধ হারাম খাদ্য আপনাদের দেয়া হবে না। বলা বাহুল্য, আমরা ইহুদীরাও মুসলমানদের মতো শুকরকে অবৈধ বা হারাম গণ্য করি।

এরপর থেকে সে ইহুদী মহিলা মুরসেল আমাদের জন্যে নিয়মিত খাদ্য-দ্রব্য নিয়ে আসতেন। তার চেয়েও বড় কথা তিনি আমাদেরকে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট বাথরুম ব্যবহার করার ব্যবস্থা করে দেন।

হামীদা কিন্তু এসব ব্যাপারে কেমন যেন ইতস্ততঃ বোধ করছিল। আমি তাকে বললাম–

দেখ, আল্লাহ্ তার বান্দাদের সাহায্য করার জন্যে যেকোন উপায় গ্রহণ করতে পারেন। যেকোন ব্যক্তির মাধ্যমে তিনি কল্যাণ পৌছাতে পারেন। আল্লাহ্ কোন সময় তাঁর বান্দাদের উপর জুলুম করেন না এবং স্থায়ী অভাব অনটনেও ফেলে রাখেন না। আমিতো একবার এক বিশাল অরণ্যে এবং আরেকবার মরুভূমিতে ভীষণ বেকাদায় পড়ে গিয়েছিলাম। সেই বিপদের মুহূর্তে এক খ্রীষ্টান মহিলা-ডাক্তারের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাকে উদ্ধার করেন। সেই খ্রীষ্টান মহিলা-ডাক্তার আমাকে এভাবে সেবা করতেন যে দেখে আমি বিস্মিত হতাম। বস্তুতঃ এসব হচ্ছে আল্লাহ্রই রহমত। তিনি শত্রুকে দিয়ে মিত্রের কাজ করিয়ে থাকেন। এই কারাগারে এই অধঃপতিত চরিত্রহীন বিকৃত স্বভাবের মুর্খ লোকদের সাথে আমাদের সময় কাটানো ছিল মুশকিল। এখানে তো টাকা ছাড়া কোন কথাই নেই। টাকা দিলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দরজা খোলা রাখা যায়। যা চায় সব পাওয়া যায়। এখানে কয়েদী আর জেলার সবাই সমান। এখানে মানুষের কাছে টাকা আর ভালোবাসা দাবী করা হয়। তা এটাকি এতো সহজ কথা?

মৃত্যু এবং বিদ্রোহী

ক্ষমতার দন্ডে মদমত্ত অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠী একেবারে ভুলে বসেছে যে, একদিন তাদেরকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে আল্লাহ্র বান্দাদের উপর জুলুম ত্রাসের শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ, সময় ও যুগের গতি আল্লাহ্রই নিয়ন্ত্রাণাধীনে রয়েছে। রাতের পর দিন, বংশের পর বংশ, আসা-যাওয়া, জীবনের শুরু ও শেষ, শরীরের ক্রমবৃদ্ধি ও ক্ষয়, প্রাণের সঞ্চয় সমাপ্তি ইত্যাদি সব কিছুই আল্লাহ্রই হুকুমের অধীনে হচ্ছে।

"মৃত্যু পথযাত্রীর প্রাণ যখন কুণ্ঠাগত আর তোমরা যখন দেখছো যে সে মরছে তখন সেই বহির্গামী প্রাণকে তোমরা ফিরিয়ে আন না কেন? সে সময় তোমাদের

চেয়ে আমিই তার অধিক নিকটবর্তী থাকি, কিন্তু তোমরা দেখতে পাওনা" (কুরআন)

এই বস্তুবাদ সর্বস্ব জীবনের প্রেক্ষাপটে মানবিক বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি অপমান ও অধঃপতনের অথৈ গভীরে নিমজ্জমান দেখা যায়। কানাত্তির জেলের লোকেরা নাসেরের মৃত্যুতে বাহ্যিক শোক দুঃখ প্রকাশ করে। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষী; তার মৃত্যুতে আমাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি হয়নি। কারণ আমরা জানি মৃত্যু একদিন নির্ধারিত রয়েছে। একদিন আসবেই। এর কবল থেকে পালিয়ে বাঁচার কোন উপায় নেই। মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে মৃত্যু হচ্ছে অত্যন্ত ভয়ানক এবং বিনয়ের বাস্তব ঘোষণা। মৃত্যুই আমাদের ডেকে বলে যে, তোমরা সাবধান হয়ে যাও, অত্যাচার ও ঔদ্ধত্য থেকে ফিরে এস। কারণ তাতে তোমার কোন মঙ্গল নেই। তোমার এসব দম্ভ-অহংকার এসব ধন-দৌলত, শক্তি-অস্ত্র সৈন্যবাহিনী সন্তান-সম্পত্তি কিছুই তোমার কাছে আসবে না। সব কিছুই পড়ে থাকবে আর আল্লাহ্‌র দরবারে তুমি ঠিক সেভাবেই নিঃস্ব-উলঙ্গ অবস্থায় পৌঁছুবে যেমন তুমি মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে।

"হায়, তোমরা যদি অত্যাচারীদেরকে সেই অবস্থায় দেখতে, যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ওরা ছটফট করে এবং ফেরেস্তারা হাত বাড়িয়ে বলে– দাও বের কর নিজের প্রাণ। আজ তোমাদের সেসব কথার অবাধে অপমানজনক শাস্তি দেয়া হবে, যা তুমি আল্লাহ্‌র উপর অভিযোগ এনে অবৈধ বকাবকি করতে এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মোকাবেলায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে।"

আল্লাহ্ বলবেন–

"তুমি এখন ঠিক সেভাবেই নিঃসঙ্গ একাকী আমার সামনে উপস্থিত যে ভাবে আমি তোমাকে প্রথম বার একাকী সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাকে যা দেবার তা দিয়েছিলাম। সেসব তুমি ছেড়ে এসেছ। এখন আমি তোমার ওসব সুপারিশকে বিবেচনা করবো না, যার ব্যাপারে তোমার ধারণা ছিল যে, তোমার কাজে আসার ক্ষেত্রে ওসবেরও কিছু অংশ রয়েছে। তোমার পারস্পরিক সব সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে। আর যা তোমার বড্ড দম্ভ ছিল, তা সব তোমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।"

আল্লাহ্ আরো বলেন–

"আমরা তাদের উপর জুলুম করিনি, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে এবং যখন আল্লাহ্‌র হুকুম এসে পড়লো তখন তাদের উপর প্রভু কোন কাজে আসেনি– আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তারা যাদের ডেকে থাকতো। ওরা তাদের ধ্বংস ও ক্ষতি ছাড়া কোন উপকার করেনি।"

"এবং তোমার পালন কর্তা, রব যখন কোন জুলুমের বসতিকে পাকড়াও

করেন তখন তাঁর ধরন এমনই হয়ে থাকে। বস্তুতঃ তাঁর পাকড়াও হয় অত্যন্ত কঠিন এবং যন্ত্রণাদায়ক। বস্তুতঃ এতে ইঙ্গিত রয়েছে, ওসব লোকদের জন্যে যারা আখেরাতের আযাবের ভয় করে। সে এক দিন নির্ধারিত আছে, যখন সব মানুষ একত্রিত হবে এবং সেদিন যা কিছুই ঘটবে প্রত্যেকের চোখের সামনে ঘটবে। সেদিন আমার জন্যে আমি খুব বেশী দেরি করছিনে। মোট কথা তার জন্যে সময় নির্ধারিত রয়েছে। যখন সেদিন এসে পড়বে— কারো কথা বলার সাহস হবে না। অবশ্য আল্লাহ্র অনুমতিতে কিছু বলতে পারা যাবে।

"সেদিন কেউ দুর্ভাগা হবে এবং কেউ হবে সৌভাগ্যের অধিকারী। যারা দুর্ভাগা হবে তারা জাহান্নামে যাবে। সেখানে গরম ও পিপাসার প্রচণ্ডতায় ছুপফট করবে এবং এ অবস্থাতেই তারা ততদিন থাকবে-যতদিন আকাশ ও মাটি বর্তমান থাকবে। অবশ্য তোমার প্রভু যদি অন্যকিছু চান, নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী তিনি যা চান তাই করেন। আর যারা সৌভাগ্যের অধিকারী হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানেই চিরজীবন অবস্থান করবে। যতদিন আকাশ ও মাটি বর্তমান থাকবে। অবশ্য তোমার প্রভু যদি অন্য কিছু চান তারা এমন পুরস্কার পাবে যার ধারা কোনদিন শেষ হবে না।"

সুতরাং কোন ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুতে, তা সে যে কেউ হোক না কেন— আল্লাহ্র পথের মুজাহীদের মনে কোন প্রভাব পড়ে না। কেননা মৃত্যু একান্ত সত্য। এজন্যে মৃত্যু সম্পর্কে কোন দুশ্চিন্তা নেই। তাদের কাছে বিবেচনার যোগ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্য করে তাঁরই সন্তুষ্টির ছায়াতলে জীবন যাপন করা এবং তাওহীদের শ্রেষ্ঠ পয়গাম তুলে ধরার সংগ্রামে মন-প্রাণ ঢেলে কাজ করে যাওয়া। যখন তাদের কাছে এবং অন্যান্যদের কাছে মৃত্যুর ডাক এসে পড়ে তখন তারা জবাবদিহির জন্যে ইহলোক ত্যাগ করে চলে যায়। সেখানে প্রত্যেকের কর্মফল অনুযায়ী শাস্তি অথবা পুরস্কার দেয়া হবে।

ইসলামের সংগ্রাম কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের বিরুদ্ধে নয় বরং ইসলামের সংগ্রাম হচ্ছে মিথ্যে বাতিলের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রাম, অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিশ্বাসের সংগ্রাম এবং আল্লাহ্র সাথে শিরককারী নাস্তিক, মূর্তি পূজারী শক্তির সাথে তাওহীদবাদীদের সংগ্রাম।

যার মৃত্যু অবধারিত সে মরবেই, আর যার ভাগ্যে শাহাদাত লেখা আছে তাকে শহীদ করে দেয়া হবে, মু'মিন অবশ্যই জান্নাতের প্রশস্ত মনোরম বাগানে ঠাঁই পাবে। আল্লাহ্র অত্যন্ত ঘনিষ্টতায় জান্নাতুল ফেরদৌস পাবে তারা। তাতে থাকবে মৃদু

প্রবহমান সুদৃশ্য ঝর্ণাধারা আর দিগন্ত-বিস্তৃত সুশোভিত উদ্যান। আর শহীদদের ব্যাপারে তো বলা হয়েছে– তারা চিরঞ্জীব। তাদের মৃত্যু নেই।

"হে আমার বান্দারা আজ তোমাদের কোন ভয় নেই, কোন দুঃখ তোমাদের স্পর্শ করবেনা। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদেরকে সুখী-সন্তুষ্ট করা হবে। ওদের সামনে সোনার তশতরী এবং পানপাত্র রাখা হবে এবং তাতে লোভনীয় ও আকর্ষনীয় দ্রব্যাদি মওজুদ থাকবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা এখন চিরদিনের জন্যে এখানেই থাকবে। দুনিয়াতে তোমরা যেসব সৎকর্ম করেছ তারই ফলশ্রুতিতে তোমরা এই জান্নাতের ওয়ারিশ হতে পেরেছ। তোমাদের খাবার জন্যে রয়েছে এখানে অফুরন্ত ফলমূল।"

কুফর, বাতিল ও নাস্তিক্যবাদের উপর যারা নিহত বা মৃত্যুবরণ করেছে তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। জাহান্নাম সম্পর্কে তোমরা কিইবা জান? তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে এবং তাথেকে কোন ক্রমেই নিষ্কৃতি পাবেনা। তোমাদের এই চেহারা আর শরীর তাতে জ্বলে-পুড়ে যাবে। এক চামড়া পুড়ে গেলে দ্বিতীয় চামড়া তার স্থান দখল করবে–এই জন্যেই যে তা কষ্ট পেতে পারে। ওদের উপরে নীচে আগুন আর আগুন হবে এবং আগুনের লেলিহান শিখা তাদের ঘিরে রাখবে। তারা যদি পানি চায় তাহলে তাদেরকে এমন উত্তপ্ত পানি দেয়া হবে, যার বাষ্পে তাদের চেহারা ঝলসে পড়বে। আর তা হবে অত্যন্ত ময়লা এবং বিস্বাদ ও দূষিত পানি। তাতে ক্ষুৎ-পিপাসার তীব্রতা বিন্দুমাত্র কমবে না।

"ওদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা মরবেও না এবং তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিও কমানো হবে না। এভাবেই আমরা প্রতিফল দিয়ে থাকি।"

"আল্লাহ্কে অস্বীকারকারী প্রতিটি কাফের সেখানে চিৎকার করে বলবে– হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দাও। আমরা সৎ কর্ম করবো, যা আমরা আগে করেছি, এখন হবে তাথেকে ভিন্নতর।"

তাদের জবাবে বলা হবে–

"আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দিইনি, যাতে তোমরা কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতে? এখন মজা দেখ। অত্যাচারীদের জন্যে এখানে কোন সাহায্যকারী নেই।" আল্লাহ্ যেভাবে চান সেভাবেই জীবন কাটাতে থাকবে। বয়সের পর বয়স জীবনের পর জীবন শেষ হতে থাকবে কিন্তু কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র ইচ্ছের রদবদল করতে পারবে না।

কোন কোন লোক আবদুন নাসেরের মৃত্যুতে চেঁচিয়ে কান্না কাটি করে অবস্থাকে শোকার্ত করে তুলছিল। দিন-রাত তাঁর শোক গাঁথা গাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সব কিছুই হচ্ছিল লোক দেখানোর জন্যেই। এসব কান্নাকাটি আর শোক প্রকাশে তাদের লেশমাত্রও আন্তরিকতা ছিল স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে, সব কিছু হচ্ছিল কৃত্রিমতায় ভরা অভিনয়ের মতো। মাত্র কয়েক বছর আগেও আমার ঘরে বসে এক ব্যক্তি বলেছিল–যারা আবদুন নাসেরকে ইসলামের খাদেম মনে করে তারা কাফের। আজ সেই ব্যক্তির মুখেও নাসেরের শোক গাঁথা শুনছি। এ ধরনের ব্যক্তি তাদের বিবেককে এভাবেই বিক্রি করে। এরাই দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ অবস্থায় যখন নাসেরের মৃত্যুতে কৃত্রিম শোক-দুঃখের প্লাবন বইছিল, আমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার যাত্রাকে স্বাগত জানাই। নাম মাত্র ঈমানদারদের পক্ষেও যেভাবে স্বাগত জানানো সম্ভব আমরা ঠিক সেভাবেই তা জানিয়েছি।

"এবং অত্যাচারী শিগগিরই জেনে নেবে যে, তার পরিণাম কি।"

কানাতির জেলে এ খবর বেশ সরগরম হয়ে উঠলো যে, আমরা নাসেরের মৃত্যুতে কোন রকম শোক বা দুঃখ প্রকাশ করিনি এবং তথাকথিত মহানায়কের মৃত্যুতে আমরা বিন্দুমাত্রও শোকগ্রস্থ হয়নি। তাই তার অনুসারী ব্যক্তিরা আমাদের উপর খুব ক্ষেপে ওঠে। ওরা তাদের লোভ-লালসা ও হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে সব সময় তাদের মনিবের খেদমতে অনুগত থাকার শপথ করে রেখেছিল। সুতরাং আমাদের উপর তাদের ক্রোধ প্রকাশের জন্যে শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করে। তাদের মতে; এটা কিভাবে সম্ভব যে, আমরা নাসেরের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করবো না।

বুদ-বুদ উড়ে যায়

বুদ-বুদ উড়ে যায়, কিন্তু যা মানুষের জন্যে উপকারী তা মাটিতে অবস্থান করে।

বলাবাহুল্য, মুনাফেক এবং কৃত্রিম শোক প্রকাশকারী পোষা চাটুকাররা তৎপর হয়ে উঠলো। এরা তাদের মনিবদের মনোতুষ্টির উদ্দেশ্যে অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারেও আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করে দিল। নাসেরের মৃত্যুর দ্বিতীয় দিন সকালে মহিলা-জেলার আমাদের কক্ষের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে হঠাৎ লোহার এক ভারী রড প্রচন্ডবেগে আমার মাথায় ছুঁড়ে মারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে আমি সেই মারাত্মক আঘাত থেকে বিস্ময়করভাবে বেঁচে যাই। নয়তো

আমার মাথা ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। এতবড় অপরাধের জন্যেও জেল কর্তৃপক্ষ তাকে কোন শাস্তি দেয়নি, জবাবদিহি পর্যন্ত নেয়নি। সেই অপরাধী জেলার দিব্যি নিশ্চিন্তে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল, যেন সে কোন অপরাধই করেনি।

ঠিক সে সময়েই আমার আত্মীয়-স্বজন আমাকে দেখতে এলে আমি তাদেরকে এ ব্যাপারে অবহিত করি। তাঁরা ছোটবড় সব দায়িত্বশীল অফিসারের সাথে দেখা করে এবং ঘটনার উল্লেখ করে সরকারী দপ্তরে টেলিগ্রাম পাঠান। শেষ পর্যন্ত আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় দুর্ঘটনার তদন্ত করতে বাধ্য হয়। তদন্তে জেলারকে ঘটনার জন্যে দায়ী করে বলা হয় যে, সে মানসিক রোগিনী।

আমি আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়কে জানাই যে, তাদের তদন্ত অসম্পূর্ণ রয়েছে। তাই ঘটনার পিছনে জেলারের মস্তিষ্কে নয়, বরং ইসলাম বিরোধী চক্রেরই সুচিন্তিত পরিকল্পনা কার্যকরী রয়েছে। এজন্যে জেলার বেচারীকে শাস্তি দেয়ার কোন অর্থই হয় না। সে নিজের কোন পদক্ষেপের জন্যে দায়ী নয়; সে তো উপর ওয়ালাদের ইঙ্গিতে তা করেছে। তারা ইসলামের সেবকদের সন্ত্রস্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই বিজয়ী থাকবে।

এ ধরনের নতুন পরোক্ষ শাস্তির কথা আমি ভাবতেও পারিনি। অভাবনীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাসেরের পোষ্যরা এ ধরনের পরোক্ষ আঘাত হানার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ যাদের বিভ্রান্ত করে দেন তাদেরকে কেউ সৎ পথে আনতে পারে না।

নতুন পরীক্ষা

ঊনিশ শো একাত্তরের ৯ই আগষ্ট সকালে আমার সামনে আরেক নতুন পরীক্ষা এসে উপস্থিত। মহিলা জেলার ছুটে এসে আমাকে বললো।

ঃ কমিশনার আপনাকে তাঁর অফিসে ডাকছেন।

এই অস্বাভাবিক আহ্বান আমার মনে নানা রকমের উৎকণ্ঠার উদ্রেক করে কি জানি কি হবে? কি জানি জালিমরা কোন্ নতুন ফন্দি এঁটেছে? আমরা কারাগারে বসেও ইসলাম প্রচার করছি এবার বুঝি এই অভিযোগ তোলা হবে? অথবা হতে পারে বাড়ী থেকে কোন খবর এসে থাকবে। এ ধরনের অনেক কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু সত্যি সত্যি যা হতে যাচ্ছিল সে ব্যাপারে আমার আদৌ কোন অনুমানও ছিলনা।

আমি কমিশনারের অফিসে পৌঁছলে আমাকে মুক্তির আদেশ শোনানো হয়। কি আজব ব্যাপার। আমাকে ওরা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড দিয়েও

স্বস্তি পাচ্ছিল না! তা' যাই হোক, আমি তো মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে যাবো কিন্তু হামীদা কি এই পুঁতিগন্ধময় দুঃসহ পরিবেশে পড়ে থাকবে? শংকায় আমার বুক কেঁপে উঠলো। আমি অজান্তেই চিৎকার করে উঠে বললাম–

ঃ না, ·····না এটা কক্ষণো হতে পারে না। আমি আমার হামীদাকে ছেড়ে কখনো বের হবো না। তোমরা সব জালিয়াতী আর বিধ্বংসী পরিকল্পনাকারী। ক্রোধে ফেটে পড়ছিলাম আমি। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে সারা অস্তিত্ব আমার কাঁপছিলো।

কমিশনার আমার অবস্থা দেখে আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করে বললেন–

ঃ আমরা এই আদেশের বিন্দুমাত্র বিরোধিতাও করতে পারিনি। তোমাকে এখানে আনা হয়েছে উপর ওয়ালাদের হুকুমে এবং বের করাও হচ্ছে উপরওয়ালাদের হুকুমে। এ ব্যাপারে আমরা তোমাদের মতোই অসহায়।

কয়েক মুহূর্ত পরে দেখলাম হামীদাও কমিশনারের অফিসে এসে পৌঁছেছে। আমাকে বুঝিয়ে শান্ত করার জন্যেই কমিশনার তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। আমার জন্যে এটা ছিল ভীষণ রকমের পরীক্ষা। অত্যন্ত মর্মপীড়া অনুভব করছিলাম আমি। আমি আমার হামীদাকে কিভাবে একা এই কারাগারে ছেড়ে যেতে পারি। তার মতো মহীয়সী মেয়েকে এই জঘন্য নোংরা জেলের পরিবেশে একা ছেড়ে যাবার কথা ভাবতে আমার সারা শরীরে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। আমি অনুভূতির তাগিদে আবার অজান্তে চিৎকার করে বলি–

ঃ না, না, কক্ষণো নয়। আমি ওকে কোন অবস্থাতেই একা ছেড়ে যাবো না·····

আমার অবস্থা দেখে হামীদা শান্ত নম্রভাবে বলল–

ঃ এটা আমাদের উপর আল্লাহ্‌র মেহেরবানী এবং রহমত বৈ-কি! সব কিছুই তাঁরই নির্দেশে হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ভুলেন না। তিনি আমাদের নেগাহ্‌বান আপনি নিশ্চিন্ত হোন। এভাবে কথোপকথনে অনেক সময় কাটে। কমিশনার হামীদাকে অনুরোধ করে বললেন–

ঃ আপনি তাঁকে সালাম জানিয়ে নিজের কক্ষে ফিরে চলুন।

সে মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। সে সময়ের অনুভূতি উপলব্দিকে কোনক্রমেই ভাষায় রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। আমরা পরস্পর গলা জড়িয়ে ভেঙ্গে পড়ি। হৃদয়ে জাগছিল মহাসাগরের উত্তাল বিক্ষুব্ধ উর্মিমালা, শ্বাস-প্রশ্বাসে ছিল প্রচন্ড ঝড়ের বেগ আর দু'চোখের অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল উত্তপ্ত ফল্গু ধারার মতো।

অন্তরের সেই অভূতপূর্ব উদ্বেলতা আর অনুভূতির করুণ সন্ধিক্ষণে আমি নিজেকে কমিশনারের কক্ষে একাকী অনুভব করলাম। কমিশনার আমার মুক্তির কাগজ-পত্রে আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর করেন এবং আমি অস্থির-চিত্ত, বিচলিতপ্রাণ আর প্রবহমান অশ্রু সম্বল করে মুক্ত দুনিয়ার দিকে প্রথম কদম তুললাম।

শেষ পাঁয়তারা

আমার বাড়ীর দিকে দ্রুতগামী গাড়ীটি হঠাৎ পথ পরিবর্তন করে সরকারী তদন্ত দপ্তরে গিয়ে দাঁড়ায়। আমাকে একটি কক্ষে পৌছানোর পরপরই দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। এখানে বেলা দু'টো থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত এভাবেই পড়ে থাকি। এরপর আমাকে একটি অফিস কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে দু'জন অফিসার বসেছিল। তারা উভয়েই আমাকে ইসলামী জীবনাদর্শ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করলো। তারা এও জিজ্ঞেস করলো যে-

ঃ এরপর কি আপনি ইখওয়ানের সাথে যোগাযোগ রাখবেন?

আমি তাদের জিজ্ঞাসা এড়িয়ে গিয়ে বললাম-

ঃ আমাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড থেকে মুক্তি দেয়া হলো কিন্তু হামীদাকে আটক রাখা হলো কেন? তোমরা আসলে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাচ্ছ। কিন্তু জেনে রেখ, আল্লাহ্ কক্ষনো তোমাদের দুরভিসন্ধি পূর্ণ হতে দেবেন না।

এদের একজন বলল-

মুহতারেমা জয়নব! আপনি শান্ত হোন।

আমি বললাম-

ঃ তোমরা আমাদেরকে ধোকা এবং প্রতারণার জালে আটকাতে চাও। অথচ তোমাদের উপর আল্লাহ্ রয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্তই কার্যকরী হবে। যদিও অধিক সংখ্যক লোক তা জানেনা।

সে বলল-

ঃ দেখুন জয়নব! এটা উপর ওয়ালাদের হুকুম। আমরা এর বেশী কিছুই করতে পারিনে।

এরপর আমাকে আহমদ রুশদীর অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঃ এই সেই ব্যক্তি যার নেপথ্য ইঙ্গিতে সামরিক কারাগারের জল্লাদেরা আমার উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল। এর মতো ধোকাবাজ ও চালবাজ খুব কম লোকই পাওয়া যাবে। "বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন চালাও" এই নীতিতেই সে বিশ্বাসী। আমি তার অফিস কক্ষে প্রবেশ করলে সে আমাকে তার সামনের

সোফায় বসার অনুরোধ করে এবং মুক্তির জন্যে অভিনন্দন জানায়। এরপর তার ও আমার মধ্যে যে আলোচনা হয় তার সারমর্ম হলো এই যে, তার কথামতো—

আমি আমার ইসলামী তৎপরতা বন্ধ করবো।

আমি আমার ইসলামী ভাই এবং বন্ধুর সাথে দেখা করবো না।

তাঁদের সাথে কোন পারস্পরিক সহযোগিতা করবো না এবং স্নেহ মমতার কোন সম্পর্ক রাখবো না।

এবং সময়ে আমি তার অফিসে এসে হাজিরা দেবো।

আর এসব শর্ত সাপেক্ষ কথা শেষ হলে আমি স্পষ্ট করে বলে দিলাম যে—

ঃ যে সব কথা তুমি এখন আমাকে বললে—তা সর্বসামগ্রিকভাবে আমি প্রত্যাখ্যান করছি। বরং তোমরা আমাকে মুক্তি দেয়ার যে আদেশ দিয়েছো-তাকেও প্রত্যাখ্যান এবং অস্বীকৃতি জানাচ্ছি। তুমি আমার এই প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকৃতির কথা তোমার বড় কর্তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। আর আমি এক্ষুণিই আমাকে আবার কানাতীর জেলে ফেরত পাঠাবার দাবী করছি।

আহমদ রুশদী তার কথা বাদ দিয়ে হাসতে হাসতে বললো—

ঃ অনেক ইখওয়ানী আমাদের শর্তে সমঝোতা করছেন।

আমি তার কথা কেড়ে নিয়ে বললাম—

ঃ খোদার শপথ। ইখওয়ানদের ব্যাপারে আমার উত্তম ধারণাই বর্তমান আছে। কোন কোন ইখওয়ান সম্পর্কে তুমি যে কথার দাবী করছ সে সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে চাই না। অবশ্য ওঁদের ব্যাপারে তোমার কথাকে আমি সত্য বলে মনে করিনে। নিঃসন্দেহে ইখওয়ানীরা সত্যবাদী এবং সত্যের পথে আপোষহীন। এই সত্যের জন্যেই তাঁরা রাতদিন কর্মব্যস্ত রয়েছেন এবং আল্লাহ্র সাহায্য বা শাহাদাত না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা সত্যের সংগ্রামে অটল অবিচল থাকবেন।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। আহমদ রুশদী রিসিভার তুলে হ্যালো বলার পরক্ষনেই আনন্দ প্রকাশ করল বললো—

ঃ আহ্লান ও সাহলান। (স্বাগত স্বাগত) হে অধ্যাপক আব্দুল মোনয়েম। আসুন! আসুন! আমরা আপনারই অপেক্ষায় আছি।

এরপর রিসিভার রেখে দিয়ে বললো—

ঃ আব্দুল মোনয়েম গাজালী আসছেন।

একটু পরেই আমার ছোট ভাই অধ্যাপক আব্দুল মোনয়েম এসে আমাকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে সালাম জানালো। আহমদ রুশদী আমার ভাইকে বলল আপনি আমার ও আপনার বোন জয়নবের মধ্যে মধ্যস্থতা করে দিন। আমাদের মধ্যে এখনো মত বিরোধ রয়ে গেছে।

আমার ভাই বলল–

ঃ তিনি আমার বড় এবং আমি তাঁর ছোট ভাই। তাঁকে বোঝানোর সাহস আমার নেই। আর আপনার অনুমতি পেলে এতটুকু কথা বলতে চাই যে যুক্তিতর্ক এবং বাগ্মীতার দিক থেকে তাঁর বিশেষ খ্যাতি রয়েছে।

আহমদ রুশদী এবার বলল–

ঃ ঠিক আছে জয়নব! আপনাকে মুবারকবাদ। ব্যাস্ ইখওয়ানের সমস্ত সংগঠন থেকে একটু দূরে সরে থাকবেন আর তার সাথে মিলে কাজ করার জন্যে কাউকেও অনুপ্রাণিত করবেন না।

আমি তাকে বললাম–

ঃ গোপন সমস্ত সংগঠনের কাহিনীটা আগাগোড়া তোমাদের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। দেখ, ইসলামী শাসক ও সরকার কায়মের প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ অর্থাৎ সামষ্টিক দায়িত্ব। এর প্রস্তুতির জন্যে আল্লাহ্র পথে মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে, যেভাবে প্রিয়নবী এবং তাঁর সাহাবারাও মানুষকে ডেকেছিলেন। এটা প্রত্যেক মুসলমানের সাধারণ দায়িত্ব। এতে ইখওয়ানী বা অ-ইখওয়ানীর কোন প্রশ্ন ওঠে না।

এরপর আমি আমার ভাইয়ের সাথে যখন বাড়ী পৌঁছাই তখন রাত তিনটে আর তারিখ ছিল ১০ই আগষ্ট ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ।

–ঃ সমাপ্ত ঃ–

